# মাদিনা শরিফের ইতিকথা

-এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

# মদীনা শরীফের ইতিকথা

# مَكَانَةُ الْحَرَمِ الْمَدَنِي عَبْرَ التَّارِيْخِ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

# মদীনা শরীফের ইতিকথা

## مَكَانَةُ الْحَرَمَ الْمَدَنِى عَبْرَالتَّارِيْخِ

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ· কে· এম· নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৯২
পৌষ ১৩৯৯, জামাদিউল উখরা ১৪১৩

প্রচ্ছদ ঃ সরদার জয়নুল আবেদীন

মুদ্রণ
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এ্যালিফেন্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৪০ ৯২ ৭১

বিনিময় ঃ আশি টাকা মাত্র

Madina Sharifer Itikatha Written by A N M Sirajul Islam and Published by A K M Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus New Elephant Road, Dhaka-1000, First Edition December-1992
Price Taka: 80.00 only.

## সূচীপত্র

# মদীনার প্রথম বাসিন্দা

বর্ণিত আছে, হযরত নূহ (আ) এর যামানার মহাপ্লাবনের পর সর্বপ্রথম মদীনায় তাঁর বংশধর কায়েনাহ বিন মাহলাবীল বিন ওবাইল বসবাস শুরু করেন। তবে স্থায়ীভাবে যারা মদীনায় বাস করে, চাষাবাদ করে ও গাছ লাগায় তারা হচ্ছে আমালিক সম্পদায়ের লোক। তারা বনু এমলাক বিন আরখাসাফ বিন সানের উত্তরসূরী। তাদের মধ্যে বনু হাফ ও বনু মাতরইল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

রাযীন ইবনুল মোনজের–আশ্–শারকী থেকে বর্ণনা করেছেন।[২] তিনি সুলাইমান বিন উবায়দুল্লাহ বিন হানজালাহ এবং অন্য এক কুরাইশীর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ যখন হযরত মূসা (আ) হজ্জে আসেন, তখন তাঁর সাথে বনি ইসরাইলের কিছু লোকও হজ্জে আসেন। মক্কা থেকে ফেরার পথে তাঁরা মদীনা উপস্থিত হন। তাঁরা মদীনায় তাওরাতে বর্ণিত ভবিষ্যত নবীর শহরের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী দেখতে পান। তাঁদের একটি অংশ মদীনায় থেকে যায়। তারা বনি কাইনুকার বাজারের স্থানে বসতি স্থাপন করে। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য লোকেরাও পরবর্তীতে মদীনায় বসবাস শুরু করে। তবে সর্বপ্রথম আমালিকা সম্প্রদায়ই মদীনায় বসতি স্থাপন করেন। এই মতটিই বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য।[৩]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। বনি ইসরাইল বাদশাহ বখতে নসরের হাতে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হওয়ার পর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারা ইঞ্জিলে মুহাম্মাদ (সা) নামক একজন নবীর ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিল যে, তিনি খেজুর বাগান বিশিষ্ট কোন এক আরব জনপদে আবির্ভূত হবেন। তাই তারা সিরিয়া থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত বিভিন্ন আরব জনপদে উক্ত বৈশিষ্ট খুঁজে বেড়াতে গিয়ে ইয়াস্‌রিবে তার সন্ধান পায়। হযরত হারুনের (আ) বংশের একটি অংশ মদীনায় অবতরণ করে এবং তাদের সাথে ছিল তাওরাত। তারা নিজেদের পরবর্তী বংশধরদেরকে হযরত মুহাম্মাদ (সা) আবির্ভূত হলে তাঁর উপর ঈমান

---

১। অফা–আল–অফা।।নূরুদ্দিনসামহুদী

২। অফা–আল–অফা।।নূরুদ্দিনসামহুদী

৩। অফা–আল–অফা।। ১ম খন্ড নূরুদ্দীন সামহুদী

আনার জন্য উৎসাহিত করে। ইহুদীদের সবাই শেষ নবীর আবির্ভাবের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।[৪] কিন্তু পরবর্তীতে তারা রাসূলুল্লাহকে (সা) পেয়েও ঈমান না এনে কুফরী করে, ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গ করে, রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামকে ধ্বংস করা। অথচ তারা চুক্তি ভঙ্গ না করে মুসলমানদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারত। কিন্তু নিজেদের কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ার আশংকায় তারা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর (সা) বিরোধিতা করে।

অপরদিকে, আনসারগণ আওস ও খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর শেষভাগে ইয়েমেনের আরম বন্যার ফলে, মাআরিব বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তাই বিভিন্ন গোত্র আরব এলাকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ইয়েমেনের আওস ও খাযরাজ গোত্র মদীনায় এসে বাস করতে থাকে। তখন মদীনার উপর ইহুদীদের কর্তৃত্ব ছিল। ফলে, আওস ও খাযরাজ গোত্র তাদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তারপর তাদের সহায়-সম্পত্তি বেড়ে যায় এবং ইহুদীরা তাতে ঈর্ষা বোধ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা উক্ত গোত্র দুটোকে মদীনা থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে। কেননা, ইহুদীদের হাতেই মদীনার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি ছিল। ইহুদীরা তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়।

ইয়াকুত আল-হামাওয়ী তাঁর মো'জাম আল-বোলদানে উল্লেখ করেছেন, মদীনায় ইহুদী শাসনামলে আওস ও খাযরাজ গোত্রের কোন কনে বিয়ের পর ইহুদী রাজা ফাতইউনের কাছে রাত্রি যাপন এবং কুমারীত্ব ও সতীত্ব হারানো ব্যতীত নিজ স্বামীর সাথে বাস করার অনুমতি পেতনা। এই অপমান ও ন্যাককারজনক কাজ বেশীদিন বরদাশত করা যায় না। মালেক বিন আ'জলান খাযরাজী অত্যন্ত সাহসী ও আত্মসম্মানবোধের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বোনের বিয়ের পর তিনি তাকে ইহুদী রাজার কাছে এভাবে সোপর্দ করতে নারাজ ছিলেন। তিনি মহিলাদের সাথে স্ত্রীলোকের পোষাক পরে ছদ্মবেশে রাজার দরবারে ঢুকে পড়েন এবং পোশাকের নীচে তলোয়ার লুকিয়ে রাখেন। মহিলারা রাজার হেরেমে ঢুকার পর তিনি তলোয়ার দিয়ে রাজাকে হত্যা করেন। ইহুদীদের প্রতিশোধের ভয়ে আওস ও খাযরাজ গোত্র সিরিয়ায় বসবাসকারী

---

৪। অফা আল অফা।। নূরুদ্দীন সামহুদী

তাদের একই শাখার লোকজন এবং ইয়েমেনের সর্বশেষ ৩য় তুব্বা শাসক কারব বিন হাসসান বিন আসআদ আল হুমায়রীর সাহায্য প্রার্থনা করেন ও সম্মিলিতভাবে ইহুদীদেরকে পরাজিত করে মদীনার কর্তৃত্ব হাতে নেন। ইয়ামামায়ও অনুরূপ অত্যাচারের কারণে তুব্বা বাহিনী যুদ্ধে ইহুদীদেরকে সেখানে পরাজিত করে।[৫]

আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে উটকে পানি পান করানোর মত বিরোধের কারণে ১২০ বছর স্থায়ী যুদ্ধ হয়। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের ঐ যুদ্ধ শেষ হয়।

কখন মদীনা শরীফের গোড়াপত্তন হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়না। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ১ হাজার সাল কিংবা এরও আগে মদীনার গোড়া পত্তন হয়। কয়েকটি কারণে এই শহরের গোড়া পত্তন হয়ে থাকতে পারে। ১· উর্বর মরুদ্যান, ২· মদীনা হচ্ছে সিরিয়া থেকে ইয়েমেনের বাণিজ্যপথে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, ৩· আরব উপদ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীদের একটা অংশ মদীনায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। ওহোদ পাহাড় ও কানাহ্ উপত্যকার মধ্যবর্তী এলাকা, কুবা, কোরবান এবং জোরফে প্রথম বসতি স্থাপিত হয়।'[৬]

---

৫। অফা আল অফা।। নুরুদ্দীন সামহুদী

৬। আল-মদীনাতুল মোনাওয়ারাহ-একতেসাদিয়াতুল মাকান। আস্-সোককান-আল মরফোলজিয়া-ডঃ ওমর ফারুক সাইয়েদ রজব।

# মদীনার বর্ণনা

**ভৌগলিক বর্ণনা ঃ** 'মদীনাহ হেজায অঞ্চলের একটি মরুদ্যান এলাকা। এটি ৩৯.৩৬ দ্রাঘিমা পূর্বে ও ২৪.২৮ অক্ষাংশ উত্তরে অবস্থিত। মদীনা শহর প্রাকৃতিকভাবে দুইভাগে বিভক্ত। আলিয়া ও সাফেলাহ। দক্ষিন পূর্ব দিককে আলিয়া (উচ্চভূমি) বলা হয় যা সাগরের স্তর থেকে ৬২০–৬৪০ মিটার উপরে। এটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং কুবা ও কোরবান এলাকা এই আওয়ালী অঞ্চলে অবস্থিত। এছাড়া অন্যান্য এলাকাকে সাফেলাহ (নিম্নভূমি) বলা হয় যা সাগরের স্তর থেকে ৬১০–৬২০ মিটার উঁচু।[৭] মদীনার আয়তন প্রায় ৫০বর্গ কিলোমিটার।

মদীনা শহর চার দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা। শহরের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের চাইতে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলো অপেক্ষাকৃত নিকটতর। মদীনার সকল উপত্যকার পানি উত্তর–পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। কেননা, ঐ এলাকা হচ্ছে মদীনার নিম্নভূমি।

**বর্তমান বসতি ঃ** 'মসজিদে নবওয়ীর ১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় শহরের মোট জনসংখ্যার ২৫% লোক বাস করে। পূর্ব এলাকায় ১৬% , পশ্চিম এলাকা ও কুবায় ৪৭%, সাইয়েদুস শুহাদা এলাকায় ১১% এবং সুলতানিয়ায় ১% লোক বাস করে। হজ্জ ও উমরাহ উপলক্ষে এবং যিয়ারতের কারণে মসজিদে নবওয়ীর চারপাশেই লোকজনের ভীড় বেশী। ১৯৭৪ সালের (১৩৯৪ হিঃ) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মদীনা শহরের জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২ লাখ এবং পুরো মদীনা অঞ্চলের জনসংখ্যা হচ্ছে ৫ লাখ ১৯ হাজার। এটা হচ্ছে, সৌদী আরবের জনসংখ্যার মোট ৭.৪১ অংশ।[৮] বর্তমানে মদীনা শহরের জনসংখ্যা প্রায় ৫ লাখ। মদীনার জনগণের মধ্যে আনসার সুলভ নম্রতা ও সহযোগিতার ভাব সর্বদা বিদ্যমান। যে কোন সমস্যায় মদীনার স্থায়ী অধিবাসীরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। মদীনাকে সহযোগিতার শহর বললে অত্যুক্তি হবেনা।

---

৭। আল–মদীনাহ–আল–মোনাওয়ারাহ–একতেসাদিয়াতুল মাকান, আস–সোককান, আল–মরফোলজিয়া–ডঃ ওমর ফারুক সাইয়েদ রজব।

৮। আল মদীনা আল মোনাওয়ারা।। ডঃ ওমর ফারুক সাইয়েদ রজব

**আবহাওয়া :** মদীনার আবহাওয়া সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত। ১· গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম ও লু হাওয়া প্রবাহিত হয়। ২· শরত ও বসন্তের আবহাওয়া খুবই স্নিগ্ধ ও মনোরম। ৩· শীতকালে প্রচন্ড শীত। কোন কোন সময় জানালা বন্ধ করে এবং ঘরের ভেতর হিটার জ্বালিয়ে বাস করতে হয়।

সরকারীভাবে মদীনার ১২ মাসের রেকর্ডকৃত তাপমাত্রা দেখলেই সেখানকার আবহাওয়ার ব্যাপারে একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যেতে পারে।[৯]

| মাস | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা |
|---|---|---|
| জানুয়ারী | ২৯ | ৭ সেন্টিগ্রেড |
| ফেব্রুয়ারী | ৩২ | ১১·৫ |
| মার্চ | ৩৫·৫ | ১৩·৫ |
| এপ্রিল | ৪১ | ১৭·২ |
| মে | ৪৬ | ২১·৫ |
| জুন | ৪৫·২ | ২৪ |
| জুলাই | ৪৪ | ২৩ |
| আগস্ট | ৪৬ | ২৫ |
| সেপ্টেম্বর | ৪৩ | ২২·৫ |
| অক্টোবর | ৪০ | ১৮ |
| নবেম্বর | ৩৪ | ১৩ |
| ডিসেম্বর | ২৭·৪ | ৫·৫ |

**সীমানা :** উত্তর–পশ্চিমে সালা' পাহাড়, দক্ষিণে আইর পাহাড় (এটি জুল–হোলায়ফাহর কাছে) ও আকীক উপত্যকা, উত্তরে ওহোদ ও সাওর পাহাড় এবং কানাহ উপত্যকা। মুসলিম শরীফে হযরত আলী থেকে বর্ণিতঃ মদীনার হারাম হচ্ছে, আইর ও সাওর পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের নাম। এই দুইটা হারামের উত্তর ও দক্ষিণের শেষ সীমানা। পূর্বে লাবাহ বা হাররাহ শারকিয়াহ (নিম্ন পাহাড়ী এলাকা) এবং পশ্চিমে লাবাহ অর্থাৎ হাররাহ গারবিয়াহ বা পশ্চিম হাররাহ (নিম্ন পাহাড়ী এলাকা)। শহরের মাঝখানে রয়েছে বাতহা উপত্যকা। এটি কুবার রানুনা উপত্যকার সাথে গিয়ে মিশেছে।

৯। আল–মদীনাহ আল–মোনাওয়ারাহ ।। ডঃ ওমর ফারুক সাইয়েদ রজব

হারামে মদীনার উত্তর সীমান্তের সাওর পাহাড় মসজিদে নবওয়ী থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ সীমান্তের আইর পাহাড় মসজিদে নবওয়ী থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পাহাড় দুটো হারাম সীমান্তের বাইরে অবস্থিত। বিপরীতপক্ষে, দুই লাবাহ অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম হাররাহ হারাম সীমানার অন্তর্ভুক্ত। সাওর থেকে আইর পাহাড়ের দূরত্ব হচ্ছে ১৬ কিলোমিটার। বর্তমান মদীনা শহর ১৩০০ ফুটের যমীনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মদীনার হারাম এলাকার সীমানা সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আলী (রা) থেকে একটি লম্বা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির ১ম অংশ হল, 'হযরত আলী (রা) বলেন, কোরআন এবং এই কাগজে যা আছে, তাছাড়া আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছ থেকে আর কিছু লিখে রাখিনি। ঐ কাগজে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ اِلٰى ثَوْرٍ

অর্থাৎ 'হারামে মদীনা হচ্ছে, আইর থেকে সাওর পাহাড় পর্যন্ত।'

হারামে মক্কার চার সীমান্তে পিলার বসানো হলেও মদীনার হারামের চার সীমান্তে তা করা হয়নি। শুধু উত্তরে সাওর পাহাড়, দক্ষিণে আইর পাহাড় এবং পূর্বে পূর্ব হাররা ও পশ্চিমে পশ্চিম হাররার উল্লেখ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য অন্য কোন চিহ্ন বর্তমান নেই।

মদীনার হারাম দুই ধরনের। একটা হচ্ছে, শিকার নিষিদ্ধ হারাম এলাকা এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে, গাছ কাটা নিষিদ্ধ হারাম এলাকা।

গাছ কাটা নিষিদ্ধ হারামকে( حِمَى الْمَدِيْنَة ) বা 'মদীনার চারণভূমি'ও বলা হয়। এই চারণভূমিটি হচ্ছে মদীনার চারদিকে একটি গোলাকার বৃত্ত এলাকা এবং মদীনা উক্ত বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত। কিন্তু মসজিদে নবওয়ীর উক্ত বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থান জরুরী নয়। কেননা, হাদীসে এব্যাপারে বিশেষ কোন কিছুর উল্লেখ নেই। যাই হোক, ঐ গোলাকার বৃত্তের চারদিকে প্রশস্ততা হচ্ছে ১২ মাইল। অর্থাৎ চারদিকেই এর দূরত্ব প্রায় সমান। এই হারাম সীমানার ভেতরই গাছ কাটা নিষিদ্ধ। তবে, উট ও গবাদি পশু চরানো নিষিদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় হারাম হচ্ছে, শিকার নিষিদ্ধ হারাম এলাকা। এই হারাম সীমান্তই মূলতঃ আকাংখিত হারাম। মদীনার হারাম এলাকা বলতে এটাকেই বুঝায়। হারামে মদীনা সংক্রান্ত বর্ণিত সকল ফজীলত এই হারামের জন্যই প্রযোজ্য।

এই হারামেই বাস করা ও মৃত্যুবরণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং মক্কার পরিমাপ যন্ত্রের চাইতে মদীনার পরিমাপ যন্ত্রে দ্বিগুণ বরকতের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) দোয়া সহ এই এলাকায় ভয়-ভীতি প্রদর্শন না করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে।

হাদীসে, দুই 'লাবাহ'র মধ্যবর্তী স্থানকে এই হারামের সীমানা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। লাবাহ বলতে বুঝায় অগ্ন্যুৎপাতের ফলে কাল পাথর বিশিষ্ট এলাকা। সম্ভবতঃ ইতিহাসের কোন পর্যায়ে এখানে সংঘটিত অগ্ন্যুৎপাতের কারণে এটাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। উক্ত লাবাহকে বর্তমানে 'হাররাহ' বলা হয়। পূর্বে রয়েছে হাররাহ ওয়াকেম এবং পশ্চিমে রয়েছে হাররাহ ওয়াবরাহ। দক্ষিণে রয়েছে আইর বা আয়ের পাহাড় এবং উত্তরে রয়েছে সাওর পাহাড়। 'সাওর' শব্দের অর্থ হল ষাঁড়। এটি একটি ছোড় পাহাড় যা মদীনার উত্তরে এবং ওহোদ পাহাড়ের পশ্চিমে, পেছন দিকে অবস্থিত। পাহাড়টির রং হচ্ছে লাল-কালোর সংমিশ্রণ। পাহাড়টির উপর উটের পিঠের কুঁজের মত ৩টি উঁচু কুঁজ আছে। পাহাড়টিকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দেখলে একটি ষাঁড়ের মত মনে হয়। পাহাড়টি আল-খোলাইল রাস্তার প্রথমে ও সুয়েরেজ লাইনের পর হাতের ডানে পড়ে। এই পাহাড়ের উপরে উঠলে বরাবর দক্ষিণে আইর পাহাড় দেখা যায়।

সাওর পাহাড়কে উত্তর সীমানা নির্ধারণের কৌশল এটা ছাড়া আর কিছু নয় যে, যাতে করে পুরো ওহোদ পাহাড়কে হারাম সীমানার ভেতর রাখা যায়। আইর ও সাওর পাহাড় হারাম সীমানার অন্তর্ভূক্ত নয়।

অপরদিকে, পশ্চিম হাররাহ বা হাররাহ ওয়াবরাহ সম্পূর্ণটা হারাম সীমানার অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্ব হাররাহ বা হাররাহ ওয়াকেমের অংশ বিশেষ হচ্ছে হারাম সীমানার অন্তর্ভূক্ত। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বনি হারেসা গোত্রে যান এবং বলেন, 'আমার ধারণা, তোমরা হারাম সীমানার বাইরে।' তারপর তিনি ভাল করে দেখে বলেন, 'বরং তোমরা হারাম সীমানার ভেতর রয়েছ।' তখন বনি হারেসা গোত্র আল-ওরাইদ নামক স্থানে বাস করত বিধায় তাও হারাম সীমানার অন্তর্ভূক্ত।

আকীক উপত্যকা পশ্চিম হাররায় অবস্থিত এবং তা হারাম সীমানার অন্তর্ভূক্ত। কেননা, মুসলিম শরীফে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াককাস থেকে

বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, তিনি সেখানে গাছ কাটারত একজন দাসের সবকিছু কেড়ে নিয়েছিলেন। যখন দাসের মনিব পক্ষ হযরত সাদের কাছে এসে দাসের কেড়ে নেয়া সামান ফেরত দেয়ার দাবী জানায়, তখন তিনি উত্তরে বলেন, আমি কি করে ঐ জিনিস ফেরত দিই, রাসূলুল্লাহ (সা) যা আমার জন্য গনীমতের মাল হিসেবে বৈধ করেছেন। এই বলে তিনি কেড়ে নেয়া সামান ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আকীক উপত্যকাও হারাম সীমানার অন্তর্ভুক্ত।

**মূলতঃ** গাছ কাটা ও শিকার নিষিদ্ধ হারাম এলাকার আয়তন এক ও অভিন্ন। আগের হাদীসে দক্ষিণ ও উত্তর দিকের সীমানা আইর ও সাওর পাহাড়ের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম ও পূর্বদিকে তা তত স্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। বরং ২টা এলাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু উপরোল্লেখিত হাদীস দ্বারা সেই এলাকার কোন কোন অংশ হারাম সীমানার অন্তর্ভুক্ত তা বলা হয়েছে। সেই অনুসারে, আইর ও সাওর পাহাড়ের দূরত্বের সমান বিন্দুতে যদি পূর্ব ও পশ্চিমেও একই দূরত্ব নির্ধারণ করা যায়, সেটা উত্তম হয়। ফলে, হারাম এলাকার সঠিক আয়তন নির্ধারণ করা সম্ভব। শহরের উপর থেকে বিমানে নেয়া ছবির সাহায্যে দেখা যায় যে, আইর ও সাওর পাহাড়ের মধ্যকার দূরত্ব হচ্ছে ১৫ কিলোমিটার। তাই পূর্ব-পশ্চিমের অনুরূপ দূরত্বই আকাংখিত সীমানা বলে ধরে নেয়া যায়।[১০]

মদীনা থেকে দক্ষিণে লোহিত সাগরের তীরে ইয়াম্বু সামুদ্রিক বন্দরের দূরত্ব প্রায় ২৭৫ কিলোমিটার, জিদ্দার দূরত্ব ৪২৫ কিলোমিটার, মক্কার দূরত্ব ৪৯৭ কিলোমিটার, দামেশ্‌কের দূরত্ব ১৩০৩ কিলোমিটার এবং জর্দান সীমান্ত ৮৪৪ কিলোমিটার। মদীনার সাথে সৌদী আরবের সকল শহর এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে পাকা প্রশস্ত রাস্তার মাধ্যমে উত্তম সংযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়াও বিমান বন্দর থাকায় আকাশ পথেও সুষ্ঠু যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে।

---

১০। দৈনিক আল-মদীনাহ, জিদ্দা, সংখ্যা-৮৭৫৬, তারিখ ৬ই মে, ১৯৯১ খৃঃ

## মদীনার নামসমূহ

মদীনা শরীফের ৯৫টা নাম আছে।[১১] দুনিয়ার আর কোন স্থানের এত বেশী নাম নেই। এখন আমরা ঐ সকল নামগুলো উল্লেখ করবো ঃ

১· আসরেব। নূহ (আ) এর বংশধরের ছড়িয়ে পড়া এক ব্যক্তির নামানুসারে এই নামকরণ করা হয়েছে। আসরেবকে 'ইয়াসরাব' (ইয়াসরিব)ও বলে। এটা ইবনে আব্বাসের মত। আবু ওবায়দের মতে, এটি মদীনার এক পার্শ্বের নাম। মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন যাবালাহর মতে, এটি মদীনার একটি বিশেষ অংশের নাম। যাই হোক, নামটি উলামায়ে কেরামের নিকট পসন্দনীয় নয়। কোরআনে মুনাফিকদের বক্তব্য উল্লেখ প্রসঙ্গে ইয়াসরাব শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইয়াসরাবের এক অর্থ নষ্ট করা। অন্য অর্থ হচ্ছে, গুনাহর কারণে পাকড়াও করা অথবা একজন কাফেরের নামের কারণেও তা অপসন্দনীয় হওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ নয়।

২· আরদুল্লাহ। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন,

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا : (سورة النساء-٩٧)

অর্থঃ "আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিলনা যে তোমরা সেখানে হিজরত করবে?" মদীনা একদিকে আরদুল্লাহ বা আল্লাহর যমীন। অন্যদিকে, তা

৩· আরদুল হিজরাহ ঃ বা হিজরাতের স্থান।

৪· আক্কালাতুল বোলদান।

৫· আক্কালাতুল কোররা।

৬· ঈমান, আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ- يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ (سورة الحشر-٩)

অর্থঃ 'তাদের আগে যারা ঘর ও ঈমানকে আবাদ করেছে তারা মুহাজিরদেরকেভালবাসে।'

---

১১। অফা-আল-অফা-১ম খন্ড।। নূরুদ্দিন সামহুদী।

৭· الْبَارَّةُ

৮· الْبَرَّةُ উভয় শব্দের অর্থ হচ্ছে কল্যাণ। মদীনাহ গোটা পৃথিবীর জন্য নবুওয়াতের বিরাট কল্যাণ কেন্দ্র।

৯· বাহরাহ ঃ অর্থ যমীন।

১০· বোহাইরাহ ঃ ক্ষুদ্র যমীন।

১১· বাহীরাহঃ যমীন। গ্রাম অর্থেও বাহরাহ শব্দের ব্যবহার হয়।

১২· বালাতঃ অর্থ টাইল্স। মদীনায় এগুলো বেশী পাওয়া যায়।

১৩·বালাদ।

১৪· বাইতুর রাসূল। আল্লাহ বলেন,

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ (سورة الانفال)

অর্থঃ 'যেমন করে আল্লাহ আপনাকে সত্য সহকারে আপনার ঘর থেকে বের করেছেন।'

১৫·তানদুদ।

১৬·তানদুর।

১৭· আল–জাবেরাহ ঃ অর্থ খারাপ ও নষ্টের ক্ষতিপূরণকারী।

১৮·জাবার।

১৯· জাব্বারাহ। এই তিন নামের একই অর্থ।

২০· জাযীরাতুল আরব।

২১· আল–জুন্নাতুল হাসীনাহ ঃ অর্থ–মজবুত ঢাল।

২২· হাবীবাহ ঃ অর্থ প্রিয়া।

২৩· আল–হারাম ঃ সম্মানিত স্থান।

২৪· হারামু রাসূলিল্লাহ অর্থ রাসূলুল্লাহর সম্মানিত স্থান।

২৫·হাসানাহ।

২৬·খাইয়েরাহ।

২৭· খাইরাহ ঃ উভয়ের অর্থ হল উত্তম।

২৮· আদ্–দার (৬ষ্ঠ নামের মধ্যে এ প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে।)

২৯· দারুল আব্রার ঃ নেক লোকদের বাসস্থান।.

৩০· দারুল–ঈমান ঃ হাদীসে এসেছে মদীনাহ হচ্ছে দারুল ঈমান বা ঈমানেরঘর।

৩১· কুব্বাতুল ইসলাম ঃ ইসলামের গম্বুজ। হাদীসে এসেছে ঃ আল–মদীনাহ কুব্বাতুল ইসলাম।

৩২· দারুস–সুন্নাহ ঃ সুন্নাহর ঘর।

৩৩· দারুস–সালামাহ–শান্তির ঘর।

৩৪· দারুল ফাত্‌হ ঃ বিজয়ের ঘর।

৩৫· দারুল হিজরাহ। হযরত উমার উবনুল খাত্তাব বলেছেন ঃ 'আল–মদীনাহ দারুল হিজরাহ ওয়াস–সুন্নাহ'।

৩৬·জাতুল–হুজর ঃ হুজরাহ বিশিষ্ট। এতে রাসূলুল্লাহর হুজরাহ শরীফ থাকায় এই নামকরণ করা হয়েছে।

৩৭· জাতুল হেরার ঃ এলাকা বিশিষ্ট।

৩৮· জাতুন নাখল ঃ খেজুর বাগান বিশিষ্ট।

৩৯· সালাকাহ ঃ তাওরাতে মদীনাহ্‌র এই নাম বর্ণিত আছে। অর্থ প্রচন্ড গরম।

৪০· সাইয়েদাতুল বোলদান ঃ নগর শ্রেষ্ঠ।

৪১· শাফিয়াহ ঃ শেফা ও চিকিৎসামূলক। হাদীসে আছে, মদীনাহ্‌র মাটি দ্বারা রোগের চিকিৎসা হয়। তাই একে শাফিয়াহ বলা হয়।

৪২· তাবাহ।

৪৩· তাইবাহ।

৪৪· তাইয়েবাহ।

৪৫· তায়েব। এই ৪ টার একই অর্থ। অর্থাৎ পবিত্র। এই নগরী শিরক থেকে পবিত্র।

৪৬· জাবাব–অর্থ জ্বর। এখানে আসলে প্রথমে জ্বর হত। রাসূলুল্লাহর (সা) দোয়ার কারণে জ্বর চলে যায়।

৪৭· আল–আসেমাহ ঃ অর্থ নিরাপত্তা দানকারী। এটি মক্কার মুহাজিরদের নিরাপত্তারস্থান।

৪৮· আল–আজরা ঃ কুমারী। শত্রুর পদচারণা থেকে এর কুমারীত্ব সংরক্ষিতছিল।

৪৯· আল–আররা ঃ কুমারী মেয়ে।

৫০· আল–আরুদ ঃ সমতল এলাকা।

৫১· আল–গাররা ঃ সাদা চেহারা কিংবা সব কিছুর উত্তম জিনিস।

৫২· গালাবাহ ঃ বিজয়।

৫৩· আল–ফাদেহাহ ঃ অসম্মানকারী। এই শহর অপবিত্র জিনিস ও লোককে গ্রহণ করেনা।

৫৪· আল–কাসেমাহ ঃ বিদ্রোহ দমনকারী। যে এই শহরে বিদ্রোহ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন।

৫৫· দারুল আখইয়ার ঃ উত্তম লোকের ঘর।

৫৬· কারইয়াতুল আনসার ঃ আনসার পল্লী।

৫৭· কারইয়াতু রাসূলিল্লাহ ঃ নবী–পল্লী।

৫৮·কালবুল ঈমান ঃ ঈমানের অন্তরভূমি।

৫৯· আল–মুমেনাহ ঃ বিশ্বাসিনী।

৬০· আল–মুবারাকাহ ঃ বরকতময়।

৬১· মুবাওয়া আল–হালাল ওয়াল–হারাম ঃ হালাল–হারামের স্থান। এই স্থানেই হালাল–হারাম সম্পর্কিত বহু নির্দেশ নাযিল হয়েছে।

৬২· মুবাইয়েনুল হালাল ওয়াল হারাম ঃ হারাম–হালাল প্রকাশকারী।

৬৩· আল–মাজবুরাহ ঃ বাধ্য। আল্লাহ এই যমীনকে তাঁর নবীর বাসস্থানের জন্য বাধ্য ও নির্ধারিত করেছেন।

৬৪· আল–মুহাব্বাহ ঃ ভালবাসা।

৬৫· আল–মাহবুবাহ ঃ প্রেমিকা।

৬৬· আল–মাহবুরাহ ঃ খুশী ও নেয়ামত।

৬৭· আল–মুহাব্বাবাহঃ প্রেমিকা।

৬৮· আল–মুহাররামাহ ঃ সম্মানিত,

৬৯· আল–মাহফুফাহ ঃ ঘেরাওকৃত। বরকত ও ফেরেশতা দ্বারা ঘেরাওকৃত।

৭০· আল–মাহফুজাহ ঃ সংরক্ষিত। আল্লাহ মদীনাকে মহামারী ও দাজ্জাল থেকে হেফাজত করেছেন।

৭১· আল–মুখতারাহ ঃ নির্বাচিত। আল্লাহ কর্তৃক রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য নির্বাচিতশহর।

৭২· মাদখাল্ সিদক ঃ সত্যের প্রবেশ পথ। সত্য সহকারে রাসূলুল্লাহ (সা) তাতেপ্রবেশ করেন।

৭৩· আল–মাদীনাহ।

৭৪· মাদীনাতুর রাসূল ঃ রাসূলের শহর।

৭৫· আল–মারহুমাহ ঃ রহমতের স্থান।

৭৬· আল–মারযুকাহ ঃ রিযকের স্থান।

৭৭· মসজিদ–আল–আকসা। তাদেলী তাঁর মানসাক বইতে মাতালে' বইএর লেখকের বরাত দিয়ে এই নাম উল্লেখ করেছেন।

৭৮· আল–মিসকীনাহ ঃ বিনীত। এই শহর বিনীত লোকদের বাসস্থান।

৭৯· আল–মুসলেমাহ ঃ আনুগত্যকারিনী।

৮০· মাদজা' আর–রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা) এর শয়নগাহ।

৮১· আল মুতাইয়াবাহ ঃ উত্তম।

৮২· আল–মুকাদ্দাসাহ ঃ পবিত্র।

৮৩· আল–মাকাররু। রাসূলুল্লাহ দোয়া করেছিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا অর্থঃ 'হে আল্লাহ আমাদেরকে মদীনায় স্থায়িত্ব ও উত্তম রিযক দাও। 'কারার' থেকে এই নামকরণ করা হয়েছে।

৮৪· আল–মাক্কাতান ঃ দুই মক্কাহ। এর মধ্যে মদীনা একটি।

৮৫· আল–মাকীনাহ ঃ মর্যাদা।

৮৬· মুহাজার ঃ হিজরাতের জায়গা।

৮৭· আল–মুয়াফ্ফিয়াহ ঃ ওয়াদা পূরণকারিণী।

৮৮· আন–নাজিয়াহ ঃ নাজাতপ্রাপ্ত।

৮৯· নোবলা ঃ সম্ভ্রান্ত।

৯০· আন–নাহর ঃ প্রচন্ড গরম।

৯১· আল–হাজরা ঃ প্রচন্ড গরম।

৯২·ইয়াস্রাব।

৯৩· ইয়ানদুদ ঃ প্রসিদ্ধ খোশবু।

৯৪· ইয়ানদুর ঃ তাওরাতে এই নাম বর্ণিত হয়েছে।

প্রতিটি নামেরই তাৎপর্য আছে এবং মদীনার সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

মদীনা শরীফের ৯৯টি বৈশিষ্ট আছে।[১২] সেগুলো হচ্ছে ঃ

১· বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর (রা) এবং উমার (রা) সহ মদীনায় দাফনকৃত অধিকাংশ সাহাবীকে মদীনার মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ জিবরীল ও মীকাইল (আ) কে যমীন থেকে এক মুষ্টি মাটি আনার জন্য পাঠালেন। যমীন অস্বীকার করায় আল্লাহ আযরাইলকে পাঠান। তিনি এক মুষ্টি মাটি নেন। ইবলিস সমস্ত যমীনে বিচরণ করেছে। ফলে যমীনের কোন অংশে তার পা পড়েছে আর কোন অংশ দুই পায়ের মাঝে ছিল। যে সকল প্রাণ ইবলিসের পায়ের তলার মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলো দুষ্ট হয়েছে। আর শয়তানের পা যে মাটিতে লাগেনি, তা দিয়ে সকল নেককার অলী ও নবীদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত।[১৩] রাসূলুল্লাহ (সা) কে মক্কার অর্থাৎ কা'বার মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের আহবানে প্রথমে কা'বার মাটিই সাড়া দিয়েছিল এবং কাবা থেকেই যমীনের বিস্তার হয়েছে।

২· মদীনা অন্যান্য সকল স্থান থেকে উত্তম। এ ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা' (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩· উম্মাহর শ্রেষ্ঠ লোকদের সেখানে দাফন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম রয়েছেন।

৪· মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজ প্রাণ উৎসর্গকারী উত্তম শহীদানের কবর রয়েছে। তাদের ব্যাপারে নবী (সা) সাক্ষ্য দেবেন।

৫· আল্লাহ মদীনাকে সৃষ্টির সেরা ও সম্মানিত নবীর বাসস্থান বানিয়েছেন।

৬· আল্লাহ মদীনা বাসীদেরকে সাহায্য ও আশ্রয়দানের জন্য পসন্দ করেছেন।

---

১২। অফা আল অফা।। নূরুদ্দীন সামহুদী

১৩। অফা আল অফা।। নূরুদ্দীন সামহুদী

৭· অন্যান্য সকল শহর যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে। একমাত্র মদীনা কোরআন দ্বারা বিজিত হয়েছে। ইমাম মালেকের মত এটাই এবং ইবনে যাবালাহ তা উল্লেখ করেছেন।

৮· আল্লাহ মদীনা থেকেই অন্যান্য শহরগুলো বিজিত করেছেন। এমন কি মক্কাও। তিনি মদীনাকে দীনের প্রদর্শনীর কেন্দ্র বানিয়েছেন।

৯· কাদী আয়াদ উল্লেখ করেছেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় হিজরাত করা ওয়াজিব ছিল এবং মুহাজিরদেরকে সর্বাত্মক সাহায্য করা আনসারদের উপর ফরজ ছিল। যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় হিজরাত করেছেন তাদের জন্য হজ্জ ও উমরাহ শেষে মক্কায় মাত্র তিন দিন থাকার অনুমতি ছিল।

১০· কিয়ামতের দিন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা মদীনা থেকেই উঠবেন।

১১· মদীনার নাম হচ্ছে, মুমেনাহ–মুসলিমাহ অর্থাৎ বিশ্বাসিনী ও আনুগত্যকারিনী। আল্লাহ এই শহরকে এই বৈশিষ্ট সহ সৃষ্টি করেছেন।

১২· আল্লাহ কোরআনে মদীনাকে 'আরদুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর যমীন বলে উল্লেখ করেছেন। (সূরা নিসা–৯৭)

১৩· আল্লাহ মদীনাকে রাসূলুল্লাহর ঘর হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন,

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ (الانفال– ٥)

অর্থঃ অনুরূপভাবে আল্লাহ আপনাকে আপনার ঘর (মদীনা) থেকে সত্য সহকারে বের করে এনেছেন।

১৪· এক বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে মদীনার শপথ করে কথা বলেছেনঃ ( لاَ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَد (سورة البلد– ١) ) অর্থঃ আমি এই শহরের (মদীনার) শপথ করে বলছি–––-।

১৫· আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে মদীনার কথা আগে উল্লেখ করেছেনঃ

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাকে সত্যের প্রবেশ পথে প্রবেশ করাও এবং সত্যের নির্গমন পথ থেকে নির্গমন করাও। (সূরা ইসরা–৮০)

১৬· আল্লাহ তাওরাতে এই শহরের নাম মারহুমাহ (রহমতপ্রাপ্ত) উল্লেখ করেছেন।

১৭· রাসূলুল্লাহ (সা) এই শহরকে মক্কার মত কিংবা এর চাইতেও বেশী প্রিয় বানিয়ে দেয়ার দোয়া করেছেন এবং এজন্য এর এক নাম হচ্ছে হাবীবাহ বা প্রিয়া'।

১৮· মদীনায় পৌঁছার আগে, এর দেয়াল দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) সওয়ারীকে দ্রুত তাড়া করতেন। মক্কা থেকে মদীনায় পৌছার পথে তিনি আসায়াহ নামক স্থানে কাঁধ থেকে চাদর সরিয়ে বলতেন ঃ 'আমি মদীনার সুঘ্রাণ পাচ্ছি।'

১৯· রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার বরকতের জন্য দোয়া করেছেন।

২০· রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনাকে 'হারাম' (সম্মানিত) ঘোষণা করেছেন।

২১· তিনি নিজহাতে সেখানে মসজিদে নবওয়ী প্রতিষ্ঠা করেন এবং উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সাহাবায়ে কেরাম তাতে অংশ নেন।

২২· সেখানে এমন মসজিদ রয়েছে যার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ কোরআনে বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে কুবা মসজিদ। আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

অর্থঃ যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত (সূরা তাওবাহ–১০৮)

২৩· রাসূলুল্লাহর (সা) হুজরাহ ও মিম্বারের মাঝখানে বেহেশতের বাগান সমূহের একটি বাগান রয়েছে। এই মসজিদের এই অংশটুকু ছাড়া গোটা যমীনে বেহেশতের আর কোন অংশের অস্তিত্বের কথা বর্ণিত নেই।

২৪· তাঁর মিম্বার মুবারক বেহেশতের সিঁড়ির উপর অবস্থিত। আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِى অর্থঃ আমার মিম্বার আমার হাউজে (কাউসারের) উপর।

২৫· মসজিদে নবওয়ীতে ইবাদাতে এক হাজার গুণ বেশী সওয়াব হয়।

২৬· তাবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে আমার এই মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামায পড়বে, তাকে দোযখ ও আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং সে মুনাফেকী থেকেও মুক্তিপাবে।'

২৭· মসজিদে নবওয়ীতে নামাযের উদ্দেশ্যে পবিত্রতা সহকারে আগমনকারী ব্যক্তি হজ্জের সওয়াব পাবে এবং ঘর থেকে মসজিদের উদ্দেশ্যে

আসার পথে প্রতি কদমে একটি সওয়াব ও একটি গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে। (হাদীস)।

২৮· হাদীসে রয়েছে, ঘর থেকে অযূ করে মসজিদে কুবায় গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়লে একটি উমরাহর সওয়াব পাওয়া যায়।

২৯· হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'মদীনায় রমজান মাসের রোজা অন্য জায়গার এক হাজার রোজার চাইতে উত্তম এবং মদীনার জুমআর নামায অন্য জায়গার ১ হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।' অন্যান্য নেক কাজগুলোর সওয়াবও অনুরূপ। তবে মদীনায় যে সকল ইবাদাতের হুকুম নাযিল হয়েছে সেগুলো মক্কা অপেক্ষা মদীনায় আদায় করা উত্তম বলে কেউ কেউ মনে করেন।

৩০· হাদীসে রয়েছে, মসজিদে নবওয়ী থেকে আযান শুনার পর বিনা প্রয়োজনে বের হওয়া এবং পুনরায় ফিরে না আসা মুনাফেকী।

৩১· মদীনার মসজিদে নবওয়ীতে শিক্ষা–দীক্ষা কার্যকর ছিল।

৩২· মসজিদে নবওয়ীতে অধিকতর আদব–কায়দা ও নিম্নস্বরে কথা বলতে হয়। কেননা, সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) শায়িত আছেন।

৩৩· মসজিদে নবওয়ীতে রাসূলুল্লাহর (সা) মেহরাব (নামায পড়ার স্থান) সুনির্দিষ্টআছে।

৩৪· রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বার ও মসজিদের মুসাল্লার মাঝে বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান অবস্থিত।

৩৫· হাদীসে আছে 'ওহোদ পাহাড় বেহেশতের সিঁড়িসমূহের একটি' এবং 'ওহোদ আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও ওহোদকে ভালবাসি।'

৩৬· হাদীসে বর্ণিত আছে, বাতহা উপত্যকা বেহেশতের সিঁড়ি সমূহের একটির উপর অবস্থিত।

৩৭· রাসূলুল্লাহ (সা) আকীক উপত্যকাকে 'মুবারক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আরেক হাদীসে রয়েছে 'আমরা আকীককে ভালবাসি, আকীকও আমাদেরকেভালবাসে।'

৩৮· রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় বসবাস করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

৩৯· রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় মৃত্যুর ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং তাদের জন্য সাক্ষ্য ও সুফারিশের ওয়াদা করেছেন।

৪০· মদীনায় মৃত্যুর ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

৪১· মদীনার অধিবাসীরা সর্বপ্রথম সুফারিশ লাভ করবেন এবং তাদের জন্য সম্মান ও অধিকতর সুফারিশের নিশ্চয়তা রয়েছে।

৪২· মদীনার মুর্দাগণের নিরাপদ পুনরুত্থান হবে।

৪৩· বাকী গোরস্থান থেকে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল ৭০ হাজার লোককে পুনরুত্থিত করে বিনা হিসেবে বেহেশতে পাঠানো হবে। অনুরূপভাবে, বনি সালামাহ গোরস্থান থেকেও লোকদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

৪৪· অন্যান্য সকল লোকের আগে মদীনা বাসীদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে।

৪৫· মদীনার গরম ও তাপ সহ্যকারীদের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) সুফারিশ কিংবা সাক্ষ্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

৪৬· মসজিদে নবওয়ী যেয়ারতকারীর জন্য তাঁর সুফারিশ ওয়াজিব হবে। (হাদীসটি দুর্বল)

৪৭· রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের পার্শে দোয়া কবুল হয়। এ ছাড়াও তাঁর মিম্বারের কাছে, মসজিদে ফাতহ, মসজিদে এজাবাহ ও মসজিদে সুফিয়ায় দোয়া কবুল হয়।

৪৮· মদীনা অপবিত্র লোকদেরকে দূর করে দেয়।

৪৯· আগুন যেমন লোহার মরিচা দূর করে মদীনাও তেমনি গুনাহ দূর করে।

৫০· মদীনাবাসীদের উপর যুলুম ও ভীতি প্রদর্শনকারীর কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে।

৫১· হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে মদীনাবাসীদের ক্ষতি করার ইচ্ছা করবে, লবণ যেমন পানিতে মিশে যায়, ঠিক আল্লাহও তাকে এমনি করে গলিয়ে দেবেন, এক বর্ণনায় রয়েছে, 'আল্লাহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন।'

৫২· যে ব্যক্তি মদীনায় কোন দুর্ঘটনা ঘটায় কিংবা কোন দুর্ঘটনাকারীকে আশ্রয় দেয়, তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির হুমকি রয়েছে।

৫৩· মদীনাবাসীদেরকে সম্মান না করলে শাস্তি হবে। উম্মাহর উপর তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ওয়াজিব।

৫৪· হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে মদীনাবাসীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, সে যেন আমার দুই পার্শ্বে ভীতি প্রদর্শন করল।'

৫৫· কেউ মদীনা থেকে অনাগ্রহী হয়ে বাইরে না গেলে তার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তার উত্তম কল্যাণ দেবেন। (মুসলিম)। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে বাইরে গেলে এবং মদীনাকে অপসন্দ না করলে, অনুপস্থিতির সময়টুকুও বরকতময় হবে।

৫৬· মদীনা থেকে সংক্রামক রোগ ও জ্বর দূরে সরিয়ে আল্লাহ একে সম্মানিত করেছেন।

৫৭· মদীনার মাটিতে শেফা ও চিকিৎসা রয়েছে।

৫৮· মদীনায় দাজ্জালের প্রবেশাধিকার নেই।

৬৯· তাবরানীতে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সকল মুসলমানের উচিত মদীনা যেয়ারত করা।

৬০· রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সালাম দেয়া যায় ও উত্তর পাওয়া যায়।

৬১· মদীনায় ঈমান পুনরায় ফিরে আসবে।

৬২· মদীনার প্রহরা ফেরেশতাদের উপর অর্পিত।

৬৩· প্রথম মসজিদ (মসজিদে কুবা) মদীনায় নির্মিত হয়েছে।

৬৪· মসজিদে নবওয়ী আম্বিয়ায়ে কেরামের পক্ষ থেকে সর্বশেষ মসজিদ।

৬৫· মদীনায় অধিক মসজিদ, ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন বিদ্যমান। তাই ইমাম মালেক বলেছেন, কিভাবে আমি মদীনাকে ভাল না বাসি, যেখানে এমন কোন রাস্তা নেই যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) চলেননি এবং জিবরীল (আ) আল্লাহর কাছ থেকে প্রতি এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসেছেন?

৬৬· মদীনায় স্নিগ্ধ বাতাস ও মাটির বিশেষ সুঘ্রাণ রয়েছে।

৬৭· মদীনার জীবন যাপন আরামদায়ক ও সুখকর।

৬৮· মসজিদে নবওয়ীর মিম্বারের পার্শ্বে মিথ্যা শপথকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির হুমকি রয়েছে।

৬৯· মদীনার এক রাস্তা দিয়ে প্রবেশ ও ভিন্ন রাস্তা দিয়ে বের হওয়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা) অনুরূপ করতেন।

৭০· মদীনায় প্রবেশের জন্য গোসল করা উত্তম।

৭১· মদীনায় দোয়া করা ও মৃত্যু প্রার্থনা করা উত্তম।

৭২· মদীনা চিরন্তন দারুল ইসলাম। হাদীসে বর্ণিত আছে, 'শয়তান এতদঞ্চলে তার পূজার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে।'

৭৩· মদীনা হচ্ছে হজ্জ ও উমরার দূরতম মীকাত। মদীনাবাসীদের সম্মানে আল্লাহ এই ব্যবস্থা করেছেন।

৭৪· মদীনা থেকে ইহরাম পরা উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) সেখান থেকে ইহরাম পরে হজ্জ ও উমরাহ করেছেন।

৭৫· মদীনাবাসী ৩৬ রাকাত তারাওয়ীহর নামায পড়ত।

৭৬· মক্কার চাইতেও মদীনায় বরকত বেশী। এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার জন্য মক্কার চাইতে ৬ গুণ বেশী বরকতের দোয়া করেছেন।

৭৭· নাসাঈ, বাজ্জার ও হাকেমে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে ঃ 'মানুষ উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আলেম তালাশ করতে থাকবে। তবে মদীনার আলেমের চাইতে বেশী জ্ঞানী আলেম কোথাও পাবেনা।'

৭৮· চিকিৎসার উদ্দেশ্য ব্যতীত হারামে মদীনার মাটি ও পাথর অন্যত্র স্থানান্তর করা হারাম।

৭৯· মদীনায় অস্ত্র বহন করা হারাম।

৮০· ঘোষণা দানের উদ্দেশ্য ছাড়া মদীনায় পড়ে থাকা জিনিস উঠানো যাবেনা।

৮১· মদীনায় শিকার করা ও গাছপালা কাটা যাবেনা। শিকারীর সব কিছু ছিনিয়ে নিতে হবে।

৮২· চিকিৎসার জন্য মদীনার মাটি অন্যত্র নেয়া যাবে।

৮৩· মদীনার চারপাশে রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যত সতর্কবাণী অনুযায়ী হেজাযের অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছিল।

৮৪· মদীনার বাজারের বরকতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করেছেন।

৮৫· মদীনার বাজারের ব্যবসায়ী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য বলে হাদীসে বর্ণিত আছে।

৮৬· মদীনার মওজুদদার আল্লাহর কোরআনে বর্ণিত কাফেরের সমান।

৮৭· রাসূলুল্লাহ (সা) স্বপ্নে দেখেন, তিনি বেহেশতের একটি কূপের কাছে জেগেছেন। সেই দিন তিনি গারস কূপের কাছে ভোরে জেগেছিলেন।

৮৯· হাদীসে রয়েছে, 'মদীনার আজওয়া হচ্ছে বেহেশতের খেজুর।'

৯০· রাসূলুল্লাহর (সা) কবর যেয়ারতের মান্নত করলে তা পূরণ করা জরুরী।

এছাড়াও আরো ৯টি বৈশিষ্ট আছে যেগুলো এখানে উল্লেখ করা হলনা।

আল্লাহ যে শহরকে তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর বসবাসের জন্য নির্ধারণ করলেন, সেই শহরের মর্যাদা অপরিসীম। মক্কা শরীফের হারাম এলাকার মত মদীনা শরীফেরও হারাম এলাকা (সম্মানিত এলাকা) রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'হে আল্লাহ, ইবরাহীম (আ) যেভাবে মক্কাকে হারাম এলাকা ঘোষণা করেছেন, আমিও সেভাবে মদীনার দুই প্রস্তরময় এলাকার মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করছি।' মুসলিম শরীফের অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'হে আল্লাহ, ইবরাহীম (আ) মক্কাকে সম্মানিত ঘোষণা করে তাকে হারাম এলাকা বানিয়েছেন। আমিও মদীনার দুই প্রস্তরময় এলাকার মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করলাম। এতে রক্ত প্রবাহিত করা যাবেনা, যুদ্ধের জন্য অস্ত্র বহন করা যাবে না।' দুই প্রস্তরময় এলাকা বা হাররাহ বলতে বুঝায়, পূর্ব দিকের হাররা ওয়াকেম ও পশ্চিম দিকের হাররাহ ওয়াবরাহ।

কোরআনে মদীনার ফজীলত সম্পর্কে এসেছেঃ (সূরা ইসরা-৮০)

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ

অর্থ- 'এবং বল, হে রব! আমাকে সত্যের প্রবেশ স্থানে প্রবেশ করাও এবং সত্যের প্রস্থান স্থান থেকে প্রস্থান করাও।' এখানে সত্যের প্রবেশ স্থান বলতে মদীনাকে বুঝানো হয়েছে।

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কামারের হাঁপর যেমন লোহার মরিচা ও খাদ দূর করে তেমনি মদীনাও নিকৃষ্ট লোকদেরকে বের করে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

জুনাইদী থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করেছেনঃ 'হে আল্লাহ, তুমি মদীনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও যেমন করে তুমি মক্কাকে আমাদের কাছে প্রিয় করেছ, বরং মক্কা অপেক্ষা এই শহরকে অধিকতর প্রিয় করে দাও। এই শহরকে আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল করে দাও এবং মদীনার সা' ও মুদে বরকত দাও, (এ দু'টো হচ্ছে মদীনার দ্রব্য পরিমাপ যন্ত্র), মদীনা থেকে জ্বরকে জোহফায় (রাবেগ) স্থানান্তর করে দাও।'

হিজরাতের পর অনেক সাহাবী মদীনায় এসে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের জন্য এই দোয়া করেন।

জুনাইদী থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন যালিম যদি মদীনাবাসীদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে এমন ভাবে গলিয়ে দেবেন যেমন পানি লবনকে গলিয়ে দেয়।

ইবনে যাবালাহ সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, যে আমার ও আমার এই শহরের অধিবাসীদের ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষন করে, তাকে তাড়াতাড়ি ধ্বংস করে দাও।' রাবী বলেন, তিনি এই পরিমাণ উঁচুতে হাত উঠালেন যে, আমরা তাঁর বগলের নীচ পর্যন্ত দেখতে পেলাম।

তাবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'হে আল্লাহ, যে মদীনাবাসীর উপর যুলুম করে এবং তাদেরকে ভয় দেখায় তুমি তাদেরকে ভীত করে দাও, তার উপর আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, ফিরিশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ। তার কোন ভাল ও ন্যায় কাজ আল্লাহ কবুল করবেন না।'

হযরত উমার (রা) দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ, আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাত এবং তোমার নবীর শহরে মৃত্যুদান করো। (বুখারী)

নাসাঈ শরীফে ইয়াযিদ বিন আবি মালেক হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, মি'রাজের রাত্রের ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি গাধার চাইতে বড় ও খচ্চরের চাইতে ছোট একটি প্রাণীর উপর (বোরাক) সওয়ার হলাম। সাথে রয়েছেন জিবরীল (আ)। আমরা রওনা হলাম। পথে জিবরীল বলেন, হে মুহাম্মাদ, নামায পড়ুন। আমি তাই করলাম। জিবরীল প্রশ্ন করেন, আপনি কি জানেন কোথায় নামায পড়েছেন? আপনি 'তাইয়্যেবায় (মদীনায়) নামায পড়েছেন এবং এটিই আপনার হিজরাতের স্থান।

তাবরানী ও বাজ্জার শাদ্দাদ বিন আউস থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ মি'রাজের রাত্রে আমি খেজুর বাগান বিশিষ্ট যমীন দিয়ে অতিক্রম করি। তখন জিবরীল বলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি নামুন ও নামায পড়ুন। তিনি নেমে নামায পড়েন। জিবরীল বলেন, আপনি ইয়াসরাবে নামায পড়েছেন।

তাবরানী আল–কাবীর গ্রন্থে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসে রয়েছে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ মদীনার দিকে লক্ষ্য করলেন। তখন এটি ছিল অনাবাদী প্রস্তরময় ভূমি। তিনি বললেন, হে ইয়াসরাব বাসী, আমি তোমাদেরকে তিনটা শর্ত সাপেক্ষে সকল নেয়ামত দান করবো। শর্তগুলো হচ্ছেঃ ১· তোমরা নাফরমানী করবেনা, ২· উঁচু ভাব প্রকাশ করবেনা ও ৩· অহংকার করবেনা। যদি তোমরা এর কোনটা কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে লাগামহীন উটের মত ছাড়বো যা অবাধ বিচরণ করবে এবং কেউ তাকে বাধা দেবেনা।

সুলাইমান আবি আমর শায়বানী থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, প্রথমে যমীন ছিল পানি। আল্লাহ তখন বাতাস পাঠালেন। ফলে ফেনার মত পানির উপর যমীন ভেসে আসল। আল্লাহ ঐ যমীনকে ৪ খন্ডে ভাগ করলেন। সেগুলো হচ্ছে, মক্কা, মদীনা, বাইতুল মাকদেস ও কুফা।[১৪]

মারজানী তাঁর 'আখবার–আল–মদীনা' বইতে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

لَيَعُوْدَنَّ هٰذَا الاَمْرُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا بَدَاَمِنْهَا حَتّٰى لاَ يَكُوْنَ اِيْمَانٌ اِلاَّ بِهَا

অর্থঃ 'এই বিষয়টি অর্থাৎ ইসলাম এমন ভাবে মদীনায় ফিরে আসবে যেমনি করে তা এখান থেকে শুরু হয়েছিল এবং মদীনা ব্যতীত আর কোথাও ঈমান অবশিষ্ট থাকবেনা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ إِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

অর্থঃ 'সাপ যেমন গর্তে ফিরে আসে, তেমনি ঈমানও মদীনায় ফিরে আসবে।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে মদীনায় বসবাস করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَا ئِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا أَوْ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ 'যে মদীনার গরম ও কঠোরতা বরদাশত করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষী কিংবা সুফারিশকারী হবো।'

---

১৪· অফা–আল–অফা–১মখন্ড।। নূরুদ্দিন সামহূদী

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, এটা পাপী মুমিনের সুফারিশের অতিরিক্ত। কারো মতে, তিনি গুণাহগারদের বিরুদ্ধে সাক্ষী এবং নেককারদের জন্য সুফারিশকারী হবেন অথবা তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যু বরণকারীদের জন্য সাক্ষী এবং পরবর্তীদের জন্য সুফারিশকারী হবেন।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করেছেন, 'হে আল্লাহ, মদীনায় তুমি মক্কার দ্বিগুন বরকত দাও।' ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মদীনায় ১ মাস রোযা রাখা অন্য জায়গায় এক হাজার মাস রোযা রাখার সমান। (বুখারী)

অপর এক হাদীসে লিসা (রা), রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির পক্ষে মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সম্ভব, সে যেন তাই করে। যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করে, আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষী ও সুফারিশকারী হবো।' তিরমিযী শরীফেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'মদীনার প্রবেশ পথ সমূহে পাহারাদার ফিরিশতা নিয়োজিত রয়েছে। সেখানে মহামারী ও দাজ্জালের প্রবেশাধিকার নেই। (বুখারী ও মুসলিম)। হযরত আবু বকর (রা) বলেছেন, 'মদীনায় মসীহ আদ্-দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবেনা। তখন মদীনার ৭টি প্রবেশ পথ থাকবে এবং প্রত্যেক প্রবেশ পথে দু'জন ফিরিশতা পাহারাদার থাকবে।' হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'মক্কা ও মদীনা ব্যতীত দুনিয়ার আর সব জায়গায় দাজ্জালের পদচারণা ঘটবে।'

## মদীনার মাটি ও ফলের উপকারিতা

ইবরাহীম বিন আবিল জাহম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) হারেস বিন খাযরাজের বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন যে, ঐ পরিবারের সবাই অসুস্থ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, আমরা জ্বরে আক্রান্ত। তিনি বিশেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, সুহাইবের জ্বরের চিকিৎসার ব্যাপারে তোমরা কি করলে? তারা উত্তরে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি করবো? তখন তিনি বললেন, তোমরা (মদীনার) মাটি পানিতে মিশিয়ে তাতে সামান্য থুথু দিয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে রোগীকে গোসল দিলে আরোগ্য লাভ করবে।ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تُرَابُ اَرْضِنَا بِرِيْقِ بَعْضِنَا شِفَاءٌ لِمَرِيْضِنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا

অর্থঃ 'আল্লাহর নামে, আমাদের যমীনের মাটি, আমাদের কারুর থুথু মিশ্রিত অবস্থায়, আল্লাহর হুকুমে, আমাদের রোগীদের জন্য আরোগ্য লাভের উপায়।' এই ভাবে করায় জ্বরাক্রান্ত সাহাবী সুহাইবের জ্বর সেরে গেল।

আবু সালামাহ বিন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে। পায়ে জখম বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আনা হল। তখন তিনি বিছানার এক কোন উপরের দিকে তুলে বৃদ্ধাঙ্গুলীর সাথে আঙ্গুলে থুথু লাগিয়ে তা মাটিতে রাখেন এবং বলেন,

بِسْمِ اللّٰهِ رِيْقُ بَعْضِنَا بِتُرْبَةِ اَرْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا

অর্থঃ 'আল্লাহর নামে আমাদের থুথু আমাদের যমীনের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় আল্লাহর হুকুমে আমাদের রোগীদের আরোগ্য লাভের উপায়।' তারপর তিনি ক্ষত স্থানে আঙ্গুল রাখলেন। মনে হল যেন, আহত লোকটি বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করল। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মদীনার বালু কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা। (বুখারী)

জামিউল উসুল গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে, তাঁর কসম করে বলছি, মদীনার বালু সকল রোগের নিরাময়। রাবীর মতে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কুষ্ঠ ও শ্বেতরোগের নিরাময়।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে কোন লোকের অসুখ হলে, কারুর ঘা থাকলে কিংবা কেউ আহত হলে, সুফিয়ান নিজ আঙ্গুল যমীনে রেখে তা উপরে তুলে দেখিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও অনুরূপ ভাবে আঙ্গুল যমীনে রেখে তা তুলে বলতেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقِ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا

এবং তারপর তা রোগীর গায়ে লাগাতেন।

এ সকল হাদীসের উপর ভিত্তি করে উলামায়ে কেরাম রোগের চিকিৎসা ও আরোগ্যের জন্য মদীনার হারাম সীমানার মাটি বাইরে নেয়াকে জায়েয বলেছেন।

ইবনে যাবালাহ থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকালে, মদীনার উঁচু অংশে উৎপাদিত ৯টি আজওয়া খেজুর খাবে, ঐদিন তাকে বিষ বা যাদু ক্ষতিগ্রস্ত করতেপারবেনা।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে মদীনার হারামে উৎপাদিত ৭টি আজওয়া খেজুর খায় ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন জিনিস তার ক্ষতি করতে পারবেনা। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলায় ৭টি আজওয়া খেজুর খায়, ঐ দিন কোন বিষ ও যাদু তার ক্ষতি করতে পারবেনা।

ইমাম আহমাদ সহীহ সনদে বর্ণিত এক হাদীসের শেষাংশে বলেছেন, আজওয়া বেহেশতের ফল।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আজওয়া রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয় খেজুর ছিল।

হযরত জাবির (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মদীনার এক খেজুর বাগানে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীর (রা) হাত ধরেছিলেন। তিনি বলেন, আমরা একটি বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় একটি খেজুর গাছ জোরে শব্দ করে বলল, তিনি হচ্ছেন, সাইয়েদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ (সা) এবং উনি হচ্ছেন সাইয়েদুল আওলিয়া ও ইমাম শ্রেষ্ঠ। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে। আমরা একটি খেজুর গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খেজুর গাছটি চীৎকার করে বলতে লাগলঃ তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ এবং উনি হচ্ছেন আলী–সাইফুল্লাহ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীর দিকে তাকিয়ে বলেন, এর নামকরণ করা হউক( اَلصَّيْحَانِى ) আস্–সীহানী। সেই দিন থেকে ঐ খেজুর গাছটি সীহানী নামে পরিচিত। কেননা, আরবীতে, 'সাইহুন' শব্দের অর্থ হচ্ছে, আওয়ায করা। শেখ শরীফ বলেছেন, ঐ বাগান এখন পর্যন্ত ঐ নামেই পরিচিত। বাগানটি সফওয়া বিন সুলাইমান আত্–তোফাইলী আল–হুসাইনীর উত্তরাধিকারীদের মালিকানায় আছে। তাঁরা বনি হুসাইনের শ্রেষ্ঠ বংশধর।

মদীনায় ১৩৩ থেকে ১৩৯ প্রকার খেজুর আছে। আ'জওয়া হচ্ছে মরিয়মের (আ) সেই খেজুর গাছ যার কথা কোরআনে উল্লেখ আছে।[১৫] আ'জওয়া খেজুর

---

১৫. উমদাতুল আখবার ফী মাদীনাতুল মুখতার।। সাইয়েদ আসআদ দারাবযোনী।

কিছুটা কাল  এবং তা সীহানী খেজুর থেকে অপেক্ষাকৃত বড়। রাসূলুল্লাহ (সা) সালমান ফারেসীর বাগানে নিজহাতে আজওয়া খেজুর লাগান। ঐ বাগান মদীনার পূর্বাঞ্চলীয় উঁচু ভাগে ফকীর নামক জায়গায় অবস্থিত ছিল।

আহমাদ থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'তোমাদের উত্তম খেজুর হচ্ছে বারনী। এটা রোগ দূর করে এবং তাতে কোন রোগ নেই।'

হিজরাত অর্থ দেশ ত্যাগ। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্মভূমি মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় চলে যান। দীন প্রচারে যুলুম-নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দেশ ত্যাগ নবীদের সুন্নাহ। এই সুন্নাহর যেখানে যতটুকু অভাব, সেখানে দীন প্রচারও তত খানি দুর্বল। বাতিলের সাথে আপোষ করলে এসকল নির্যাতন ও সুন্নাহর প্রয়োজন নেই। আর নবীর (সা) মত আপোষহীন ভূমিকা পালন করলে ঐ সকল কঠোর সুন্নাহ বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেই হয়।

দীন প্রচারের কারণে, মক্কার মুশরিকগণ তাঁর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল নির্যাতন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যার উদ্যোগ নেয়। মসজিদে হারামে অবস্থিত দারুন-নাদওয়া তথা তদানীন্তন মক্কা পরিষদে মক্কার নেতাদের এক বৈঠক বসে। বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর আবু জাহলের প্রস্তাব অনুযায়ী, মক্কার প্রতিটি গোত্রের একজন করে যুবক হাতে তলোয়ার নিয়ে মুহাম্মাদকে রাত্রে হত্যা করার গোপন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর জিবরীল (আ) ওহী নিয়ে আসেন এবং মুহাম্মাদ (সা) কে বলেন, আল্লাহ আপনাকে হিজরাতের আদেশ দিয়েছেন এবং এই রাত্রেই আপনাকে হিজরাত করতে হবে।

তিনি হযরত আবুবকরের ঘরে যান এবং তাঁকে সহ হিজরাতের পরিকল্পনা নেন। এদিকে দুশমনরা ভোরে গৃহীত নৈশ অভিযানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সারাদিন ব্যাপী প্রস্তুতি নেয়। তারা মোট ১১ ব্যক্তি রাত্রের অন্ধকার নেমে আসার পর নবীর (স) ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং মধ্যরাতের পর হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়।

আল্লাহ দুশমনদেরকে চরম ধোকায় ফেলে দেন এবং তারা নিজেদের মিশনে ব্যর্থ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে বলেন, আমার ইয়েমনী চাদরটি পরে আমার বিছানায় শুয়ে থাক। দুশমন তোমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। তাঁর কাছে তিনি কুরাইশদের রাখা আমানত বুঝিয়ে দেন

এবং তাদের দিকে একমুষ্টি বালু নিক্ষেপ করে তাদের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে যান। তারা তাঁকে আল্লাহর কুদরতে দেখতেই পায়নি। তিনি হযরত আবু বকরের ঘরে যান এবং তাঁকে নিয়ে মদীনার বিপরীত দিকে ইয়েমেনের পথে পাহাড় গুহায় আশ্রয় নেন। কেননা, শত্রুরা তাঁর তালাশে বের হবে এবং তাঁকে মদীনার পথেই তালাশ করবে। ইতিপূর্বে ২য় আকাবার শপথ গ্রহণ করে মদীনাবাসীরা তাঁকে এই দুর্দিনে মদীনা যাওয়ার আমন্ত্রন জানিয়েছিল। তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে, শত্রুদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে উক্ত গুহায় পৌছেন। সেদিন ছিল নবুওয়াতের ১৪শ সালের ২৭শে সফর মুতাবেক, ১২/১৩ সেপ্টেম্বর, ৬২২ হিজরী সন। তাঁরা শুক্র, শনি ও রবিবার এই তিন রাত গুহায় থাকেন। আবদুল্লাহ বিন আবুবকরও তাঁদের সাথে রাত কাটান। ভোর রাত্রে তিনি কুরাইশদের মধ্যে ফিরে আসতেন যেন তারা বুঝতে না পারে যে, তিনি রাত্রে মক্কায় ছিলেননা। দিনে কুরাইশদের সকল খবর সংগ্রহ করে রাত্রে গুহায় যেতেন ও তাঁদেরকে তা অবহিত করতেন। হযরত আবু বকরের গোলাম আমের বিন ফুহাইরা পাহাড়ের কাছে বকরী চরাত এবং তাঁদেরকে দুধ পান করাত। কুরাইশরা সর্বত্র তালাশ করে না পেয়ে জরুরী বৈঠকে মিলিত হয় এবং তাঁদের ২জনকে ধরে দিতে পারলে ১শ উট পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে। ফলে, এই বিরাট পুরস্কারের আশায় অশ্বারোহী, পদব্রজ অনুসন্ধানকারী এবং পায়ের চিহ্ন বিশেষজ্ঞরা সকল মাঠ-ঘাট ও পাহাড় পর্বতে তল্লাশী শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা সাওর গুহায়ও পৌছে। কিন্তু আল্লাহ তাঁদেরকে হেফাজত করেন। আবু বকর (রা) পেরেশান হয়ে বলেন, তারাতো আমাদেরকে দেখে ফেলল প্রায়। রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চিন্তে বলেন, পেরেশান হয়োনা, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

তিনদিন পর্যন্ত কুরাইশরা হন্যে হয়ে তালাশ করে এবং খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়। তল্লাশীর তীব্রতা কমে আসার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকরকে সাথে নিয়ে মদীনার পথে রওনা হন। তাঁরা পথ প্রদর্শক হিসেবে আবদুল্লাহ বিন উরাইকাত আল-লিসীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ করেন। অথচ সে মুশরিক ছিল। তাঁরা তাকে বিশ্বাস করে তার কাছে নিজেদের দুটো সওয়ারী হস্তান্তর করেন এবং তিনদিন পর সাওর গুহায় মিলিত হওয়ার জন্য চুক্তি করেন।

আসমা বিনতে আবি বকর সফরের খাদ্য সামগ্রী তৈরী করেন, কিন্তু তা সওয়ারীর সাথে বেঁধে দিতে ভুলে যান। পরে তিনি নিজ কোমরের রশি দুই ভাগ করে ১ ভাগ দিয়ে  খাদ্য সামগ্রী বেঁধে দেন এবং অন্য অংশ নিজের কোমরে বাঁধেন। কোমরের রশিকে আরবীতে নিতাক বলে। পরবর্তীতে একই কারণে তাঁকে জাতুনিতাকাইন বা দুই রশি ধারিণী বলে অভিহিত করা হত। তাঁরা লোহিত সাগরের তীর দিয়ে মদীনার দিকে এগুতে থাকেন। তাঁরা প্রথমে সাওর পাহাড় থেকে কিছুটা দক্ষিনে এগুতে থাকেন এবং পরে পশ্চিমে সাগর উপকূলের দিকে রওনা করেন। একটি অপরিচিত পথে পৌছার পর তাঁরা উত্তর দিকে মোড় নেন। তাঁরা ওসফানের পশ্চিম দিয়ে কুবায় পৌঁছেন।

বুখারী শরীফে হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের সারসংক্ষেপ হল, তিনি বলেন, যাত্রার পরের দিন আমরা এক বড় ছায়াদার পাথরের কাছে বিশ্রাম নিই। রাসূলুল্লাহ কে (সা) ঘুমানোর অনুরোধ জানিয়ে আমি এদিক-ওদিক পাহারা দিচ্ছি। আমি তখন বকরীসহ একজন রাখালকে এই পাথরের দিকে আসতে দেখি। আমি তাকে দুধ দেয়ার অনুরোধ জানালে সে দুধ দুইয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমে থাকায় আমি তাঁকে জাগানো পসন্দ করিনি। পরে তিনি জাগলে আমি তাঁকে দুধ পান করাই। আল্লাহর কি অসীম কুদরত! দুর্গম মরুভূমি এবং অপরিচিত পথে আল্লাহ একজন রাখালকে পাঠিয়ে প্রিয় নবীর খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

সুরাকাহ বিন মালেক নিজ মুদলাজ গোত্রের এক আসরে বসা ছিল। তাদের গোত্রের এক ব্যক্তি এসে তাকে বলল, আমি সমুদ্র উপকূলে মুহাম্মাদ ও তার সাথীদেরকে দেখতে পেয়েছি। সুরাকাহ পুরষ্কার লাভের সুযোগ ধরার উদ্দেশ্যে তাকে বলল, 'তুমি মুহাম্মাদকে নয় বরং অন্য কাউকে দেখেছ যারা আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেল। অথচ সে ঠিকমতই বুঝেছে যে তাঁরা ছিলেন মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সহচরবৃন্দ। সে মজলিসে কিছুক্ষণ দেরী করে উঠে যেন কেউ কিছু বুঝতে না পারে। সে বলে, আমি ঘরে গিয়ে আমার দাসীকে বলি যেন আমার ঘোড়াটি কিছুটা দূরে বের করে দিয়ে আসে। আমি ঘরের পেছন দিয়ে তীর নিয়ে ঘোড়ায়  করে দ্রুত যাত্রা শুরু করি। আমি মুহাম্মাদের (সা) কাছে পৌছার পর ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে মাটিতে বসে যায়। আমি নীচে নেমে তীর বের করি। তারপর লটারী তীর নিক্ষেপ করে দেখি যে তাতে দুর্ভাগ্যের তীর

উঠে। তারপর আমি তীর ফেলে দিয়ে আবার ঘোড়ায় উঠি এবং রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে পৌছি। এমনকি আমি তাঁর কোরআন তেলাওয়াতের শব্দ শুনতে পাই। তিনি কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই চলছেন, কিন্তু আবু বকর (রা) চারদিকে লক্ষ্য রাখছেন। এবার আমার ঘোড়ার পা বালুতে ঢুকে পড়ে। আমি নেমে পড়ি এবং ঘোড়াটিকে পুনরায় উঠানোর চেষ্টা করি। ঘোড়াটি সামনের দুই পা দিয়ে প্রচন্ড বেগে বালু উড়ায় যা আকাশে ধোঁয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে। আমি এবারও তীর দিয়ে লটারী চালাই এবং তাতে দুর্ভাগ্যের তীর উঠে।' এই পরিস্থিতিতে সুরাকাহ রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিরাপত্তা কামনা করে। তিনি থামেন এবং নিরাপত্তা দেন। তারপর সে তাঁর নিকট পুরো ঘটনা বর্ণনা করে।

এবার সুরাকাহ নিজের পথের সম্বল তাদের খেদমতে পেশ করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তা নিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমাদের খবরটুকু গোপন রাখবে। সুরাকাহ তাঁকে লিখিত নিরাপত্তার অনুরোধ জানায়। তাকে তা দেওয়াহয়।

পথ চলার সময় রাসূলুল্লাহর (সা) কাফিলাহ খোযাআহ গোত্রের উম্মে মা'বাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। ঐ মহিলা তাঁবুতে থাকতেন এবং তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী মুসাফিরদেরকে খাদ্য-পানীয় দান করতেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মে মা'বাদ! আপনার কাছে কি খাওয়ার কোন কিছু আছে? তিনি জবাব দেন, আল্লাহর কসম, যদি আমার কাছে কিছু থাকত, অবশ্যই আমি আপনাদেরকে দিতাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁবুর এক পাশে একটি ভেড়া বাঁধা দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এই ভেড়াটির কি দুধ নেই? তিনি বলেন, এটি এত দুর্বল যে, অন্যান্য ভেড়া-বকরীর সাথে সে বের হয়েও যেতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (সা) তা দোহনের অনুমতি চান। উম্মে মাবাদ অনুমতি দেন। তিনি ভেড়ার দুধে বিসমিল্লাহ বলে হাত লাগান ও দোহন করতে থাকেন। তিনি উম্মে মাবাদের একটি পাত্রে দুধ দোহন করে নিজেরা পান করেন এবং তাকেও পান করান। সবাই পেট ভরে দুধ পান করার পর তিনি ২য়বার দুধ দোহন করে পাত্র ভর্তি করে রেখে চলে যান।

তারপর তার স্বামী আবু মাবাদ ঘরে ফিরে এসে দুধ দেখে আশ্চর্য হন এবং বলেন, আল্লাহর কসম! আমাদের এ পথে কোন নেক লোক অতিক্রম করেছে। তারপর তিনি লোকের বর্ণনা জানতে চান। উম্মে মাবাদ বর্ণনা দেন। আর মাবাদ

বলেন আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি হচ্ছেন সেই কুরাইশ ব্যক্তি যার সম্পর্কে বহু কথা শুনা যাচ্ছে এবং তাঁকে কুরাইশরা তালাশ করে বেড়াচ্ছে। আমি যদি সুযোগ পাই, অবশ্যই আমি তাঁর কাছে যাবো।

ইতিমধ্যে মক্কায় একজন অদৃশ্য গায়ক, গানের সুরে উম্মে মাবাদের তাঁবুতে সংঘটিত ঘটনাটি বর্ণনা করতে থাকে। মক্কায় অবস্থানরত আসমা বিনতে আবু বকর বলেন, আমরা জানিনা যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কোথায় গেছেন। কিন্তু মক্কার নিম্নভাগ থেকে আগত একজন অদৃশ্য জিন এসে উক্ত কবিতা পাঠ করায় আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। কবিতায় বলা হয় ঘটনার সত্যতা যাচাইর জন্য উম্মে মাবাদের তাঁবুতে গিয়ে পরীক্ষা করে আস।

নবী (সা) পথে আবু বুরাইদার সাক্ষাত পান। সে ছিল নিজ গোত্রের সরদার। কুরাইশদের ঘোষিত পুরস্কার লাভ করার উদ্দেশ্যে সে একদল সংগী নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) তালাশে বেরিয়েছিল। কিন্তু তাঁর চেহারা মুবারক দেখামাত্র তারা ৭০ জন লোক ইসলাম গ্রহন করেন। বুরাইদা নিজ পাগড়ী খুলে তা তীরের মাথায় বেঁধে পতাকা বানান এবং বলেন, গোটা দুনিয়ায় ন্যায় ও ইনসাফ পরিপূর্ণ করার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বাদশাহ এসেছেন।

পথে রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়া থেকে প্রত্যাগত যুবায়েরের নেতৃত্বাধীন বানিজ্য কাফিলার সাক্ষাত পান। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকর সিদ্দিককে সাদা কাপড় পরিয়ে দেন।

তিনি নবুওয়াতের ১৪ সালের ৮ই রবিউল আউয়াল, সোমবার কুবায় পৌছেন। সেদিনটি ছিল ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর। মুসলমানগণ খবর পেয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। তাই তাঁরা অধীর আগ্রহে প্রত্যেকদিন সকালে হাররায় জমা হতেন এবং দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে ঘরে ফিরে যেতেন। তাঁদের প্রতীক্ষা দীর্ঘতর হতে থাকল। ঘরে ফিরে আসার সময় তাঁরা একজন ইহুদীকে তাদের উঁচু কিল্লা থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) আগমন লক্ষ্য রাখার জন্য নিয়োজিত রাখতেন। যখন একজন ইহুদী তাঁদেরকে দেখলেন এবং চীৎকার করে জানালেন যে, তোমাদের প্রতীক্ষিত রাসূল এসে গেছেন, তখন বনি আমর বিন আওফ গোত্রে তাকবীর ধ্বনি ও আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি হয়। তাঁরা ঘর থেকে বের হন এবং তাঁকে স্বাগত

জানান। রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ করে বসেন এবং আবু বকর (রা) দাঁড়িয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকারীদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেন। যারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে ইতিপূর্বে দেখেননি, তারা আবু বকরকে নবী মনে করে তাঁকেই সাদর সম্ভাষন জানাতে থাকেন। রাসূলুল্লাহর (সা) গায়ে রোদ এসে পড়লে আবু বকর (রা) চাদর দিয়ে ছায়া দেন। তখন লোকেরা সবাই তাঁকে চিনতে পারে।

গোটা মদীনায় তাঁকে স্বাগত জানানোর হিড়িক পড়ে যায়। মদীনায় এত বেশী আনন্দ-উল্লাস ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। তিনি কুবায় বনি আমর বিন আওফ গোত্রের সরদার কুলসুম বিন হাদামের ঘরে উঠেন। হযরত আলী তিনদিন পর্যন্ত মক্কায় থেকে এবং লোকদের আমানত ফেরত দিয়ে কুবায় এসে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন। কয়েকদিন পর উম্মুল মুমেনীন হযরত সাওদা ও তাঁর দুই মেয়ে ফাতিমা এবং উম্মে কুলসুমও তাঁর সাথে এসে মিলিত হন। তাঁদের সাথে আরো আসেন উসামাহ বিন যায়েদ, উম্মে আইমান এবং আবদুল্লাহ বিন আবু বকরের নেতৃত্বে আবু বকর পরিবার ও হযরত আয়েশাহ (রা)। রাসূলুল্লাহর মেয়ে যয়নব মক্কায় তাঁর স্বামী আবুল আসের কাছে থেকে যান এবং বদর যুদ্ধের পূর্বে মদীনায় আসতে সক্ষম হননি।

মদীনা আসার পর হযরত আবু বকর ও বেলালের জ্বর হয়। হযরত আয়েশাহ মক্কা থেকে এসে তাঁদের খোঁজ খবর নেন এবং তাঁদেরকে জ্বরাক্রান্ত দেখে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের জন্য দোয়া করেন। তারপর তাঁরা আরোগ্য লাভ করেন।

তিনি কুবা থাকা অবস্থায় মসজিদে কুবা নির্মাণ করেন।

মূলতঃ হিজরাতের পর এবং কুবাতে পৌছার মধ্য দিয়েই মদীনার সোনালী ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। এর আগের নাম ছিল ইয়াসরাব। কিন্তু তিনি মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর থেকে এর নাম হয় মদীনা।

## মদীনার ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মসজিদে নবওয়ী মুসলমানদের ২য় হারাম শরীফ বা সম্মানিত স্থান। আর মদীনা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরাত ও আশ্রয়ের অতি বরকতপূর্ণ স্থান। মক্কার পরে মদীনা মুসলমানদের ২য় ধর্মীয় রাজধানী হিসেবে বিবেচিত হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পর মদীনা নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। তখন মদীনা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াহ কেন্দ্রে পরিণত হয়। কেননা, মক্কাবাসীরা যে মুহূর্তে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন, ঠিক সে মুহূর্তে মদীনাবাসীরা তাঁকে স্বাগত জানান। তাই মক্কার চাইতেও মদীনা আরো শক্তিশালী ও মজবুত দাওয়াহ কেন্দ্রের রূপ নেয়। শুধু তাই নয়, সাথে সাথে তা ইসলামী রাষ্ট্রেরও রূপ গ্রহণ করে এবং আল্লাহর যমীনে সর্বপ্রথম ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, বাণিজ্য, যুদ্ধ ও সামাজিক আইন–কানুন কায়েম হয়।

মদীনা একাধারে, দাওয়াহ, জিহাদ এবং ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) যে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদীনসহ বিভিন্ন মুসলিম খলীফাদের আমলেও সেখানে জ্ঞান চর্চা অব্যাহত থাকে। সকল যুগেই জ্ঞানী–গুণী ব্যক্তিরা মদীনায় গিয়ে নিজেদের লেখা–পড়ার পূর্ণতা সাধন করেছেন। অতীতের সকল ইমাম, মুহাদ্দিস, ফিকাহবিদ ও উলামায়ে কেরাম প্রায় সবাই মদীনায় গিয়ে নিজেদের জ্ঞান–পিপাসা নিবারণ করেছেন।

মসজিদে নবওয়ী হচ্ছে মদীনার প্রাণ শক্তি। এছাড়া সোনার মদীনায় শায়িত রয়েছে রাসূলুল্লাহর (সা) দেহ মুবারক। মদীনার অন্য আকর্ষণ হচ্ছে, তিন খলীফা রাশেদসহ অগণিত সাহাবায়ে কেরামের কবর।

মদীনা নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠে। মাত্র সিকি শতাব্দীর মধ্যে, তা বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানীতে পরিণত হয়। ঐ রাষ্ট্রটি পূর্বে চীন ও পশ্চিমে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রোমান সম্রাটের রাজধানী বাইজানটিয়াম ব্যতীত, আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা। প্রায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত মদীনা ছিল আন্তর্জাতিক ইসলামী রাজধানী। এরপর খেলাফতে রাশেদার

আমলে মদীনা থেকে ৫ বছরের জন্য পূর্বদিকে কূফায় এবং উমাইয়া শাসনের শুরুতে মদীনা থেকে উত্তর দিকে ১৩০৩ কিলোমিটার দূরে দামেস্কে রাজধানী স্থানান্তরিতহয়।

মদীনা থেকে রাজধানী সরে গেলেও তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয়। পরে দামেস্ক, বাগদাদ ও কায়রো থেকে এখানে আর্থিক সাহায্য পৌঁছতে থাকে।

তেল আবিস্কারের ফলে সৌদী আরবের দুর্বল অর্থনীতি সবল হতে থাকে এবং ব্যবসা-বানিজ্য ও আর্থিক কাজ-কারবার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। মদীনা শহরেও তার ছোঁয়া লাগে। সেখানে আধুনিক বিপনী কেন্দ্র ও সুপার মার্কেট প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় নাগরিকরা ছাড়াও যেয়ারতকারী বিদেশী নাগরিকেরা সেখানে প্রচুর কেনা-কাটা করে। মদীনা শিল্প নগরী না হলেও অন্ততঃ বিরাট বাণিজ্যিক নগরীতে পরিণত হয়। কেননা, আজকাল সেখানে প্রায় ২০ লাখ লোক প্রতি বছর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করে। সেখানে ১ম ও ২য় পর্যায়ের বড় বড় আধুনিক হোটেল নির্মিত হয়েছে এবং ছোট ও ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। মসজিদে নবওয়ীর চারপাশে বাণিজ্যিক এলাকা সৃষ্টি হয়েছে এবং হাজী ও যেয়ারতকারীদের জন্য শহরের সর্বত্র বিশাল আবাসিক এলাকা ও ভবন তৈরী হয়েছে। আধুনিক কালের মদীনা একাধারে ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও আবাসিক শহর হিসেবে গড়ে উঠেছে।

**ভূমিকাঃ** মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে কুবায়, বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, ২ সপ্তাহ অবস্থান করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) এক শুক্রবার উষ্ট্রীর পিঠে আরোহন করে মদীনার অভ্যন্তরে রওনা করেন। মদীনার বনি নাজ্জার গোত্র তাঁর পিতার মামার বংশ। তারা তাঁকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলেন। পক্ষান্তরে ১শ সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট দলও তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁর মেযবান গোত্র বনি আওফ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন ইখতিয়ার নেই। আল্লাহর যেখানে মর্জি সেখানে আমাকে যেতে হবে ও বাস করতে হবে। আমার উষ্ট্রী কোসওয়া আল্লাহর আদেশে যেখানে বসে পড়বে সেটিই আমার বাসস্থান হবে।

পথে জুমআর নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) সমবেত সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে বনি সালেম পল্লীতে প্রথম জুমআর নামায পড়েন। সেই স্থানটিই বর্তমানে মসজিদে জুমআহ্ নামে পরিচিত। নামায শেষে তিনি ও তাঁর কাফিলাহ পুনরায় রওনা দেন। প্রত্যেকেই আগ্রহী ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের গোত্রে বাস করবেন। তাই অধিকাংশ গোত্র তাদের কাছে বাস করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কে অনুরোধ জানান এবং সবাই উষ্ট্রীর দিকে আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য রাখছিলেন। প্রথমে বনি সালেম, পরে বনিবায়াদাহ, বনি সায়েদাহ, বনি হারেস, বনি আদী বিন নাজ্জার ও বনি মালেক বিন নাজ্জারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তিনি মসজিদে নবওয়ীর স্থানে আসেন। তাঁর উষ্ট্রী সেখানে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, هٰذَا الْمَنْزِلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

অর্থঃ "ইনশাল্লাহ, এটাই অবতরণ স্থল।' ইয়াহইয়া তাঁর গ্রন্থে যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ উষ্ট্রী মসজিদের স্থানে গিয়ে বসে পড়ে। স্থানটি ছিল আসআদ বিন যারারাহর অভিভাবকত্বে দুইজন ইয়াতীম শিশুর উট-বকরীর খোঁয়াড়। তাতে কিছু সংখ্যক মুসলমান নামায পড়তেন। উষ্ট্রী বসে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ৪ বার বলেন,

هٰذَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْمَنْزِلُ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْنَا مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۔

অর্থঃ ইনশাআল্লাহ, এটিই হবে অবতরণস্থল। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুবারক স্থানে অবতরণ করাও, কেননা, তুমি উত্তম অবতরণ করানোকারী।

অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, উষ্ট্রী মসজিদের দরজার সামনে স্থানটিতে বসে পড়ে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) অবতরণ করেননি। উষ্ট্রী পুনরায় দ্রুত উঠে পড়ে এবং সামান্য দূরে গিয়ে আবার বসে পড়ে। উষ্ট্রী পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে ও পুনরায় প্রথম অবতরণ স্থলে ফিরে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নামেন এবং জিজ্ঞেস করেন, এখন কোন ঘরটি নিকটবর্তী? আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, আমার এই ঘরটি। আমরা আপনার সওয়ারী এখানেই রেখে দিই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আরোহীও সওয়ারীর সাথেই আছে।[১৭] রাসূলুল্লাহ (সা) আবু আইউব আনসারীর ঘরে উঠেন। তাঁর সাথে যায়েদ বিন হারেসা ছিলেন।

ইমাম বুখারী বারা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি মদীনাবাসীদেরকে কখনও রাসূলুল্লাহর (সা) আগমনের চাইতে অন্য কোন ব্যাপারে এত বেশী খুশী হতে দেখিনি। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। মদীনার কৃষ্ণাঙ্গ লোকেরা রাসূলুল্লাহর (সা) শুভাগমনে নিজেদের লোহা নির্মিত ছোট ধারাল অস্ত্র নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন।

রাযীন উল্লেখ করেছেন, বালিকারা ঘরের ছাদের উপর থেকে নিম্নোক্ত শুভেচ্ছা গান গেয়ে রাসূলুল্লাহ কে (সা) স্বাগত জানান। গানের অর্থ হলঃ

'আমাদের আকাশে সানিয়াতুল অদা' থেকে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পথের আহবানকারী ডাকতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। হে আমাদের মধ্যে প্রেরিত (মহাপুরুষ)। আপনি এমন বিষয় নিয়ে এসেছেন, যার আনুগত্য করা হয়।'

আরবীতে গানটি হচ্ছেঃ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا - مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا - مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا - جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ

ছোট ছোট শিশুরা উল্লাস করে বলে 'রাসূলুল্লাহ (সা) এসেছেন।' শারাফুল মুস্তফা বইতে উল্লেখ আছে। যখন উষ্ট্রী আবু আইউব আনসারীর দরজার সামনে বসে পড়ে তখন বনি নাজ্জার গোত্রের বালিকারা নিম্নোক্ত গান গেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) কে শুভেচ্ছা স্বাগতম জানায়ঃ–

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ

يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مَنْ جَارٍ

অর্থঃ 'আমরা বনি নাজ্জারের বালিকা, কি আনন্দ! মুহাম্মাদ হবেন আমাদের প্রতিবেশী।'

রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন, তোমরা কি আমাকে ভালবাস? তারা জবাব দিল, 'হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' তখন তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, আমিও তোমাদেরকে ভালবাসি।[১৮]

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে। রাবী বলেন যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসেন, তখন কৃষ্ণাঙ্গ লোকেরা নিজেদের ছোট যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলে আনন্দ প্রকাশ করেন। যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় প্রবেশ করেছেন, সেই দিনের চাইতে উজ্জ্বল ও উত্তম দিন আর দেখিনি। তাঁর আগমনে মদীনার সকল কিছু আলোয় আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।

## মসজিদ নির্মাণ

মসজিদে নবওয়ীর স্থান আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত এবং রাসূলুল্লাহর (সা) উষ্ট্রী কর্তৃক চিহ্নিত। মদীনার মূল কেন্দ্র হচ্ছে এই মসজিদ। এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই ইসলামী সভ্যতা–সংস্কৃতি, ইসলামী রাষ্ট্র ও আইন এবং গোটা দুনিয়ায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। আন্তর্জাতিক ইসলামী রাজধানী হিসেবে মসজিদে নবওয়ীর ভূমিকা সবার জানা আছে।

---

১৬· অফা–আল–অফা।। নূরুদ্দিন সামহুদী, ১ম খন্ড।

১৭· অফা–আল–অফা–১ম খন্ড।। নূরুদ্দিন সামহুদী।

১৮· অফা–আল–অফা।। নূরুদ্দীন সামহুদী

রাসূলুল্লাহর (সা) উষ্ট্রী যে স্থানে গিয়ে আল্লাহর ইশারায় বসে পড়েছিল, সে স্থানটি ছিল খেজুর শুকানোর খলা ও উট-বকরীর খোঁয়াড়। একপাশে কিছু সংখ্যক মুসলমান নামাযও পড়তেন। স্থানটির মালিক ছিল ২ জন ইয়াতিম শিশু। ইমাম বুখারীর মতে, তারা আসআদ বিন যারারাহর অভিভাবত্বে লালিত পালিত হচ্ছিল। তাদের নাম হল, সহল ও সোহাইল বিন নাফে' বিন আ'মর বিন সা'লাবাবিনআন-নাজ্জার।

রাসূলুল্লাহ (সা) বনি নাজ্জারের সর্দার-মাতব্বরদেরকে মসজিদের জায়গার ব্যাপারে আলোচনার উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত জায়গা কেনার প্রস্তাব দিয়ে তাদের কাছে দাম নির্ধারণের আহবান জানান। তারা বলেন, আপনি জায়গা নিন ও মসজিদ নির্মাণ করুন। আমরা আপনার থেকে দাম নেবোনা। দাম নেবো আল্লাহর কাছ থেকে। সহল ও সোহাইল একই প্রস্তাব পেশ করে এবং মূল্য গ্রহণ না করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তারা বলে, আমরা যমীন আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে দিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) বিনামূল্যে ইয়াতীমের সম্পত্তি গ্রহন করতে অস্বীকৃতি জানান। তাবকাতে ইবনে সা'দে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) দুই ইয়াতীম শিশু থেকে ১০ দীনারের বিনিময়ে উক্ত সম্পত্তি কিনেন এবং আবু বকর সিদ্দিক (রা)কে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেন। আবু বকর (রা) উক্ত অর্থ পরিশোধ করেন।[১৯]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। মসজিদের যমীনে খেজুরগাছ ও মুশরিকদের কবর ছিল এবং এক অংশ নীচু ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) খেজুর গাছ কেটে ফেলা এবং কবরের হাড় বের করে অন্যত্র পুঁতে রাখার নির্দেশ দেন। সাথে নিম্নাংশ ভরাট করে মসজিদ তৈরির উপযোগী করার হুকুম দেন। নিম্নাংশে উপত্যকার পানি জমা হয়ে থাকত। ভরাট করার পর তা সেরে যায়। মসজিদ তৈরীর আগ পর্যন্ত ১২ দিন তিনি অস্থায়ী ছায়াদার ছাদের নীচে নামায পড়েন।[২০] তারপর মসজিদ নির্মাণের সময় তিনি বলেন, মসজিদের ছাদ হযরত মূসার (আ) ছাদের অনুরূপ ৭ গজ উঁচু করে তৈরি কর। তাতে কাঠ ও ছাদ থাকবে। মূসার (আ) ছাদ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তিনি যখন দাঁড়াতেন তখন তাঁর মাথা ছাদের সাথে লাগত।

---

১৯·অফা-আল-অফা-১ম খন্ড।। নূরুদ্দিন সামহূদী।

২০·অফা-আল-অফা।।নূরুদ্দিন।।সামহূদী

রাসূলুল্লাহর (সা) সময় মসজিদে নবওয়ী দু'বার নির্মাণ করা হয়। ১ম বার হচ্ছে, প্রথম হিজরী সনে, অর্থাৎ ৬২২ খৃষ্টাব্দে। তখন মসজিদের আয়তন ছিল ৭০ x ৬০ গজ। অর্থাৎ ৮৫০'৫ বর্গ মিটার এবং উচ্চতা ছিল ৫ গজ (২'৯ মিটার) । তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য আ'ম্মার বিন ইয়াসারকে নির্দেশ দেন। নিজেও ইট ও পাথর বহন করেন এবং সাথে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও মসজিদ নির্মাণে হযরত আম্মার বিন ইয়াসারকে সহযোগিতা করেন। নিজে ইট-পাথর টানার সময় তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে দুই লাইন কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতা টুকু হচ্ছেঃ হে আমাদের প্রভু! এই ইট-পাথরের বোঝা খাইবারের ইহুদীদের খেজুরের বোঝার চাইতেও উত্তম ও পবিত্র। হে আল্লাহ! পরকালের বিনিময়ই সত্যিকার বিনিময়। তুমি আনসার এবং মুহাজিরদের উপর রহম কর।' তিনি এই কাব্যাংশ উচ্চারণ করতেন, সাথে সাহাবায়ে কেরামও তা গাইতেন। আরো একটি কাব্যাংশও তিনি উচ্চারণ করেন এবং সাহাবায়ে কেরাম সমবেত ভাবে তা গান। সেটি হচ্ছেঃ

'আর আল্লাহ, পরকালের কল্যাণ আসল কল্যাণ।
তুমি আনসার এবং মুহাজিরদেরকে সাহায্য কর।'

কেউ কেউ বলছেন, শেষের কাব্যাংশটুকু হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে একটি পাথর দিয়ে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। মসজিদের ভিত্তি পাথর, দেয়াল ইট, চাল খেজুর পাতা ও এজখের (সুঘ্রানযুক্ত ঘাস) ঘাস এবং খুঁটি খেজুর গাছ দিয়ে নির্মাণ করা হয়। মসজিদের স্থানের খেজুর গাছগুলো কেটে কিবলার দিকের খুঁটি দেয়া হয়। চালের উপর কাদা মাটির প্রলেপ দেয়া হয় যেন ঠান্ডা লাগে। বৃষ্টির পানি সরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে চাল একদিকে ঢালু করে দেয়া হয়। এটি মূলতঃ একটি ছাপরা ঘরের মত ছিল।

যাক, সকল সাহাবায়ে কেরাম একটা করে ইট-পাথর টানতেন। আর প্রধান রাজমিস্ত্রী আম্মার বিন ইয়াসার ২/৩টা করে টানতেন। এক পর্যায়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলেন, আপনার সাহাবায়ে কেরাম নিজেরা একটা একটা করে টানে আর আমার উপর ২/৩টা করে ইট তুলে দেয়। তারা আমাকে মেরে ফেলতে চায়। তখন তিনি আম্মারের হাত ধরে মসজিদে চক্কর লাগান এবং তার মাথার বালু পরিষ্কার করে দিয়ে বলেন, হে ইবনে সুমাইয়া, আমার সাহাবায়ে

কেরাম নয়, বরং তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। হে ইবনে সুমাইয়া, তোমার দু'টো বিনিময় এবং অন্যদের রয়েছে ১টা বিনিময়। তোমাকে বিদ্রোহীরা হত্যা করার আগে তোমার সর্বশেষ পানীয় হবে দুধ।

সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) বাহিনীতে অংশ গ্রহণকারী আম্মার বিন ইয়াসির শহীদ হলে মুআওইয়াহর (রা) পক্ষ অবলম্বনকারী আ'মর বিন আ'স (রা) মুআওইয়ার কাছে গিয়ে বলেনঃ আমি আম্মার বিন ইয়াসারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তোমাকে বিদ্রোহী একটি দল হত্যা করবে। মুআওইয়াহ বলেন, হে আ'মর! তুমি নিজের পেশাবে আছাড় খাচ্ছ। আমরা কি তাকে হত্যা করেছি? যারা তাকে যুদ্ধে বের করিয়েছে, তারাই তার হত্যাকারী।

আবু ইয়ালা সহীহ সনদসূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, তখন আবুবকর আসেন ও একটি পাথর বসান। তারপর উমার (রা) আসনে ও একটি পাথর বসান। এরপর উসমান আসেন ও একটি পাথর বসান। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার পরে এইভাবে খেলাফত চলবে। মসজিদে কুবার পর মসজিদে নবওয়ী হচ্ছে মদীনার ২য় মসজিদ। একবার বৃষ্টিতে মসজিদের মেঝে কর্দমাক্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায় নামায পড়ায় সবার শরীরে কাদা লেগে যায়। রাসূলুল্লাহর (সা) কপাল ও দাঁড়ি মুবারকেও কাদা লাগে। সাহাবায়ে কেরাম পাথরের নুড়ি মেঝেতে ঢেলে দেন এবং তাতে রাসূলুল্লাহ (সা) রাজী হন। কিন্তু তখন মসজিদের ছাদ পাকা করার প্রস্তাবে রাসূলুল্লাহ (সা) সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও তাতে রাজী হননি। ৭ম হিজরী সনে খাইবার বিজয়ের পর ক্রমবর্ধমান মুসল্লীর সংকুলানের জন্য মসজিদ আরো সম্প্রসারণ করা হয়। তখন এর আয়তন দাঁড়ায় ১০০ X ১০০ গজ অর্থাৎ ২০২৫ বর্গমিটার এবং ছাদ ৭ গজ উঁচু করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, জিবরীলের পরামর্শক্রমে এভাবে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে।

ইবনুন্নাজ্জার বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ ১৭ মাস বাইতুল মাকদেসের দিকে ফিরে নামায পড়ার পর জিবরীল এসে কা'বা ও তাঁর মাঝে সকল বাধা অপসারণ করেন। তিনি কিবলামুখী করে ঠিকমত মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি কাবার মীযাব সোজা মসজিদের কিবলাহ নির্ধারণ করেন।[২১] কা'বা শরীফের

---

২১· অফা-আল-অফা-১ম খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহূদী,

দিকে মুখ করে নামায পড়ার আদেশের পর তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মসজিদে নবওয়ীতে প্রথম আসরের নামায কা'বার দিকে ফিরে পড়েন। মসজিদটি ছিল চতুর্ভুজ এবং তাতে কোন নকশা ছিলনা।

## রাসূলুল্লাহর (সা) তৈরী মসজিদের সীমানা

বিভিন্ন সময় মসজিদে নবওয়ীর সম্প্রসারণ ও সংস্কারের কারণে বর্তমানে কোন যেয়ারতকারীর পক্ষে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে নির্মিত মসজিদে নবওয়ীর হুবহু সীমানা চিহ্নিত করা অসম্ভব। এখন আমরা উক্ত সীমানা সম্পর্কে আলোচনাকরব।

**দক্ষিণ দেয়ালঃ** এই দেয়ালটি পূর্ব–পশ্চিমে লম্বা। রাসূলুল্লাহ (সা) ইমাম হিসেবে যে মেহরাবে নামায পড়েছেন, সেখান থেকে তা আধামিটার দক্ষিনে। বর্তমানে রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বারের আধামিটার দক্ষিনে মওজুদ পূর্ব থেকে পশ্চিমে লম্বা হলুদ রং এর যে রেলিং রয়েছে সেটাই সাবেক মূল দেয়ালের সীমানায় অবস্থিত এবং এই দিকটি বর্তমানে কিবলার দিক।

**উত্তর দেয়ালঃ** রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নির্মিত উত্তর পাশের দেয়াল বাবুন্নিসা বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে লম্বা। তুর্কী সুলতান আবদুল মজিদ মসজিদ সম্প্রসারণের সময় ঐ স্থানেই স্তম্ভ নির্মাণ করে এর উপর ছাদ তৈরী করেন। ঐ স্তম্ভের পর থেকেই মসজিদের খোলা আঙ্গিনা শুরু হয়েছে।

**পূর্ব দেয়ালঃ** এই দেয়ালটি রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বারের ডানে পূর্বদিকের ৫ম স্তম্ভ থেকে ১·৮ মিটার দূরে অবস্থিত এবং হুজরায়ে নবওয়ীর সাথে সংশ্লিষ্ট। হযরত আয়েশাহ বলেন, আমার হায়েজ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদ থেকে মাথা দিলে আমি হুজুরাহ থেকে সিঁথি করে দিতাম।

**পশ্চিম দেয়ালঃ** এটি উত্তর থেকে দক্ষিনে লম্বা। বর্তমানে এক সারি স্তম্ভের উপরে আরবীতে সোনালী অক্ষরে লেখা আছে, "হাদ্দু মাসজিদিন নাবী' অর্থঃ 'মসজিদে নবওয়ীর শেষ সীমানা।' এটি রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বার থেকে পশ্চিমে ৫ম খুঁটি পর্যন্ত বিস্তৃত।

## সম্প্রসারিত অংশ কি মসজিদ?

মসজিদে নবওয়ীর সম্প্রসারিত অংশও মসজিদের অন্তর্ভূক্ত। এ মর্মে ইবনে শিবাহ ও ইয়াহইয়া আদ্‌দিলমী আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ (ইয়েমেনের) 'সানা পর্যন্ত যদি এই মসজিদের সম্প্রসারণ হয়, তথাপিও তা আমার মসজিদ।' ইবনে শিবাহ ও ইয়াহইয়া, ইবনে আবি উমরাহ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ 'আমরা যদি এই মসজিদকে বাকী গোরস্থান পর্যন্ত সম্প্রসারণ করি তবুও তা রাসূলুল্লাহর (সা) মসজিদই থাকবে।'

## রাসূলুল্লাহ (সা) সময়ে মসজিদের দরজা

বাইতুল মাকদেসের দিকে ১৭ মাস ব্যাপী নামায পড়ার সময় মসজিদের পূর্বদিক, পশ্চিম দিক ও দক্ষিন দিকে ১টি করে মোট ৩টি দরজা ছিল। মেহরাব এবং মিম্বার ছিল উত্তর দিকে এবং সে দিকে কোন দরজা ছিলনা। কিন্তু ১৭ মাস পর এবং বদর যুদ্ধের ২ মাস পূর্বে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন হওয়ায়, দক্ষিণ দিকের দরজা বন্ধ করে বরাবর উত্তরদিকে অনুরূপ আরেকটি দরজা নির্মাণ করা হয়।

**পূর্ব দরজাঃ** রাসূলুল্লাহ (সা) এই দরজা দিয়ে নিজ হুজরাহ থেকে মসজিদে প্রবেশ করতেন। তাই একে বাবুন্নবী (নবীর দরজা) বলা হয়। এর আরেক নাম হচ্ছে বাবে উসমান। কেননা, দরজা থেকে কিছু সামনেই ছিল উসমানের (রা) ঘর। এর অপর নাম হচ্ছে বাবে জিবরীল। বর্তমান সম্প্রসারিত মসজিদের সেই বরাবর দরজার নামও একই। তাই এই দরজা দিয়ে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে এগিয়ে গেলে মসজিদের সাবেক পূর্ব দেয়ালের শেষ সীমানার উপর ঝাড়বাতি বরাবর রাসূলুল্লাহর (সা) আমলে তৈরী পূর্ব দরজার সঠিক অবস্থান। এটি সুফফার সাথে দক্ষিণ পাশে লাগা। একদিন ঐ দরজার বাইরে রাসূলুল্লাহ (সা) একজন উষ্ট্রারোহীর সাথে কথা বলেন। উম্মুল মুমেনীর উম্মে সালামার প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সেই উষ্ট্রারোহী ব্যক্তি হচ্ছে জিবরীল। সেই দিন থেকে ঐ দরজার বাবে জিবরীল নামকরণ করা হয়।

**পশ্চিম দরজাঃ** পূর্বে এই দরজার নাম ছিল বাবে আতেকাহ্ এবং বর্তমানে এর নাম হচ্ছে বাবুর রাহ্‌মাহ বা রহমতের দরজা। বর্তমান সম্প্রসারিত

মসজিদে ঐ দরজার অবস্থান আরো ভেতরে। বর্তমান দরজা দিয়ে ভেতরে পূর্বদিকে অগ্রসর হলে সামনে যে স্তম্ভের উপর 'হাদ্দু মাসজিদুন্নবী' লেখা আছে সেই বরাবর স্থানেই রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ দরজা তৈরি করেন। বর্তমান দরজা হুবহু আগের দরজা বরাবর আরো পশ্চিমে নির্মাণ করা হয়েছে। কথিত আছে, একদিন জুমআর নামাযে খুতবা দেয়ার সময় ঐ দরজা দিয়ে একজন গ্রামীন মুসলিম প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বৃষ্টির দোয়া প্রার্থনা করে বলেন, অনাবৃষ্টি ও গরমে ফসল ও পশু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) সাথে সাথে দোয়া করায় পরিষ্কার আকাশে মেঘের সাজ ও বৃষ্টি বর্ষন শুরু হয়। সেইজন্য ঐ দরজাকে রহমতের দরজা বলা হয়।

**দক্ষিণ দরজাঃ** এটিকে 'বাবে আলে উমার' বলা হয়। এটি দক্ষিণ দেয়ালের পূর্বাংশে অবস্থিত যা রাসূলুল্লাহর (সা) মেহরাব ও হুজরার মাঝে বিদ্যমান ছিল। বর্তমান পবিত্র হুজরাহর জানালার দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল এর সঠিক অবস্থান। কা'বার দিকে কিবলাহ পরিবর্তন হওয়ায় এই দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

**উত্তর দরজাঃ** কা'বার দিকে কিবলাহ পরিবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (সা) দক্ষিণ দিকের দরজা বরাবর উত্তর দিকে এই দরজাটি তৈরী করেন।

## কিবলা পরিবর্তন

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করার কত দিন পর বাইতুল মাকদেস থেকে কাবার দিকে কিবলাহ পরিবর্তন করেছেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন ১৬ মাস এবং কেউ বলেছেন ১৭ মাস পর্যন্ত বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার পর তিনি কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তন করেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ১৩ মাস ও ১৯ মাস সম্পর্কিত বর্ণনা গুলো দুর্বল এবং ১৬ কিংবা ১৭ মাস সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো সহীহ। যারা ১৬ মাস বলেছেন, তাঁরা হিজরাতের ১ম মাস ও কিবলাহ পরিবর্তনের মাসের ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে বলেছেন ১৬ মাস। আর যারা ১৭ মাস বলেছেন, তাঁরা ভগ্নাংশকে হিসেব করে বলেছেন ১৭ মাস। ২য় হিজরীর রজব মাসের মাঝামাঝি কিবলা পরিবর্তনের আদেশ নাযিল হয়। কোন নামাযে কিবলাহ পরিবর্তনের নির্দেশ আসে, তা নিয়েও বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। এ ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার

বলেছেন, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) বনি সালামাহ গোত্রের মসজিদে কিবলাতাইনে জোহরের নামায কাবার দিকে মুখ করে পড়ার জন্য আদিষ্ট হন। তখন সবাই বাইতুল মাকদেসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কাবার দিকে ঘুরে দাঁড়ায় এবং পুরুষেরা মহিলাদের স্থানে এবং মহিলারা পুরুষের সারিতে দাঁড়ান। অর্থাৎ যাঁরা আগে ছিলেন তাঁরা পেছনে এবং যাঁরা পেছনে ছিলেন তাঁরা আগে দাঁড়ান। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) আসরের নামায মসজিদে নবওয়ীতে কা'বার দিকে মুখ করে পড়েন। মসজিদে কুবায় পরের দিন সকালে কিবলাহ পরিবর্তনের খবর পৌছায় সেখানে সর্বপ্রথম ফজরের নামায কাবার দিকে মুখ করে পড়া হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘদিন যাবত ইবরাহীম (আ) এর নির্মিত কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কিবলাহ পরিবর্তনের খবর পেয়ে ইহুদীরা বলাবলি করতে থাকে, মুসলমানদের কি হল যে, তারা মূসা, ইয়াকুবসহ অন্যান্য নবীদের কিবলাহ বাদ দিয়ে কাবার দিকে কিবলাহ পরিবর্তন করে দিয়েছে? আল্লাহ এই প্রশ্নের জবাবে বলেন, বোকা লোকেরা আপনাকে কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, পূর্ব-পশ্চিম সহ সকল দিক আল্লাহর। যে দিকেই মুখ ফিরাবে, সেদিকেই আল্লাহকে পাবে। তাই কিবলা পরিবর্তনে কোন সমস্যা নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) কোন দিকে ফিরে নামায পড়েছেন? কাবার দিকে না বাইতুল মাকদেসের দিকে? কারুর মতে কাবার দিতে আবার কারুর মতে বাইতুল মাকদেসের দিকে। ইবনে আবদুল বার বলেন, তিনি কা'বা ও বাইতুল মাকদেস উভয় দিকে ফিরেই নামায পড়েছেন। তিনি দুই রোকনে ইয়ামানীর মাঝে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর মাঝে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। তাতে করে কাবা ও বাইতুল মাকদেস ২টাই সামনেথাকত।[২২]

---

২২· ওমদাতুল আখবার ফি মদীনাতুল মোখতার।। শেখ আহমদ বিন আবদুল হামীদ আব্বাসী।

## রাসূলুল্লাহর (সা) মেহরাব

মসজিদে নবওয়ীতে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান পৃথক থাকা সত্ত্বেও মেহরাব বলতে কিছু ছিল না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) এবং খুলাফায়ে রাশেদার আমলেও মেহরাব ছিলনা। মক্কায় মসজিদে হারামে এখন পর্যন্ত কোন মেহরাব নেই। এই মেহরাব পরবর্তী লোকদের সৃষ্টি।[২৩] জালালুদ্দিন সুয়ুতী তাঁর 'আওয়ায়েল' গ্রন্থে লিখেছেন, ৮৮–৯১ হিজরীতে খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের শাসনামলে, মদীনার গভর্ণর উমার বিন আবদুল আযীয মসজিদে নবওয়ীতে উক্ত মেহরাব তৈরী করেন। বর্তমানে যে মেহরাব রয়েছে তা মিসরের শাসক আশরাফ কায়েতবায়ের শাসনামলে তৈরি। বর্তমান মেহরাব রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের স্থান নয়। বর্তমান ইমাম তাতে দাঁড়িয়েই নামায পড়েন।

বর্তমান মেহরাব থেকে কিছুটা পশ্চিম–উত্তরে পেছনের দিকে হচ্ছে রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের স্থান। তাঁর নামাযের স্থান আরবীতে লেখা আছে ( هٰذَا مُصَلَّى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) অর্থঃ 'এটা নবী (সা) এর নামাযের স্থান।' এই স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। এই জায়গায় নামায পড়া কতইনা উত্তম!

আজকাল মসজিদে নবওয়ীতে রাসূলুল্লাহর (সা) বাইতুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার স্থানের কোন চিহ্ন নেই। তবে তা বের করার সহজ পদ্ধতি হল, আয়েশাহ স্তম্ভকে পেছনে রেখে সোজা উত্তর দিকে এগুলে বাবে জিবরীল বরাবর স্থানে ডান কাঁধে ঐ স্থানটি পড়বে। ঐতিহাসিকদের মতে, এটাই রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের স্থান। কিবলাহ পরিবর্তনের পর মেহরাবের কাছে তাঁর বর্ণিত নামাযের স্থানে নামায শুরুর আগে তিনি কয়েকদিন আয়েশাহ স্তম্ভের কাছে নামায পড়েন।

## আহলে সুফফাহ

সুফ্ফাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে ছায়াদার স্থান। এটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা) নির্মিত মসজিদের শেষাংশে, তাঁর দরিদ্র ও ছিন্নমূল সাহাবীদের আশ্রয় স্থান। সেখানে বসবাসকারী ব্যক্তিরাই ছিলেন আহলে সুফ্ফাহ। উত্তর দিক থেকে দক্ষিনে

---

২৩·অফা–আল–অফা–১ম খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহূদী।

কিবলাহ পরিবর্তিত হওয়ায় সুফফাহ ছিল মসজিদের শেষ ও পেছনের দেয়াল সংলগ্ন। আবু নাঈম তাঁর আল-হেলইয়া গ্রন্থে লিখেছেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল ১ শতেরও বেশী। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, তাদের সংখ্যা কম ও বেশী হত। বিয়ে, সফর ও মৃত্যুর কারণে এই সংখ্যা উঠা-নামা করত। ইবনে জুবায়ের তাঁর ঐতিহাসিক ভ্রমন কাহিনীতে উল্লেখ করছেন, হযরত আম্মার ও সালমান সহ আরো অনেকেই এখানে বাস করতেন। হযরত আবু হুরাইরাহও সুফফার বাসিন্দা ছিলেন।*

আহলে সুফফাহ এখানেই পানাহার করতেন ও ঘুমাতেন। বায়হাকী বলেছেন, মদীনায় উদ্বাস্তু মুহাজিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে মসজিদে থাকার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাদের সাথে বসতেন ও আলোচনা করতেন। তাঁরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস ও কোরআন শিখতেন। তাদের কোন সহায় সম্পদ ছিলনা।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ৭০জন সুফ্ফা-বাসিন্দাকে দেখেছি, তাদের কারুর চাদর ছিলনা। একটামাত্র ইজার (লুঙ্গী) কিংবা একখন্ড কাপড় ছিল যা হাঁটুর অর্ধেক বা পা পর্যন্ত পৌছত। সতর প্রকাশ পাওয়ার আশংকায় তারা হাত দিয়ে তা ধরে রাখতেন।*

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিলাম। তাই আমি সবার বের হওয়ার পথে বসে পড়লাম। আবু বকর (রা) প্রথম বের হলেন। আমি তাঁকে কোরআনের একটি আয়াত জিজ্ঞেস করেছিলাম এই আশা নিয়ে যে, তিনি আমার খোঁজ-খবর নেবেন। কিন্তু তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেননা। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বের হলেন। তিনি আমাকে দেখে মুচকী হাসেন এবং আমার পুরো অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, আস। তিনি ঘরে গিয়ে এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেয়ে জানতে চান এই দুধ কিভাবে কোথা থেকে এসেছে। জওয়াব এল যে, আপনার জন্য উপহার হিসেবে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) আবু হুরাইরাকে বলেন, আহলে সুফফাকে ডাক। কোন যাকাতের মাল আসলে তিনি তাদের মধ্যে বন্টন করতেন আর কোন উপহার এলে তিনি

---

* অফা আল অফা, ২য় খন্ড ।। নূরুদ্দীন সামহূদী

* অফা আল অফা, ২য় খন্ড ।। নূরুদ্দীন সামহূদী

তাদেরকে দিয়ে তাতে নিজেও অংশগ্রহন করতেন। আবু হুরাইরা বলেন, স্বল্প দুধের কারণে অন্যান্যদেরকেও ডাকায় আমি বিরক্ত বোধ করলাম। এই দুধটুকু আমি একা পান করতে পারলে শরীরে একটু শক্তি পেতাম। এই সামান্য দুধ এতলোক কি করে পান করবে? রাসূলুল্লাহ (সা) আবু হুরাইরাকে সবার মধ্যে উক্ত দুধ বন্টনের নির্দেশ দেয়ায় তিনি বন্টন করতে থাকলেন। সবাই তৃপ্তি সহকারে পান করার পর রাসূলুল্লাহ বলেন, এখন আমি আর তুমি বাকী। এবার বললেন, তুমি পান কর। আমি পান করলাম। তিনি বারবার বলতে থাকলেন, তুমি পান কর। আমি জবাব দিলাম। আমি পুরো তৃপ্ত, আর পান করা সম্ভব নয়। তিনি হাসলেন এবং পেয়ালার অবশিষ্ট দুধ নিজে পান করলেন। এই হচ্ছে নবীর মোজেযা।*

আবু হুরাইরা (রা) থেকে আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, তিনদিন পর্যন্ত উপোস থাকার পর আমি প্রায় বেঁহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার অবস্থা। রাসূলুল্লাহ (সা) এক পেয়ালা সারীদ নিয়ে আসেন এবং আহলে সুফফাকে খাওয়াতে থাকেন। আমি পার্শ্বে ঘুরতে থাকি যেন আমাকেও ডাকা হয়। খাওয়া শেষে সবাই উঠে গেল। পেয়ালার এক পাশে সামান্য একটু সারীদ লেগে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তা জমা করে দেখেন এক লোকমা হয়েছে। তিনি তা নিজ আঙ্গুলের উপর রেখে বলেন, বিসমিল্লাহ বলে খাও। আল্লাহর শপথ, আমি ক্ষুধা মিটার আগ পর্যন্ত শুধু খেতেই থাকলাম এবং তৃপ্ত হলাম।

## হযরত বিলালের আযানের স্থান

হযরত বিলাল (রা) মসজিদে নবওয়ীর পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত হযরত হাফসার ঘরের সাথে সামান্য একটু জায়গায় দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। সেই স্থানটুকুর চিহ্ন এখন আর নেই। কেননা, তা সম্প্রসারিত মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহর (সা) নিয়োগকৃত মুআযৃযিন হযরত বিলাল (রা) ৫ ওয়াক্ত নামাযের আযান ও একামাহ দিতেন। বর্তমানে মোসাল্লা রাসূলের (সা) পেছনে দোতলার মত কিছুটা উঁচু অথচ খোলা জায়গায় মুআযৃযিন আযান ও একামাহ দেন। এর নীচে দাঁড়িয়েও লোকেরা নামায পড়ে।

---

* অফা আল অফা, ২য় খন্ড ।। নূরুদ্দীন সামহুদী

## মিনারা

রাসূলুল্লাহর (সা) আমলে এবং খুলাফায়ে রাশেদার যুগে, মসজিদে নবওয়ীতে কোন মিনারা ছিলনা। মসজিদে নবওয়ীতে সর্বপ্রথম উমাইয়া খলীফাহ ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের গভর্ণর উমার বিন আবদুল আযীয ৮৮–৯১ হিজরীতে মিনারা নির্মাণ করেন। তিনি মসজিদের ৪ কোনে ৪ টা মিনারা তৈরী করেন। তখন থেকেই মসজিদগুলোতে মিনারা প্রথা চালু হয়।

তুর্কী সুলতান আবদুল মজীদ উসমানী মসজিদে নবওয়ীর সম্প্রসারণ ও নির্মাণের সময় ৫টি মিনারা তৈরী করেন। তিনি ১· মসজিদের উত্তর–পশ্চিম কোণে, ২· উত্তর–পূর্ব কোণে, ৩· পূর্ব–দক্ষিণ কোণে, ৪· পশ্চিম–দক্ষিণ কোণে এবং ৫· পশ্চিমে বাবুর রাহমাহ নামক মিনারা নির্মাণ করেন।

সৌদী সম্প্রসারণের সময় উত্তর–পশ্চিম কোন ও উত্তর পূর্ব কোণের মিনারা ২টি ভেঙ্গে সেখানে আরো উন্নত মানের মিনারা তৈরী করা হয়। এই দুটো মিনারার ভিত্তি ১৭ মিটার গভীর এবং উচ্চতা হচ্ছে ৭০ মিটার। মিনারাগুলোতে বিদ্যুতের আলোর ঝলক বহুদূর থেকে দেখা যায় এবং তা যিয়ারতকারীর মনে খুশী ও আবেগের ঢেউ সৃষ্টি করে। জিদ্দা থেকে আগত যেয়ারতকারীরা মদীনার ১৮ কিলোমিটার দূর থেকে মিনারাগুলো পরিস্কার দেখতে পায়। মিনারাগুলো খুবই সুন্দর এবং সেগুলোতে উন্নতমানের আকর্ষনীয় ডিজাইন রয়েছে। তাছাড়া সেগুলোর উপর নূতন চাঁদ খচিত থাকায় বিদ্যুতের আলোকে চাঁদের আলোর মতো মনে হয়।

পূর্ব–দক্ষিণ কোণের মিনারাটি সবুজ গম্বুজের সাথে অবস্থিত। ছবিতে সবুজ গম্বুজ ও মিনারাটি একই সাথে দেখা যায়। একসাথে এই দু'টোর ছবি আজ মদীনার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং মদীনা সংক্রান্ত যে কোন বই পুস্তকে এর ব্যবহার হয়।

## মসজিদে নবওয়ীর নামাযের বর্ণনা

মসজিদে নবওয়ীতে এক রাকাত নামাযে ১ হাজার রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়। তাই দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই অতিরিক্ত নেক লাভের আশায় ছুটে আসেন আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ। বর্তমানে মসজিদে ৬ জন ইমাম

আছেন। বাদশাহ আবদুল আযীযের আমল থেকে মদীনার ইসলামী আদালতের প্রধান বিচারপতি মসজিদের প্রধান ইমাম নিযুক্ত হয়ে আসছেন।

বর্তমানে নামাযের সময়সূচী হচ্ছে নিম্নরূপঃ

ফজরের নামাযের আযানের ১ ঘন্টা আগে তাহাজ্জুদের আযান হয়।

ফজরের আযানের ২০ মিনিট পর একামাহ দেয়া হয়।

মাগরিবের আযানের ৫ মিনিট পর একামাহ দেয়া হয়।

অন্যান্য নামাযের আযানের ১৫ মিনিট পর একামাহ দেয়া হয়।

জুমআর নামাযে ২ বার আযান দেয়া হয়। খুতবাহ শুরুর ১ ঘন্টা আগে ১ম আযান এবং খুতবার আগে ২য় আযান হয়।

তারাবীর নামায ২০ রাকাত পড়া হয়। কিন্তু শহরের অন্যান্য মসজিদে ৮ রাকাত তারাবীহ হয়। বিতরের নামায ২ সালামে তিন রাকাত পড়া হয়। শেষ রাকাতে দোয়া কুনুতের সাথে দীর্ঘ দোয়া করা হয়। রমযানের তারাবীহতে কোরআন খতম করা হয়।

জানাযার নামাযের সময় লাশ পুরুষ হলে ঘোষণা দেয়া হয়

اَلصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ

আর মহিলা হলে ঘোষণা দেয়া হয়

اَلصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْاَةِ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ

মসজিদে নবওয়ীতে মহিলাদের নামাযের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তারা বাবুন্নিসা থেকে উত্তর দিকে পৃথক জায়গায় নামায আদায় করে। মহিলাদেরকে পবিত্র রাওদাহ মুবারকে ফজরের নামাযের ১/২ ঘন্টা পর ইবাদাত করার সুযোগ দেয়া হয় এবং সকাল ১১টা পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকে। প্রতি ওয়াক্ত নামায শেষে মুসল্লীরা নবীর (সা) কবর যেয়ারত করেন। মহিলাদের কবরের সামনে যাওয়া নিষিদ্ধ। প্রতি আযান ও একামাতে যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলা হয়, তখন নবীর কবরের সামনে সমবেত মুসল্লীদের মনে যে অনুভূতি ও আবেগ জাগে তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

## মসজিদে নববওয়ীর ঐতিহাসিক ৮টি স্তম্ভ

রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে নববওয়ীতে খেজুর গাছের কান্ড দিয়ে যে সকল খুঁটি লাগিয়েছিলেন, সে সকল স্থানে উসমানী সুলতান আবদুল মজিদ পাকা স্তম্ভঃনির্মাণ করেন। স্তম্ভগুলোর মধ্যে ৮টা হচ্ছে ঐতিহাসিক। এখন আমরা সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছি।

### ১. সুবাস স্তম্ভ ঃ

এটি রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের স্থানে অবস্থিত। এই স্তম্ভটিকে ( الأسطوانة المخلقة ) (সুবাস স্তম্ভ) বলা হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী মুসাল্লামাহ বিন আকওয়া এখানে নামায পড়তেন। তাঁকে এখানে নামায পড়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে এখানে নামায পড়তে দেখেছি। ইমাম মালেক বলেছেন, আমি এই স্তম্ভের কাছে নফল নামায এবং প্রথম কাতারে ফরজ নামায পড়া উত্তম মনে করি। এই স্তম্ভটি রাসূলুল্লাহর (সা) মোসাল্লায় (মেহরাব) কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালে হাতের ডান পাশে থাকে। বর্তমানে মোসাল্লা শরীফের এক অংশ মেহরাবের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। এটি মোসাল্লার সবচাইতে নিকটবর্তী স্তম্ভ। এতে নিয়মিত সুগন্ধ মাখানো হয় বলে একে সুবাস স্তম্ভ বলা হয়। এই স্তম্ভের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) মোসাল্লায় নামায পড়া কতইনা বরকতময়। এটি বর্তমানে স্তম্ভের আকারে নেই। সেখানে মেহরাবের দেয়াল নির্মিত হয়েছে।

এর অপর নাম হচ্ছে 'ওসতোয়ানাহ হান্নানাহ' বা ক্রন্দনকারী স্তম্ভ। এই নামের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মোজেযাহ জড়িত আছে। প্রথমদিকে, রাসূলুল্লাহ মিম্বার ছাড়াই খেজুর গাছের একটি কান্ডে হেলান দিয়ে খুতবাহ দিতেন এবং নামাযের সময় এর উপর হাত রেখে বলতেন, কাতার সোজা করুন। তারপর পায়ের অসুখ দেখা দেয়ায় তাঁর পক্ষে জুমআর খুতবায় দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তখন তামীম দারী (রা) প্রস্তাব করেন আমি সিরিয়ায় মিম্বার তৈরি করতে দেখেছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি সেরকম একটা মিম্বার তৈরী করে নিয়ে আসতে পারি যাতে আপনি আরাম করতে পারবেন ও খুতবার সময় কষ্ট লাঘব হতে পারে। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। তখন আব্বাস বিন আবদুল

মুত্তালিব বলেন, আমার গোলাম কেলাব একজন ভাল রাজমিস্ত্রী; সে একটি ভাল মিম্বার তৈরি করতে পারবে। আব্বাস (রা) তাঁর গোলামকে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে মিম্বার তৈরির আদেশ দেন। গোলাম তাতে দুইটি সিঁড়ি ও একটি বসার আসন তৈরি করে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নূতন মিম্বার থেকে জুমআর ১ম খুতবা দেয়ার জন্য যখন ঐ স্তম্ভটি ছেড়ে আসেন তখন খেজুর কান্ডের তৈরি খুঁটিটি বেদনাদায়ক কান্না শুরু করে। মসজিদের সমবেত সকল মুসল্লী ঐ আর্তনাদ শুনেন এবং অনেকে ভয়ে দাঁড়িয়ে যান। জাবের বিন আবদুল্লাহ বলেন, খুঁটিটি ১০ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীর মত কান্না শুরু করে। আবদুল্লাহ বিন উমার বলেন, খুঁটিটি একটা ছোট শিশুর মত করুন কান্না শুরু করে। নাসাঈ শরীফে জাবের থেকে বর্ণিত আছে, খুঁটিটি বাচ্চা ছিনিয়ে নেয়ার সময় ব্যথাতুর উষ্ট্রীর মত কান্না শুরু করে। দারেমীতে বর্ণিত আছে, খুঁটিটি গো-বাছুরের মত চীৎকার শুরু করে। ইবনু মাজাতে বর্ণিত, কান্নার আওয়াজে খুঁটিটি ফেটে যায়।[২৪]

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বার থেকে নেমে আসেন, খুঁটিটির গায়ে হাত বুলান এবং তাকে জড়িয়ে ধরেন। এতে তার কান্না বন্ধ হয়। তিনি খুঁটিটিকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আগের মত ফলদানকারী গাছে পরিণত হতে চাও, না বেহেশতে যেতে চাও, যেখানে নেককার লোকেরা তোমার ফল খাবে? খুঁটিটি বেহেশত পছন্দ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানেই একটি গর্ত খুঁড়ে তাকে দাফন করার নির্দেশ দেন। ইবনে যাবালাহ বলেছেন, এটি মিম্বারের নীচে পোঁতা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তা মিম্বারের পূর্ব পার্শ্বে পোঁতা হয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তা যেখানে ছিল, সেখানেই পোঁতা হয়।

কাদী আয়াদ বলেন, একাধিক বর্ণনার ফলে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। হাদীসের নির্ভরযোগ্য ৬টি গ্রন্থের ৫টিতে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন, উবাই বিন কা'ব, জাবের বিন আবদুল্লাহ, আনাস বিন মালেক, আবদুল্লাহ বিন উমার বিন খুদরী, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, সহল বিন সা'দ, আবু সাইদ খুদরী, বুরাইদাহ বিন খাতীব, উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামাহ এবং মুত্তালিব বিন আবু রাওয়াহ (রা)।

---

২৪·অফা-আল-অফা-২য় খন্ড।। নুরুদ্দীন সামহূদী।

## ২. আয়েশা স্তম্ভ ঃ

এর অপর নাম হচ্ছে, ওসতোয়ানাহ কোরআহ্ (ভাগ্য পরীক্ষা) এবং ওসতোয়ানা–আল–মুহাজেরীন। এটি মসজিদের মধ্য স্থানে অবস্থিত। এটি রাসূলুল্লাহর কবর থেকে ৩য় কিবলাহর দিক থেকে ৩য় এবং উত্তর দিকের সাবেক উন্মুক্ত আঙ্গিনার দিক থেকে ৩য় স্তম্ভ। কিবলাহ পরিবর্তনের পর রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের স্থান (মেহরাব) নির্ধারণের আগ পর্যন্ত কিছুদিন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে নামাযের ইমামতি করেন। এটিকে ভাগ্য পরীক্ষা স্তম্ভ বলার পেছনে একটি কারণ আছে। আর তা হচ্ছে, তাবরানী তার আওসাত গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার মসজিদে এমন একটি স্থান আছে, লোকেরা এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য জানলে সেখানে নামায পড়ার জন্য লটারীর ব্যবস্থা করবে। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে উক্ত স্থানটি জানানোর জন্য অনুরোধ করায় তিনি তাতে রাজী হননি। পরে তিনি নিজ ভাগিনা আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরকে ঐ জায়গাটি জানিয়ে দেন বলে তাঁরা অনুমান করেন। কেননা, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম চলে যাওয়ার বেশ পরে আবদুল্লাহ তাঁর খালার ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সেখানে গিয়ে নামায পড়েন। ফলে উক্ত গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়। পরবর্তীতে আবু বকর সিদ্দিক, উসমান এবং আমের বিন আবদুল্লাহ সহ অনেকেই সেখানে নামায পড়েন।

ইবনে যাবালাহ বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশার ঘরে উক্ত ঘটনায় আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের, মারওয়ান বিন হাকাম এবং অন্য আরেকজন প্রবেশ করেছিলেন। ইবনে যুবায়ের থেকে গেলেন এবং বাকী দুইজন বেরিয়ে এলেন। তাঁরা ভাবলেন, তিনি এ স্থান সম্পর্কে জানার জন্যই হয়তো বের হচ্ছেননা। যদি তাঁকে জানানো হয় তাহলে তিনি সেখানে গিয়ে নামায পড়বেন। তিনি কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এই স্তম্ভের কাছে যান এবং খুঁটিটিকে ডানে রেখে নামাযে দাঁড়িয়ে যান। তাঁরা দু'জন গোপনে এক পার্শে দাঁড়িয়ে ইবনে যুবায়েরকে দেখছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ দুইজনকে দেখেননি। ইবনে যাবালাহ বলেছেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, এই জায়গায় দোয়া কবুল হয়।[২৫]

---

২৫· অফা আল অফা, ২য় খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহূদী

### ৩. তাওবাহ স্তম্ভ ঃ (ওসতোয়ানাহ আত্‌-তাওবাহ)

এর অপর নাম হচ্ছে আবি লুবাবাহ স্তম্ভ। এটি কবর মুবারক থেকে ২য়, কিবলাহর দিক থেকে ৩য় এবং আয়েশা স্তম্ভের পূর্বদিকের পরবর্তী স্তম্ভ।

আবু লুবাবাহ বিন মুনজের একজন প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি মদীনার ইহুদী বনি কুরায়জাহর কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয়ার অপরাধে নিজেকে ৭ দিন পর্যন্ত স্তম্ভে বেঁধে রাখেন এবং তাওবাহ কবুল হওয়ার আগ পর্যন্ত পানাহার না করার শপথ গ্রহণ করেন। ঐ গুণাহর কারণে এবং প্রচন্ড গরমে তাঁর চোখ অন্ধ ও কান বধির হওয়ার উপক্রম হয় এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। নামাযের সময় কিংবা পেশাব-পায়খানার জন্য তাঁর মেয়ে এসে বাঁধন খুলে দিত এবং পরে আবার এর সাথে তাঁকে বেঁধে রাখত। তিনি কসম করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এসে নিজ হাতে ঐ বাঁধন না খুললে তিনি নিজে তা খুলবেননা। ভোর রাত্রে উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামার ঘরে তাঁর তাওবাহ কবুলের ব্যাপারে আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ হাসেন। উম্মে সালামাহ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, আল্লাহ আবু লুবাবাহর তাওবাহ কবুল করেছেন। উম্মে সালামাহ রাসূলুল্লাহর অনুমতি নিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিয়ে বলেন, আবু লুবাবাহর তাওবাহ কবুল হয়েছে। লোকেরা তাঁর বন্ধন খুলে দিতে দৌড়ে আসে। কিন্তু তিনি বলেন, 'না, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে এসে এই বন্ধন খুলবেন।' পরে তিনি নামায পড়তে মসজিদে গিয়ে তাঁর বন্ধন খুলে দেন।

খন্দকের যুদ্ধে বনি কুরায়জাহর বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৫ দিন ব্যাপী অবরোধ করেন। আবু লুবাবাহর সাথে বনি কুরায়জার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। তারা তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ফায়সালা মানলে ফায়সালাটি কি হতে পারে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। তিনি গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়ে গলায় হাত দিয়ে হত্যার ইঙ্গিত দেন। এটাই ছিল তাঁর অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সে আমার কাছে গেলে আমি তার জন্য ক্ষমা কামনা করতাম। কিন্তু সে যেহেতু মসজিদে নিজেকে বেঁধে আল্লাহর কাছে তাওবাহ করেছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এর পর আবু লুবাবাহ আর বনি কুরায়জার এলাকায় না যাওয়ার অঙ্গীকার করেন।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি তাবুক যুদ্ধে যোগ না দেয়ার অপরাধে নিজেকে মসজিদে নবওয়ীতে বেঁধে তাওবাহ করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি উক্ত দুই ঘটনার জন্য একই সাথে নিজেকে মসজিদে বেঁধে তাওবাহ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) এই স্তম্ভের দিকে মুখ করে নফল নামায পড়তেন এবং ফজরের নামাযের পর এখানে বসে গরীব দুর্বল মুসলমান এবং নিজ মেহমানদের সাথে কথা বলতেন। কেননা মসজিদ ছাড়া তাঁর মেহমানের কোন ঘর ছিলনা। রাত্রে কোন আয়াত বা হুকুম নাযিল হলে তা তাদেরকে শিক্ষা দিতেন।

**৪. ওসতোয়ানাহ আস—সারীরঃ**

সারীর অর্থ বিছানা। এর সাথে খেজুর পাতার তৈরি একটি মাদুর বিছানো হত এবং তাতে কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) শুয়ে ঘুমাতেন। এটি পূর্বদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের জানালা ও হযরত আয়েশার জন্য তৈরী কক্ষ সংলগ্ন এবং তাওবাহ স্তম্ভের পেছনে যা মিম্বার থেকে ৪র্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। সেখানে তাঁর জন্য খেজুর পাতার তৈরি মাদুর এবং একটি বালিশ রাখা হত। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মধ্যস্থতার জন্য এই স্তম্ভের কাছে বিছানা পেতে বসতেন। তবে কোন কোন সময় তাওবাহ স্তম্ভের কাছেও তাঁর বিছানা বিছানো হত।

**৫. ওসতোয়ানাহ আল—মাহরেস বা আল—হারাস ঃ**

মাহরেস অর্থ পাহারার স্থান। এই স্তম্ভের স্থানে বসে হযরত আলী সহ কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরের বাইরে রাত্রে পাহারা দিতেন। তাই এটিকে মাহরেস নামকরণ করা হয়েছে। এটাকে 'আলী স্তম্ভ' ও বলা হয়। কেননা, তিনি প্রায় সর্বদাই পাহারা দিতেন। এখানে হযরত আলী প্রায়ই নফল নামায পড়তেন। এটি সারীর স্তম্ভের ঠিক পেছনে উত্তর দিকে রাসূলুল্লাহর (স) হুজরার দরজার পরেই অবস্থিত ছিল। মদীনার মুসলিম শাসকগণ এখানে নামায পড়তেন।

**৬. ওসতোয়ানাতুল অফুদ ঃ**

প্রতিনিধি স্তম্ভ। এটি মাহরেস স্তম্ভের উত্তরে অবস্থিত। এখানেই রাসূলুল্লাহ (সা) আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। তিনি তাদের

কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতেন ও এর সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতেন। ফলে, বহু গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। এটাকে 'গন্যমান্য মজলিস'ও বলা হয় যেখানে বড় বড় সাহাবায়ে কেরামও বসেছেন।

**৭. ওসতোয়ানাহ মোরাব্বাআ'তুল কবর ঃ**

(কবরের বর্গ স্তম্ভ) এটাকে জিবরীলের দাঁড়ানোর স্থান (মাকামে জিবরীল)ও বলা হয়। এটি পবিত্র হুজরাহর পশ্চিম-উত্তরে অবস্থিত। ইবনে যাবালাহ বলেছেন, হযরত ফাতিমার ঘরের দরজা কবরের দেয়ালের ভেতর অন্তর্ভুক্ত। এই স্তম্ভটি বর্তমানে হুজরাহ শরীফের চার দেয়ালের ভেতর পড়েছে। এটি হযরত ফাতিমার ঘরের সাথে লাগা ছিল। এটি অফুদ স্তম্ভের সারিতে অবস্থিত দুই স্তম্ভের মাঝখানে, অফুদ স্তম্ভের পূর্বদিকে, হুজরাহর জানালার সাথে লাগা আরেকটি স্তম্ভ। এখানেই রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ সময় জিবরীল (আ) কে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহিয়া কালবীর আকৃতিতে স্বাগত জানান।

এই স্তম্ভের মর্যাদার ব্যাপারে ইয়াহইয়া, আবিল হামরাহ থেকে বর্ণনা করেন। আমি ৪০ দিন সকালে আলী, ফাতিমা ও হাসান-হুসাইনের দরজার দুই অংশে হাত দিয়ে ধরা অবস্থায় রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছি। তিনি বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম আহলাল বাইত। (হে নবীর বংশধর, তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক। এরপর কোরআনের এই বাক্যটি উচ্চারণ করেনঃ 'আল্লাহ চান তোমাদের অপবিত্রতা দূর করতে। হে আহলে বাইত, এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র করতে।'

তাঁর থেকে আরেক রেওয়ায়েতে বর্ণিত। আমি মদীনায় ৭ মাস থাকি। আমার কাছে মনে হয়েছে যেন সব দিন একদিনের মতই অতিবাহিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ হযরত আলীর দরজায় এসে প্রতিদিন বলতেন, নামায, নামায। এটা তিনি তিনবার বলতেন। তারপর কোরআনের উপরে বর্ণিত বাক্যটি উচ্চারণ করতেন।[২৬]

রাসূলুল্লাহর (সা) হুজরাহ মুবারকে দেয়াল নির্মাণ ও এর দরজা বন্ধ থাকার কারণে ঐ স্তম্ভে বর্তমানে লোকের নামায পড়া সম্ভব হচ্ছেনা।

---

২৬· অফা আল অফা, ২য় খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহুদী

## ৮. তাহাজ্জুদ স্তম্ভ ঃ

এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদের নামায পড়েছেন। পূর্বে এতে আরবীতে লেখা ছিল, ( هذا متهجد النبي ﷺ ) অর্থাৎ এটি নবীর (সা) তাহাজ্জুদ নামাযের স্থান। মার্তারী বলেছেন, এটি হযরত ফাতিমার ঘরের পেছনে। এই স্তম্ভের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে, বামে বাবে জিবরীল (সাবেক বাবে উসমান) এবং এর পার্শ্বে থাকবে নবীর (সা) হুজরাহ ও ফাতিমার ঘরের পরিবেষ্টিত দেয়াল। অর্থাৎ বাবে জিবরীল দিয়ে প্রবেশ করলে বামে কিছুটা উঁচু স্থানের নাম এবং ডানে পড়ে সুফফা নামক উঁচু স্থানটি। এই স্থানে একটি মেহরাবও ছিল। পরে মসজিদে নবওয়ীতে আগুন লাগার পর মেহরাবের স্থানে শুধু স্তম্ভটি শোভা পাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) রমযান ছাড়া অন্যান্য সময়ে নিজ ঘরে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। কিন্তু রমযানে এই জায়গায় তাহাজ্জুদের নামায পড়েছেন। মসজিদ থেকে রাত্রে সব লোক বিদায় নিয়ে চলে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) খেজুর পাতার তৈরী একটা মাদুর হযরত ফাতিমার ঘরের পেছনে নিয়ে বিছিয়ে তাতে নামায পড়েন। বুখারী শরীফে যায়েদ বিন সাবেত থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) রমযানে ছোট একটি কক্ষ তৈরী করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় যেন তিনি বলেছেন, কক্ষটি খেজুর পাতার তৈরী। তিনি কয়েক রাত সেখানে নামায পড়েন। মুসলিম শরীফেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আসহাবে সুফফার একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা) কে নামাযে দেখে তাঁর সাথে শরীক হন। তারপর আরেকজন, এভাবে দেখাদেখি অনেক লোক নামাযে শরীক হতে থাকে। একদিন তিনি মাদুর উঠিয়ে ঘরে নিয়ে যান এবং আর নামায পড়ার জন্য বের হননি। সকাল বেলায় লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি রাত্রে নামায পড়তেন। আমরাও আপনার সাথে নামায পড়তাম। কিন্তু গতরাত আপনি কেন তা বন্ধ করে দিলেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমার আশংকা হয়েছিল এই নফল নামাযটি তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হতে পারে। তাই আমি তা অব্যাহত রাখা ভাল মনে করিনি। কেননা, ফরজ হলে তোমরা তা আদায় করতে পারবেনা।

## স্তম্ভ সমূহের ফজীলত

প্রত্যেকটা স্তম্ভেরই বিশেষ ফজীলত রয়েছে। ইবনে নাজ্জার বলেছেন, স্তম্ভসমূহের কাছে নামায পড়া মুস্তাহাব। কেননা, বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম

৭· তাহাজ্জুদ স্তম্ভ
৮· বাবে জিবরীল বা বাবে উসমান
৯· আহলে সুফফাহর স্থান
১০· তাওবাহ স্তম্ভ
১১· আয়েশাহ স্তম্ভ
১২· মোসাল্লা রাসূল (সা) (মেহরাব)
১৩· সুবাস স্তম্ভ
১৪· রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বার
১৫· বাইতুল মাকদেসের দিকে মুখ করে রাসূলুল্লাহর (সা) নামায পড়ার স্থান
১৬· বাবুর রাহমাহ (বাবে আতেকাহ)

## রাওদাহ শরীফ

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

অর্থঃ 'আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের একটি বাগান বা রাওদাহ।' এই রাওদাহ কত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান স্থান তা এই হাদীস দ্বরাই পরিষ্কার বুঝা যায়। রাওদাহর দৈর্ঘ ২২ মিটার ও প্রস্থ ১৫ মিটার।[২৭]

হাদীসে রাসূলুল্লাহর ঘর বলতে বিশেষ কক্ষকে বুঝানো হয়েছে। সেটি হচ্ছে হযরত আয়েশার কক্ষ। কেননা, অন্য আরেক হাদীসে এসেছে, 'আমার কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের একটি বাগান।' হযরত আয়েশার ঘরেই তাঁর কবর। উপরোক্ত হাদীসের আলোকে, রাওদাহ সম্পর্কে ৩টি মতামত রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে, ১· রাওদাহ বলতে রাসূলুল্লাহর (সা) আমলে মওজুদ সম্পূর্ণ মসজিদ। ২· মিম্বার ও হুজরাহর মধ্যবর্তী স্থানই রাওদাহ। এটি হুজরাহর দিক থেকে প্রশস্ত এবং মিম্বারের দিকে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ফলে, মিম্বার কিবলার দিকে এবং হুজরাহ তার বিপরীত দিকে বেঁকে ত্রিভুজ আকৃতি ধারণ করেছে। এটি খাতীবের মত। ৩· উভয় দিকের শেষ সীমানা বরাবর মধ্যবর্তী স্থানই হচ্ছে রাওদাহ এবং তা হচ্ছে বর্গাকৃতি বিশিষ্ট। ফলে কিবলার

---

২৭· আল মাদীনাতুল মোনাওয়ারাহ।। ডঃ উমার ফারুক সাইয়েদ রজব

দিকে অর্থাৎ মসজিদের অগ্রভাগে দক্ষিণে বিদ্যমান মিম্বার সোজা পূর্ব–পশ্চিমে লম্বা এলাকা হচ্ছে রাওদাহ, যদিও তা হুজরাহ বরাবর সোজা নয়। পক্ষান্তরে, হুজরাহর উত্তর সীমান্ত বরাবর মিম্বার পর্যন্ত পূর্ব–পশ্চিমে লম্বা সবটুকু স্থানই রাওদাহ, যদিও তা মিম্বার বরাবর সোজা নয়। এই হিসেবে এটি একটি বর্গক্ষেত্র বিশেষ।[২৮]

'রাওদাহ' বেহেশতের একটি বাগান' একথার বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা আছে। ১· হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, উলামায়ে কেরাম এর আসল অর্থ গ্রহণ না করে রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে এই জায়গায় জিকরের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে রহমত ও সৌভাগ্য লাভ করা যায়। তাই এটি যেন বেহেশতের একটি বাগান। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে তা আরো বেশী প্রযোজ্য। কেননা, তখন সেখানকার অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীরা সরাসরি রহমত ও সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

২· রাওদার ইবাদত বেহেশতের বাগানে পৌঁছায়। এই অর্থেও তা রূপক অর্থবোধক। ৩· এটি আসল অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ এই স্থানটুকু হুবহু বেহেশতে স্থানান্তর করবেন। ৩য়টি ইবনু নাজ্জার ও ইমাম মালেকের মত। একদল উলামায়ে কেরামেরও মত তাই। তারা বলেছেন, রাওদাহর অংশটুকু অন্যান্য সাধারণ যমীনের মত নয়। শেষোক্ত ব্যাখাটিই বেশী শক্তিশালী। কেননা, ১ম ও ২য় ব্যাখ্যাটি অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাতে রাওদাহর বিশেষত্ব কিছু থাকেনা।[২৯] ইবনে আবি জামরাহ এই বিরোধের সমাধানের উদ্দেশ্যে দু'টো মতকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে বলেছেন, মসজিদে নবওয়ীতে অতিরিক্ত সওয়াবের যে বর্ণনা এসেছে, রাওদাহর ফজীলত সবচাইতে বেশী এবং এই অংশটুকু হুবহু বেহেশতে স্থানান্তরিত হতে বাধা কোথায়? পবিত্র স্থান সম্পর্কে জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হল, আমরা যেন এবাদতের মাধ্যমে তা আবাদ রাখি।[৩০] ৪· এই অংশটুকু মূলতঃই বেহেশতের একটি বাগান। যেমন করে হাজারে আসওয়াদ বেহেশতের একটি পাথর। পরে এই স্থানটুকু বেহেশতে স্থানান্তর করা হবে এবঙ যে এই স্থানে নেক আমল করবে সেও

---

২৮· অফা আল অফা, ২য় খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহূদী

২৯· অফা আল অফা, ২য় খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহূদী

৩০· অফা আল অফা, ২য় খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহূদী

বেহেশতের একটি বাগান লাভ করবে। সম্ভবতঃ আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা) এর পূর্ব পিতা ইবরাহীম (আ)কে জান্নাত থেকে হাজরে আসওয়াদ এবং তাঁর সন্তান হযরত মুহাম্মাদ (সা)কে বেহেশতের বাগান দুনিয়াতে দান করে সম্মানিত করেছেন।[৩১]

## রাওদাহর স্তম্ভ সমূহের সৌন্দর্যকরণ

তুর্কী সুলতান সেলিম (মৃত্যু–৯৪৫ হিঃ সোতাবেক, ১৫৪১ খৃঃ) রাওদাহর স্তম্ভগুলোতে অর্ধেক সাদা ও অর্ধেক লাল মার্বেল পাথর লাগান এবং সেগুলোতে সোনালী রং ব্যবহার করে উজ্জ্বল করেন। তারপর সুলতান আবদুল মজীদ মসজিদ সংস্কারের সময় রাওদাহর ছাদ সংস্কার করার সময় পাথরগুলোকে রেখে দেন এবং নূতন করে স্তম্ভ নির্মাণের সময় সেগুলো ব্যবহার করেন। তিনি সেগুলোকে আরো উজ্জ্বল করেন। তবে, মেরামত কাজের সময় কিছু পাথর ভেঙ্গে যাওয়ায় কিছু স্তম্ভে মার্বেল পাথর লাগানো হয়নি। সেগুলোতে মার্বেল পাথর বিশিষ্ট স্তম্ভ সমূহের মত নকশা অংকন করা হয়। তাতে বুঝা যায় যে, এতে এক সময় মার্বেল পাথর ছিল। সাদা নকশা করা স্তম্ভগুলো রাওদাহর উত্তর সীমানার সূক্ষ্ম চিহ্ন বিশেষ।

## রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বার

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম দিকে মিম্বার ছাড়াই খুতবা দিতেন। মুসনাদে দারেমীতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) লম্বা খুতবা দিতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তখন তাঁর জন্য একটি খেজুর গাছের কান্ড পাশে মাটি খুঁড়ে দাঁড় করানো হল। ক্লান্ত হলে তিনি তাতে হেলান দিয়ে খুতবাহ দিতেন। কিন্তু মদীনার একজন মুসলমান তা দেখে বলেন, আমি তাঁর জন্য একটি মিম্বার তৈরী করে দিতে পারি। তিনি ইচ্ছা করলে বসতে পারবেন এবং ইচ্ছা করলে দাঁড়াতে পারবেন। সে অনুযায়ী তিনি মিম্বার তৈরীর নির্দেশ দেন। মিম্বার পেয়ে তিনি দুই খুতবার মাঝে বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে আরাম অনুভব করেন।

---

৩১· অফা আল অফা, ২য়খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহূদী

ইয়াহইয়া, ইবনে আবিয্–যেনাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বারের উপরের আসনে বসতেন এবং ২য় সিঁড়িতে পা রাখতেন। আবুবকর (রা) খলীফাহ হওয়ার পর ২য় সিঁড়িতে বসেন এবং নীচের সিঁড়িতে পা রাখেন। উমার (রা) খলীফাহ হওয়ার পর নীচের সিঁড়িতে বসেন এবং মাটিতে পা রাখেন। উসমান (রা) খলীফাহ হওয়ার পর প্রথম ৬ বছর উমারের অনুরূপ বসেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) আসনে বসেন। মুআওইয়াহ (রা) মিম্বারে সিঁড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করে মোট ৬টি করেন। হযরত উসমান (রা) মিসরের কাবাতী কাপড় দিয়ে প্রথমে মিম্বারের গেলাফ লাগান।

নবীর (সা) মিম্বারে কয়টি সিঁড়ি ছিল এ নিয়ে মতভেদ আছে। সুনানে দারেমীতে বর্ণিত আছে, তাতে ৩/৪টি সিঁড়ি ছিল। কামাল দোমাইরী তাঁর শরহুল মিনহাজ গ্রন্থে লিখেছেন, মিম্বারের বসা আসন ছাড়াই ৩টি সিঁড়ি ছিল। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, মিম্বারের ৩টি সিঁড়ি ছিল। সম্ভবতঃ তিন স্তর বা সিঁড়ির বর্ণনাকারীরা নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ হাদীসকে সামনে রেখে এই সংখ্যা বর্ণনা করেছেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বারের প্রথম স্তরে পা রেখে বললেন, আমীন। ২য় স্তরে পা রেখে বললেন, আমীন। তারপর ৩য় স্তরে পা রেখেও আমীন বললেন। তিনি মোট তিনবার আমীন বলেন। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমি যখন ১ম স্তরে পা দিই, তখন জিবরীল (আ) এসে বলেন,সে ব্যক্তি দুর্ভাগা যে রমযান পেয়েছে এবং তা চলেও গেছে। কিন্তু তার গুনাহ মাফ হয়নি। আমি 'আমীন' বললাম। তারপর জিবরীল বলেন, সেই ব্যক্তি হতভাগা, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারণ করা হয়, অথচ সে দরুদ পড়েনা। আমি বললাম, 'আমীন'। তারপর জিবরীল বলেন, সেই ব্যক্তিও বদবখত যে, তার মাতা–পিতা ২জন কিংবা একজনকে পেয়েছে, তাদের সেবা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে পারেনি। আমি বললাম, 'আমীন।'

এই হাদীসে ৩য় স্তর বলতে আসনকেও বুঝানো হতে পারে। তাহলে আগের বর্ণনার সাথে এর কোন বিরোধ থাকেনা। আগের বর্ণনায় মিম্বারের ২ স্তর ও আসনের কথা উল্লেখ আছে।

মিম্বারের উচ্চতা ছিল ২ হাত এবং প্রশস্ততা ছিল ১ বর্গহাত। এটি বর্গাকৃতির ছিল। পরে মারওয়ান এটিকে সাড়ে তিন হাত উঁচু করেন।[৩২]

---

৩২· অফা আল অফা, ২য় খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহুদী

ওয়াকেদী উল্লেখ করেছেন, ৫০ হিজরীতে মুআওইয়াহ (রা) মিম্বারটি দামেস্ক নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ইবনে যাবালাহ বলেন, মুআওইয়াহ (রা) মারওয়ানের কাছে মিম্বারটি দামেস্কে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ পাঠায়। মারওয়ান মিম্বার খোলার নির্দেশ দেয়। সেদিন সূর্যগ্রহণ দেখা দেয়, আলোকোজ্জ্বল দিনে অন্ধকার নেমে আসে এবং ভীষণ ঝড় প্রবাহিত হতে থাকে। তারপর মারওয়ান আসেন এবং সবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় বলেন, আপনারা মনে করেছেন, খলীফাহ্ এই মিম্বার নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমীরুল মুমেনীন ভাল করেই এই মিম্বারের মর্যাদা অবগত আছেন। আমি মিম্বার উঁচু করার জন্যই খোলার নির্দেশ দিয়েছি। তখন তিনি এর ৬টি স্তর বানান।

মাতারী উল্লেখ করেছেন, কালের আবর্তনে মিম্বারটি নষ্ট হয়ে গেছে। আব্বাসী খলীফাদের মধ্যে কেউ কেউ মিম্বারের অবশিষ্টাংশ বরকতের জন্য হেফাজত করে রেখে দিয়েছিলেন এবং সেই স্থানে নূতন মিম্বার দিয়েছিলেন। মসজিদে নবওয়ীতে আগুন লাগার ফলে মিম্বারের অবশিষ্টাংশও পুড়ে যায়। সেই পোড়া অংশগুলো সেখানেই পুঁতে রাখা হয়। ইবনে যুবায়ের তাঁর ঐতিহাসিক ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন, পরে পাকা মার্বেল পাথরের উপর মিম্বার বসানোর সময় নীচে খুঁড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বারের পোড়া অংশ দেখতে পাওয়া গেছে। বরকতের জন্যই তা সেখানে পুঁতে রাখা হয়েছে। ৬৫৪ হিজরীতে ১ম অগ্নিকান্ডে ঐ মিম্বারটি পুড়ে যায়।

**মিম্বারের সংস্কারঃ** উমাইয়া আমলে সর্বপ্রথম মারওয়ান মিম্বারের ৬টি স্তর তৈরী করেন। এরপর আব্বাসী আমলেও মিম্বার তৈরী করা হয়। ৬৫৪ হিজরী মোতাবেক ১২৫৮ খৃ, মসজিদে নবওয়ীর অগ্নিকান্ডে মিম্বার পুড়ে যাওয়ায় ইয়েমেনের বাদশাহ মোজাফফর চন্দন কাঠের তৈরী একটি মিম্বার পাঠান যা ১০ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়।

৬৬৪ হিঃ মোতাবেক ১২৬৮ খৃঃ, মিসরের শাসক জাহের বাইবারস আল-বান্দকারী একটি মিম্বার পাঠান। ইয়েমেনের শাসকের মিম্বার তুলে সেই স্থানে তা বসানো হয় এবং ৭৯৭হি মোতাবেক ১৩৯৭ খৃঃ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

৭৯৭ হিঃ জাহের বারকুক একটি মিম্বার পাঠান। এটি জাহের বাইবারসের মিম্বারের স্থানে বসানো হয়। তারপর ৮৮০ হিঃ মোতাবেক ১৪৭৮ খৃঃ,

মোআইয়েদ শেখ মামবূরা একটি মিম্বার পাঠান এবং সেটি জাহের বারকুকের মিম্বারের স্থলাভিষিক্ত হয়।

৮৮৬ হিঃ সনে মসজিদে নবওয়ীতে ২য় দফা অগ্নিকান্ডে মোআইয়েদ শেখের মিম্বার পুড়ে যাওয়ায় মদীনা বাসীরা ইট দিয়ে পাকা মিম্বার তৈরী করেন।

৮৮৮ হিজরীতে আশরাফ কায়েতবায় মার্বেল পাথরের তৈরী একটি মিম্বার পাঠান। সেটি মদীনাবাসীদের তৈরী ইটের পাকা মিম্বারের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। মদীনার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নূরুদ্দিন সামহুদী উক্ত মিম্বার হুবহু রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বারের স্থানে বসাতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কিছুটা কিবলার দিকে সরিয়ে আনা হয় এবং পবিত্র রাওদার ৫ আঙ্গুল পরিমাণ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়।

৯৯৮ হিজরী মোতাবেক, ১৫৯৩ খৃঃ , তুর্কী সুলতান মুরাদ মার্বেল পাথরের তৈরী একটি মিম্বার পাঠান। সে সময়ে ঐটি বিশ্বের এক অতুলনীয় সুন্দর জিনিস ছিল। এতে সোনার কারুকার্য ছিল। সেটি মসজিদে নবওয়ীতে বসানো হয়। আশরাফ কায়েতবারের মিম্বারটি মসজিদে কুবায় স্থানান্তরিত করা হয়। উভয় মিম্বার বর্তমান সময় পর্যন্ত দুই মসজিদে বিদ্যমান আছে।

**মিম্বারের ফজীলতঃ** হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বার তাঁর হাউজের উপর। একথার বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১· আল্লামাহ খাত্তাবী বলেছেন, এর অর্থ হল, কোন কাজের উদ্দেশ্যে তাঁর মিম্বারের কাছে উপস্থিত হলে এর বিনিময়ে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে পরকালে নবীর হাউজ থেকে পানি পান করাবেন। ২· ইবনে নাজ্জার বলেছেন, অন্যান্য সৃষ্টির মত আল্লাহ নবীর (সা) এই মিম্বারকে পরকালে উঠাবেন এবং তা তাঁর হাউজের উপর প্রতিষ্ঠিত করবেন। ইবনে আসাকিরও একই মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন, অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এই মতই পোষণ করেন। পরে তাঁর উস্তাজ ইবনে নাজ্জারও এই মত পোষণ করতেন। ৩· আল্লাহ আখেরাতে অনুরূপ একটি মিম্বার সৃষ্টি করে তা হাউজের উপর প্রতিষ্ঠা করবেন। ৪· নূরুদ্দিন সামহুদীর মতে, বেহেশতে মিম্বারসহ মিম্বারের স্থানটি হুবহু স্থানান্তর করা হবে এবং মিম্বারটিকে বেহেশতের উপযোগী করে পেশ করা হবে। মিম্বারটি হাউজের পেছনে পানির উৎস স্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে।[৩৩]

এই জায়গায় আমল ও ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উম্মাহকে উৎসাহিত করেছেন এবং এর বিনিময়ে জান্নাতে হাউজের পানি পান করার সুসংবাদ দিয়েছেন। ইবনে আসাকির উল্লেখ করেছেন, মসজিদের যেয়ারতকারীরা মিম্বারের পার্শে দোয়া করে থাকেন।[৩৪]

## মসজিদে নবওয়ীর ফজীলত

মুসলমানদের ২য় পবিত্রস্থান মসজিদে নবওয়ীর ফজীলত ও মর্যাদা অনেক বেশী। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ কোনটি তা নিয়ে মতভেদ করেন। আল্লাহ বলেছেনঃ

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ

অর্থঃ 'যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আপনার সে মসজিদে নামায পড়াই উত্তম।' তাঁদের একজন এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, 'সেটি এই মসজিদে নবওয়ী এবং কুবা মসজিদ।'

মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদিন আমি তাঁর কাছে তাঁর এক স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল! কোরআনে যে মসজিদকে তাকওয়ার বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলা হয়েছে, সেটি কোনটি? তখন তিনি এক মুষ্টি পাথর নিয়ে তা মাটিতে নিক্ষেপ করে বলেন, সেইটাই তোমাদের এই মসজিদ–মসজিদে মদীনাহ্। অর্থাৎ মসজিদে নবওয়ী।

মসজিদে কুবা যেমন প্রথম মসজিদ, তেমনি মসজিদে নবওয়ী ও মদীনার আভ্যন্তরীন প্রথম মসজিদ। মসজিদে কুবা যদি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে মসজিদে নবওয়ীও যে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই উপরোক্ত হাদীসে দুই মসজিদকেই তাকওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে কোরআনের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

---

৩৩· অফা আল অফা।। নূরুদ্দীন সামহুদী

৩৪· ঐ

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

وَمَسْجِدُ الرَّسُوْلِ وَ مَسْجِدُ الْاَقْصٰى (বুখারী মুসলিম শরীফ)

অর্থঃ 'তিন মসজিদ ব্যতীত আর কোন পবিত্র স্থানে সওয়াবের উদ্দেশ্যে যেন সফর করা না হয়। সে তিন মসজিদ হচ্ছে, মক্কার মসজিদে হারাম, মদীনার মসজিদে নবওয়ী এবং জেরুসালেমের মসজিদে আকসা।' এই হাদীসে যেয়ারতের তিন স্থানের মধ্যে মসজিদে নবওয়ী হচ্ছে অন্যতম।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'মসজিদে হারাম ব্যতীত আমার এই মসজিদের নামায, অন্যান্য মসজিদের নামায থেকে এক হাজার গুণ উত্তম।' (বুখারী) ইমাম মুসলিম এই হাদীসের সাথে আরো একটু যোগ করে বলেছেনঃ 'আমি হলাম সর্বশেষ নবী, আমার মসজিদও সর্বশেষ মসজিদ।' অর্থাৎ এটিই সর্বশেষ নবীর মসজিদ। আর কোন নবী আসবেনা বলে আর কোন নবী নির্মিত মসজিদও হবেনা। এই হাদীসে মসজিদে হারামের পরেই মসজিদে নবওয়ীর নামাযের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। মসজিদে হারামে প্রতি রাকাতে ১ লাখ গুণ সওয়াব আর মসজিদে নবওয়ীতে ১ হাজার গুণ সওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে আকসার নামাযের চাইতেও মসজিদে নবওয়ীর নামায ১ হাজার গুণ উত্তম। ইবনুন্নাজ্জার আরকাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আরকাম বলেন, 'আমি বাইতুল মাকদেসে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কেন? আমি বললাম, নামায পড়ার জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এখানে নামায পড়া সেখানকার চাইতে এক হাজার গুণ বেশীউত্তম।'

তাবরানী আবুদ্ দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মসজিদে হারামের নামাযে একলাখ গুণ, আমার মসজিদে ১ হাজার গুণ ও বাইতুল মাকদেসে ৫শ গুণ সওয়াব হয়। ইবনে খোযায়মাহ এবং বাজ্জারও এই একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। যায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে আমার এই মসজিদে নামায পড়া কিংবা জিকর করা অথবা

কোন কিছু শিখা বা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে, আল্লাহর কাছে সে মুজাহিদ হিসেবে বিবেচিত।'[৩৫]

হযরত আবু উমামাহ এবং সহল বিন হানীফ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন। 'যে ব্যক্তি পবিত্রতা সহকারে আমার মসজিদে একমাত্র নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বের হয় এবং নামায পড়ে, সে একটি হজ্জের সওয়াব ও মর্যাদা লাভ করে।'(বায়হাকী।)

সাঈদ বিন মোসাইয়েব থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদের আযান শুনে কোন কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে না আসে, সে মুনাফিক।'[৩৬]

এছাড়াও যে মসজিদে বেহেশতের একটি বাগান আছে এবং যেখানকার মিম্বার নবীর (সা) হাউজের উপর প্রতিষ্ঠিত সে মসজিদের ফজীলত ও মর্যাদা অপরিসীম।

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 'যে আমার এই মসজিদে কোন জিনিস শিখা বা শিক্ষা দানের জন্য আসে, সে আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদ হিসেবে বিবেচিত এবং যে এছাড়া অন্য কিছুর জন্য আসে, তার অবস্থা হচ্ছে অন্যের সম্পদের প্রতি নজরকারী। (ইবনে মাজাহ)

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এবং তাবরানী আওসাত গ্রন্থে আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেন, যে আমার মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামায পড়ে. এবং মাঝে তার কোন নামায না ছুটে, তার ভাগ্যে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি, আযাব থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি লেখা হয়।।'

বায়হাকী জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আমার মসজিদের নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের জুমার চাইতে এক হাজার গুণ উত্তম। আমার মসজিদের রমযান

---

৩৫· ওমদাতুল আখবার ফী মাদীনাতিল মুখতার।। শেখ আহমদ বিন আবদুল হামীদ আব্বাসী

৩৬· ওমদাতুল আখবার ফী মাদীনাতিল মুখতার।। শেখ আহমদ বিন আবদুল হামীদ আব্বাসী

মসজিদে হারাম ব্যতীত, অন্যান্য মসজিদের রমযানের চাইতে একহাজার মাস অপেক্ষাউত্তম।'

এই হাদীস সহ অন্যান্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিন মসজিদে নামায রোযা ও অন্যান্য সকল ইবাদতের অতিরিক্ত সওয়াব পাওয়া যায়, এটা শুধু নামাযের মধ্যেই সীমিত নয়। অন্যান্য ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল ইবাদত করলে অতিরিক্ত সওয়াব পাওয়া যাবে।

## ১. উমার বিন্ খাত্তাবের (রা) সম্প্রসারণ

ইমাম বুখারী ও আবু দাউদ আবদুল্লাহ বিন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর খেলাফতকালে মসজিদে নবওয়ীর সম্প্রসারণ করেননি। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি এদিকে মনোযোগ দিতে পারেননি। হযরত উমার খেলাফত লাভের পর মসজিদ সম্প্রসারণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং বলেন, আমি যদি নবী (সা) কে একথা বলতে না শুনতাম যে, 'মসজিদ সম্প্রসারণ দরকার' তাহলে আমি তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতামনা। তিনি ১৭ হিজরী সালে মসজিদের সামনে কিবলার দিকে এক স্তম্ভ, পশ্চিমে ২ স্তম্ভ ও উত্তরে ১৩·৫ মিটার বৃদ্ধি করেন। ফলে, মসজিদের দৈর্ঘ ৫৩ মিটার এবং প্রস্থ ৪৫·৯ মিটার দাঁড়ায়। তিনি কাঁচা ইট, খেজুর পাতা, ডাল ও কান্ড দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুরূপ মসজিদ পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি ৪·৯ মিটার উপরে চাল তৈরি করেন। হযরত উমার (রা) মসজিদ ১১০০ মিটার বাড়ান। নামাযীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মসজিদ সম্প্রসারণ করা জরুরী হয়ে পড়ে।

তাবাকাতে ইবনে সা'দে বর্ণিত। হযরত উমারের আমলে মুসল্লীর সংখ্যা বেড়ে যায় এবং মসজিদে লোকের সংকুলান না হওয়ায় উমার (রা) মসজিদের আশ–পাশের ঘর–বাড়ী কিনে মসজিদ বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় হযরত আব্বাসের ঘর ও উম্মাহাতুল মুমেনীনের ঘর নিয়ে। তিনি উম্মাহাতুল মুমেনীনের ঘর নেয়া যুক্তি সঙ্গত মনে করলেননা। তাই হযরত আব্বাসকে তাঁর ঘরের ব্যাপারে তিনটি প্রস্তাব দেন। ১, বিক্রী করে দাম গ্রহণ করা। ২· জায়গা পরিবর্তন করে বাইতুল মাল থেকে তাঁর জন্য ঘর তৈরী করে দেয়া কিংবা ৩· দান করে দেয়া। যাতে করে তাতে মসজিদ সম্প্রসারণ করা যায়। আব্বাস (রা) বলেন, এই জায়গাটুকু রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দিয়েছেন। তাই আমি উক্ত তিন প্রস্তাবের কোনটার সাথে একমত নই। উবাই বিন কা'ব তাঁদের সালিশ নিযুক্ত হন। তিনি এই বিরোধের অবসানের উদ্দেশ্যে দু'জনকে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীস শুনান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ দাউদ

(আ)কে মসজিদে আকসা তৈরীর নির্দেশ দেন যেখানে আল্লাহকে স্মরণ করা হবে। কিন্তু ঐ জায়গায় একজন ইহুদী ইয়াতীমের ঘর ছিল। সে তা কোন অবস্থাতেই বিক্রী করতে রাজী ছিলনা। তখন হযরত দাউদ তা জোর করে নেয়ার কথা চিন্তা করায় আল্লাহ ওহী নাযিল করে বলেন, হে দাউদ! আমি তোমাকে আমার ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছি। আর তুমি সেই ঘরে জবরদখল কৃত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছ। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, দাউদ (আ) দেয়াল সমাপ্ত করেছিলেন। কিন্তু দেয়ালের দুই তৃতীয়াংশ ধ্বসে পড়ে গেল। যাই হোক, আল্লাহ বলেন, তোমার প্রতি আমার শাস্তি হল, আমার ঘর নির্মাণ স্থগিত রাখ। তখন দাউদ (আ) ফরিয়াদ করেন, হে আমার রব! আমার সন্তানকে উক্ত ঘর তৈরীর সুযোগ দিন। আল্লাহ সেই প্রার্থনা কবুল করেন।

পরে হযরত আবু যার (রা) ও আরেকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সা) কাছ থেকে উক্ত হাদীস শুনার সাক্ষ্য দেন। তারপর উমার বলেন, হে আব্বাস, আপনি যান, আপনার ঘরের ব্যাপারে আমার আর কোন বক্তব্য নেই। তখন আব্বাস (রা) বলেন, তাহলে আমি তা মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য মুসলমানদের উদ্দেশ্যে দান করে দিচ্ছি। এরপর উমার মসজিদ সম্প্রসারণ করেন এবং আব্বাস (রা) এর জন্য মসজিদের অদূরে বাইতুল মাল থেকে একটি ঘর তৈরী করে দেন।

## ২. হযরত উসমানের (রা) সম্প্রসারণ

হযরত উসমান (রা) খেলাফত লাভ করার পর জুমআর নামাযে নামাযীর সংকুলান না হওয়ায় লোকেরা মসজিদ সম্পসারণের জন্য হযরত উসমানের কাছে দাবী জানান। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেন। একদিন জোহরের নামায শেষে তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, আমি মসজিদ ভেঙ্গে তা সম্প্রসারণ করতে চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন। আমার পূর্বসূরী খলীফাতুল মুসলিমীন উমার (রা) মসজিদ ভেঙ্গে তা পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম সহ সকল মুসলমান এব্যাপারে ঐক্যমত প্রকাশ করেন। তিনি হিঃ ২৮–৩০ সালের মধ্যে, কিবলার দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে এক স্তম্ভ, পশ্চিম দিকে এক স্তম্ভ এবং উত্তর দিকে ৪·৫ মিটার সম্প্রসারণ করেন। তিনি তাতে নকশা করা পাথর ব্যবহার করেন এবং স্তম্ভগুলোতে লোহা লাগান ও তা শিশা গলিয়ে

ঢালাই করেন। চালে সাজ কাঠ ব্যবহার করেন। উসমান মসজিদে মোট ৪৯৬ বর্গমিটার সম্প্রসারণ করেন।

### ৩. ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের সম্প্রসারণ

হযরত উসমানের সম্প্রসারণের পর হযরত আলী (রা), মোআওইয়াহ (রা), ইয়াযিদ, মারওয়ান ও আবদুল মালেক বিন মারওয়ান মসজিদের সম্প্রসারণ করেননি। ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেক তা সম্প্রসারণ করেন। তখন মদীনার গভর্ণর ছিলেন উমার বিন আবদুল আযীয (রা)।

ইবনে যাবালাহ বর্ণনা করেছেন, একদিন ওয়ালিদ মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবাহ দেয়ার সময় হযরত ফাতিমাহর (রা) ঘরে একটি বর্গাকৃতির পর্দার ভেতর হাসান বিন হাসান বিন আলীকে (রা) আয়েনার সামনে দাঁড়ি আঁচড়াতে দেখেন। তারপর তিনি উক্ত ঘরটি কিভাবে ধ্বংস করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ করেন। পরে সিদ্ধান্ত হয় যে, তিনি মসজিদ সম্প্রসারণ করবেন এবং ঘরটি কিনে তা ভেঙ্গে ফেলে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন। তিনি উমার বিন আবদুল আযীযের কাছে মসজিদ সম্প্রসারণের নির্দেশ পাঠান এবং এই ঘরটি কিনে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করার আদেশ দেন। হাসানের কাছে ৭/৮ হাজার দীনারের বিনিময়ে ঘর কেনার প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন, আল্লাহর কসম, আমরা এই ঘরের মূল্য বাবত অর্থ কখনই খাবোনা। ঘটনা ওয়ালিদকে জানানোর পর তিনি ঘরটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু হাসান ঘর ভাঙ্গার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বেচ্ছায় ঘর ত্যাগ করেননি।

অনুরূপভাবে, ওয়ালিদ উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসার (রা) ঘর কেনার জন্য উমার পরিবারের কাছে চিঠির মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠান। তাঁরা উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর সেই ঘরটিও ভেঙ্গে ফেলা হয়।

ওয়ালিদের সম্প্রসারণ শুরু হয় ৮৮ হিজরীতে এবং শেষ হয় ৯১ হিজরীতে। এক বর্ণনা অনুযায়ী ৯৩ হিজরীতে শেষ হয়। মদীনার গভর্ণর উমার বিন আবদুল আযীয মসজিদে সর্বপ্রথম মিনারা ও মেহরাব তৈরি করেন এবং পার্শ্বে ছায়াদার স্থান নির্মাণ করেন। তিনি উম্মাহাতুল মুমেনীনের কক্ষসমূহ ভেঙ্গে তা মসজিদের ভেতর প্রবেশ করান। কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে, তখন মসজিদের দৈর্ঘ ও প্রস্থ দাঁড়ায় ৯০ মিটার। তিনি মোট ২ হাজার ৩৬৯ বর্গমিটার সম্প্রসারণ করেন।

## ৪. খলীফাহ মাহদীর সম্প্রসারণ

আব্বাসী খলীফাহ মাহদী ১৬১–১৬৫ হিজরী মোতাবেক ৭৭৯–৭৮৩ খৃঃ, মসজিদের উত্তর দিক সম্প্রসারণ করেন। তিনি দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্বদিকে মসজিদ বাড়াননি। উত্তর দিকে ৪৫ মিটার পরিমাণ বাড়িয়েছেন। ফলে মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৩৫ মিটার ও প্রস্থ ৪৮৬ মিটারে দাঁড়ায়। এই সম্প্রসারণের সময় তিনি কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামের ঘর ভেঙ্গে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ, শুরাহবীল বিন হাসানাহ, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এবং মিসওয়ার বিন মাখরামাহর ঘরও ছিল। তিনি মসজিদের ইমারত তৈরী করেন, তাতে মোজাইক লাগান এবং ওয়ালিদের মত লোহার স্তম্ভ নির্মাণ করেন। তাঁর সম্প্রসারণের মোট আয়তন হচ্ছে, ২৪৫০ বর্গমিটার।

## ৫. আশরাফ কায়েতবায়ের সম্প্রসারণ

মসজিদে নবওয়ীতে দু'বার আগুন লাগে। একবার হিঃ ৬৫৪ সন (মোতাবেক ১২৫৮ খঃ এবং অন্যবার হিঃ ৮৮৬ সন (মোতাবেক ১৪৮৪ খৃঃ)। ১ম বার আগুন লাগার পর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ মসজিদের পুনর্গঠনে অংশ নেন। আব্বাসী খলীফাহ মু'তাসিম বিল্লাহ বাগদাদ থেকে নির্মাণ সামগ্রী এবং রাজমিস্ত্রী পাঠান। ৬৫৫ হিঃ (১২৫৯ খৃঃ) সনে কাজ শুরু হয় এবং তাতার কর্তৃক বাগদাদ দখলের কারণে সেই বছরই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে যে সকল মুসলিম শাসক এই কাজে এগিয়ে আসেন তাঁরা হলেন, ইয়েমেনের শাসক মুজাফফর শামসুদ্দিন, মিসরের শাসক মানসুর নুরুদ্দিন আলী আইবাক, জাহের রোকনুদ্দিন বাইবারস বন্দুকদারী, নাসের মুহাম্মাদ বিন কালাউন আস–সালেহী, আশরাফ বারসাবাই, জাহের জাকমাক ও সুলতান কায়েতবায়। পুনর্গঠন কাজে কয়েক বছর লেগে যায়। তবে তাঁরা মসজিদ বাড়াননি।

৮৮৬ হিজরীতে দ্বিতীয়বার অগ্নিকান্ডের পর মদীনাবাসীরা মিসরের শাসক আশরাফ কায়েতবায়ের কাছে চিঠি লেখায় তিনি প্রয়োজনীয় সামগ্রী, রাজমিস্ত্রী ও প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠান। ৮৮৮ হিঃ (১৪৮৬ খৃঃ) সনে মসজিদের ছাদ পুনঃনির্মাণ করা হয় এবং ৮৯০ হিঃ (১৪৮৮ খৃঃ) সনে কাজ শেষ হয়।

ঐতিহাসিক আল–বারযানজী তার 'নুযহাতুন নাজেরীন' বইতে এই সংস্কার সম্পর্ক লিখেছেন। মসজিদে নবওয়ীর ছাদ কাঠ ও ইটের তৈরী এবং স্তম্ভগুলো কাল পাথর ও লোহা দ্বারা তৈরী। এগুলোতে চুন–সুরকী ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি আরো লিখেছেন, আশরাফ কায়েতবায়ের সংস্কারের আগে মসজিদের দক্ষিণ দিকে প্রশস্ততা ছিল ৬৪·২ মিটার। 'সবুজ গম্বুজ' তৈরীর উদ্দেশ্যে তিনি ১ মিটার বাড়ান। পরে তুর্কী সুলতান আবদুল মজীদ পূর্বদিকে আরো ২ মিটার বাড়ান। যাই হোক, তিনি পরে তা নিজহাতে মেপে দেখেন, দক্ষিণে প্রশস্ততা হচ্ছে ৭৮·৭ মিটার এবং উত্তরে হচ্ছে ৬০·৭ মিটার।

## ৬. সুলতান আবদুল মজীদের সম্প্রসারণ

২য় বার অগ্নিকান্ডের পর সুলতান কায়েতবায়ের নির্মিত মসজিদ ৩৮৭ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে মসজিদের দেয়াল ও ছাদ নষ্ট হয়ে যায়। মসজিদের তদানীন্তন তত্বাবধায়ক শেখুল হারাম দাউদ পাশা ১২৬৩ হিঃ (১৮৪৭ খৃঃ) সনে ইস্তাম্বুলে তুর্কী সুলতান আবদুল মজীদ খানের কাছে তা লিখে জানান। সুলতান বিষয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন। মসজিদের ক্ষয়–ক্ষতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার পর তিনি আর্কিটেক্ট, বিশেষজ্ঞ, কাঠমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠান। ১২৬৫ হিঃ (১৮৪৯ খৃঃ) সনে নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং দীর্ঘ তের বছর পর ১২৭৭ হিঃ (১৮৬২ খৃঃ) সনে শেষ হয়। এই নির্মাণ কাজে জুল–হোলায়ফার নিকটবর্তী জামাওয়াতের পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়ের লাল পাথর ব্যবহার করা হয়। এই নির্মাণ কাজ এযাবত সর্ববৃহৎ, মজবুত, উৎকৃষ্ট ও সুন্দর নির্মাণ কাজ হিসেবে বিবেচিত। সৌদী সম্প্রসারণের সময় এর দক্ষিণাংশ খুবই মজবুত বলে তা অক্ষুন্ন রাখা হয়।

সুলতান আবদুল মজীদের এই সংস্কারের সময় গম্বুজের কাঠ পরিবর্তন করে লোহা ব্যবহার করা হয় এবং গম্বুজের ভেতর প্রাকৃতিক দৃশের আকর্ষণীয় কারুকার্য করা হয়। মসজিদের সামনের দেয়ালে সোনালী অক্ষরে কোরআনের বিভিন্ন সূরাহ, রাসূলুল্লাহর (সা) নাম ইত্যাদি অংকন করা হয়। বর্তমানে সামনের অংশে যে সকল দরজা অবশিষ্ট আছে তা হচ্ছে বাবে জিবরীল, বাবুস সালাম ও বাবুর রাহমাহ। উত্তর দিকে বাবুল মজীদী ও বাব মাখযান আল–যাইত ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

তিনি মসজিদের সামনের অংশে রাসূলুল্লাহর (সা) তৈরী খেজুর গাছের খুঁটিগুলোর স্থানে পাকা স্তম্ভ নির্মাণ করেন এবং মসজিদে কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মসজিদের উত্তর পার্শ্বে একটি গুদাম ঘর তৈরী করেন। পূর্বদিকের সংকীর্ণতা দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি ২ মিটার বাড়ান। তিনি মোট ১২৯৩ বর্গমিটার স্থান সম্প্রসারণ করেন।

## ৭. বাদশাহ আবদুল আযীযের সম্প্রসারণ

তুর্কী সুলতান আবদুল মজীদের নির্মাণের পর মসজিদে ক্রমবর্ধমান মুসল্লীর কারণে এবং বিশেষ করে হজ্জ মওসুমে বেশী সংখ্যক লোকের সমাগমের ফলে মসজিদ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই এই কাজের জন্য প্রখ্যাত সৌদী ঠিকাদার বিনলাদিন কোম্পানীকে নিয়োগ করা হয়। ১৩৭০ হিঃ (১৯৫১ খৃঃ) সনে কাজ শুরু হয় এবং দীর্ঘ ৫ বছর পর তা শেষ হয়। বাদশাহ আবদুল আযীযের সম্প্রসারণে উত্তর–পূর্ব ও পশ্চিমে মসজিদ বাড়ানো হয়। সম্প্রসারণের সময় আশ–পাশের বহু বাড়ী–ঘর ভেঙ্গে তা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সম্প্রসারণের আওতায় মসজিদের চারদিকের রাস্তা সমূহকেও বড় করা হয়। ইমারতে সিমেন্ট ও মোজাইক ব্যবহার করা হয়। মোজাইক তৈরীর উদ্দেশ্যে হারাম সীমানার বাইরে জুল–হোলায়ফার কাছে ইটালী কৌশলীদের তত্ত্বাবধানে একটি কারখানা তৈরী করা হয়।

মসজিদে নবওয়ীর ইতিহাসে তুর্কী সুলতান আবদুল মজীদের ইমারতের পর সৌদী বাদশাহ আবদুল আযীযের ইমারত বিরাট ও মজবুত।

বাদশাহ আবদুল আযীযের সংস্কারের সময় সুলতান আবদুল মজীদের নির্মিত ইমারতের ৬২৪৭ মিটার ভেঙ্গে ফেলা হয়। তিনি ৬০২৪ মিটার সম্প্রসারণ করেন। ফলে, তাঁর সম্প্রসারণের মোট আয়তন হচ্ছে ১২,২৭১ বর্গ মিটার। দক্ষিণে সুলতান আবদুল মজীদের নির্মিত মসজিদের অবশিষ্টাংশের পরিমাণ হচ্ছে ৪০৫৬ বর্গমিটার। এই অংশের মধ্যে রয়েছে হুজরাহ শরীফ, সবুজ গম্বুজ, মিম্বার, রাওদাহ, ঐতিহাসিক স্তম্ভসমূহ, প্রধান মিনারা, বাবুস সালাম ও রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের স্থান বা মেহরাব।

## বাদশাহ আবদুল আযীযের আমলে মসজিদের দরজা

মসজিদে নবওয়ীর ১০টি দরজার মধ্যে ৫টি বাদশাহ আবদুল আযীয কর্তৃক এবং অবশিষ্টগুলো পূর্বে নির্মিত। দরজাগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপঃ

**১. বাবুস সালামঃ** এটি মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। হযরত উমার (রা) মসজিদ সম্প্রসারণ করার পর যে নূতন দরজা তৈরী করেন এটি তারই পাশাপাশি।

**২. বাবুর রাহমাহঃ** এর অপর নাম হচ্ছে বাব আতেকাহ। এটি বাবুন্নিসার বিপরীত দিকে এবং পশ্চিম দেয়ালে অবস্থিত।

**৩. বাবে জিবরীলঃ** এর অপর নাম হচ্ছে বাবে উসমান। এটি মসজিদের পূর্ব দেয়ালে হুজরাহ শরীফের দেয়ালের শেষ সীমানার পর অবস্থিত।

**৪. বাবুন্নিসাঃ** এটি মসজিদের পূর্ব দেয়ালে এবং বাবে জিবরীলের উত্তর পার্শ্বেঅবস্থিত।

## সৌদী শাসনামলে নির্মিত ৫টি দরজার বর্ণনা নিম্নরূপ

**৬. বাব আবদুল আযীযঃ** এটি মসজিদের পূর্ব দেয়ালে বাবুন নিসার পরে অবস্থিত এবং তিনটি পাশাপাশি দরজার বৃহত্তর নাম।

**৭. বাবে উসমান বিন আফফানঃ** এটি মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত।

**৮. বাবুল মজীদীঃ** এটি উত্তর দেয়ালের মাঝামাঝি অবস্থিত। তুর্কী সুলতান আবদুল মজীদের নির্মাণ কাজের স্মৃতি স্বরূপ এই নামকরণ করা হয়েছে।

**৯. বাবে উমার বিন খাত্তাবঃ** মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

**১০. বাবে সউদঃ** এটি পশ্চিম দেয়ালের প্রায় মাঝামাঝি অবস্থিত। এটি বাবুর রাহমাহর উত্তরে তিনটি পাশাপাশি দরজার বৃহত্তর নাম।

## ৮. সৌদী বাদশাহ ফয়সল বিন আবদুল আযীযের সম্প্রসারণ

ক্রমবর্ধমান মুসল্লীর সংকুলানের জন্য তিনি মূল মসজিদ ভবন সংলগ্ন পশ্চিমে প্রথম পর্যায়ে ৩৫ হাজার বর্গমিটার ও ২য় পর্যায়ে আরো ৫ হাজার ৫৫০ বর্গমিটার এলাকায় শেড নির্মাণ করেন এবং ভিত পাকা করে নামাযের ব্যবস্থা করেন। এতে বৈদ্যুতিক পাখা ও মাইকের ব্যবস্থা করা হয়। তবে তিনি মূল ভবনের কোন সংস্কার করেননি।

## ৯. সৌদী বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আযীযের সম্প্রসারণ

তিনি আরো বেশী মুসল্লীর সংকুলানের জন্য পশ্চিমে মানাখা সড়ক পর্যন্ত ৪৩ হাজার বর্গমিটার এলাকায় বর্ধিত শেড নির্মাণ করেন। এর ফলে, বাদশাহ ফয়সলের সাথে এই সম্প্রসারণ সংযুক্ত হওয়ায় বিরাট শেডযুক্ত ময়দান তৈরী হয় এবং তাতে মুসল্লীদের নামায আদায়ের সুবিধে বৃদ্ধি পায়।

## ১০. সৌদী বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীযের সম্প্রসারণ

বাদশাহ ফাহাদের এই সম্প্রসারণ মসজিদের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ সম্প্রসারণ। তিনি নিজে ৫ই সফর, ১৪০৫ হিঃ মোতাবেক, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে কাজের উদ্বোধন করেন। বর্তমান মসজিদকে অক্ষুন্ন রেখে এর ডিজাইন ও কারুকার্যের সাথে মিল রেখে মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমে ৫ গুণ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মসজিদের পূর্বের আয়তন হচ্ছে ১৬৫০০ বর্গমিটার। এই সম্প্রসারণ শেষে আয়তন হচ্ছে ৯৮ হাজার ৫শ বর্গ মিটার। অর্থাৎ যোগ হয়েছে ৮২ হাজার বর্গমিটার। আগে ২৮ হাজার লোকের নামাযের ব্যবস্থা ছিল। এখন তাতে ১ লাখ ৬৭ হাজার মুসল্লীর সংকুলান হয়েছে। ছাদের ৬৭ হাজার বর্গমিটার এলাকা নামাযের জন্য তৈরী করা হয়েছে। তাতে আরো ৯০ হাজার মুসল্লীর সংকুলান হয়েছে। মসজিদের চারপাশের আঙ্গিনার আয়তন হচ্ছে ১লাখ ৩৫ হাজার বর্গমিটার। তাতে আরো অতিরিক্ত ২ লাখ ৫০ হাজার লোক নামায পড়তে পারে। মসজিদ ও আঙ্গিনা–সব মিলিয়ে মোট ৬ লাখ ৫০
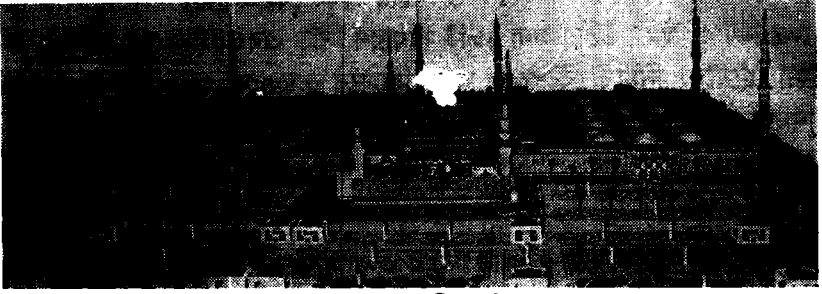
বাদশাহ ফাহাদের সম্প্রসারিত মসজিদে নবওয়ীর ছবি

হাজার লোক নামায পড়তে পারে। মসজিদের নীচ তলার আয়তন হচ্ছে ১ লাখ ৬৫ হাজার বর্গমিটার। এর উপর দোতলাও তৈরী করা যাবে। বেইজম্যান্টের আয়তন হচ্ছে ৮৭ হাজার বর্গমিটার। নূতন সম্প্রসারিত অংশের নীচের সমান এলাকা সবটুকুই বেইজম্যান্ট। ছাদে তাপ নিয়ন্ত্রনকারী মার্বেল পাথর লাগানো হয়েছে যাতে প্রচন্ড গরমের সময়ও তা ঠান্ডা থাকে এবং তাতে নামায পড়তে কষ্ট না হয়। মসজিদের চারপাশের বৃহদাকার আঙ্গিনায়ও অনুরূপ তাপ নিয়ন্ত্রিত মার্বেল পাথর বসানো হয়েছে।

বেইজম্যান্টে কেন্দ্রীয় এয়ারকন্ডিশন, অগ্নি সতর্ক সংকেত ও নির্বাপনের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে। বেইজম্যান্টে কংক্রিট দ্বারা তৈরী স্তম্ভের সংখ্যা হচ্ছে ১,৭৯৪টি।

মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা ২৭। প্রতিটার আয়তন হচ্ছে ১৮ X ১৮ মিটার। আবহাওয়ার প্রেক্ষিতে গম্বুজগুলো বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে খোলা ও বন্ধ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ গরমের সময় বন্ধ করে দেয়া যাবে এবং অন্য সময় তাজা বাতাস প্রবাহের জন্য খুলে দেয়া যাবে।

মসজিদের ৬টি নূতন মিনারা তৈরী করা হয়েছে। ফলে পূর্বের ৭২ মিটার উঁচু ৪টি মিনারা সহ মিনারার মোট সংখ্যা হচ্ছে ১০টি। আগের গুলো থেকে এগুলোর উচ্চতা ২০ মিটার বৃদ্ধি করে ৯২ মিটার করা হয়েছে। আরো ৬ মিটার উপরে নির্মিত হয়েছে নূতন চাঁদ। ফলে, মোট উচ্চতা দাঁড়িয়েছে ৯৮ মিটার। ৮৬ মিটার উঁচু একটি মেশিন দ্বারা লেসার রশ্মি ব্যবহার করে তাতে কিবলার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যাতে ৫০ কিলোমিটার দূর থেকে যেয়ারতকারীরা অনায়াসেই কিবলা নির্ধারণ করতে পারেন।

১তলার ছাদের উচ্চতা হচ্ছে ৪ মিটার এবং বেইজম্যান্টের গভীরতা হচ্ছে ৪.৫ মিটার। ছাদে উঠার জন্য ১৮টি সাধারণ সিঁড়ি এবং ৫টি চলন্ত সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে। নির্মাণ কৌশলের অংশ হিসেবে স্তম্ভগুলো ৬-৮ মিটার দূরত্বে নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদে ২৭টি প্রবেশ পথ নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি হচ্ছে প্রধান প্রবেশ পথ। মোট আভ্যন্তরীণ দরজার সংখ্যা হচ্ছে ৮২টি। বৃদ্ধি করা হয়েছে ৬৫টি।

মসজিদ থেকে বৃষ্টি ও পানি সরার জন্য সুয়েরেজ লাইন আছে। তাতে ৯ হাজার ৫শ মিটার পাইপ বসানো হয়েছে।

মসজিদে প্রয়োজনীয় ঠান্ডা পানি সরবরাহের জন্য এবং আওয়াজ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২৫ কিলোমিটার দূরে ও হারাম সীমানার বাইরে ৭০ হাজার বর্গমিটার এলাকার উপর ১৭টন হিমায়িত করণ শক্তি বিশিষ্ট বিশাল এয়ারকন্ডিশন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। তাতে ৪৫০ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট ৭টি পাম্প বসানো হয়েছে। এর উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ২০ হাজার টন। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ১৩ হাজার ৬শ গ্যালন। এটি স্থলপথে আগত হাজীদের ক্যাম্পের পার্শে বিদ্যমান যা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আকীক উপত্যকা, ২য় রিংরোড, আস্-সাইহ সড়ক ও- মানাখা হয়ে মসজিদের বেইজম্যান্টে প্রবেশ করেছে। এটি ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ, ৬ মিটার প্রশস্ত ও ৪ মিটার উঁচু সেবা সুড়ঙ্গের মাধ্যমে ৯০ সেঃ মিটার চওড়া পাইপ দ্বারা বেইজম্যান্টে এসে লেগেছে। বেইজম্যান্টের ১৪৪টি এয়ার রিফ্রেশিং ইউনিট দ্বারা তা মসজিদে সরবরাহ করা হয়। নীচতলায় ৮৪০টি টেপের মাধ্যমে এই পানি সরবরাহ করা হয় এবং তা অতি বেগুনী আলো দ্বারা বিশুদ্ধ করা হয়। মসজিদের বাইরে ঠান্ডা পানি নেয়ার জন্য ৫০টি উৎস কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। আজকাল মক্কা থেকে নিয়মিত গাড়ীতে করে যমযমের পানি এনে মসজিদে নবওয়ীতে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সরবরাহ করা হয়।

মসজিদের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটা ডিজেল শক্তি কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। মাটির নীচের বিদ্যুৎ লাইন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে, ১২ হাজার ৫শকিলোমিটার।

মুসল্লীদের অযুর জন্য ৬৮০০ কল লাগানো হয়েছে এবং ৪৫২ টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিনের খোলা আঙ্গিনা এবং

মাটির নীচে দোতলা গাড়ীর পার্ক তৈরী করা হয়েছে। পার্ক এলাকার মোট আয়তন হচ্ছে ২লাখ ৯০ হাজার বর্গমিটার। তাতে মোট ৪ হাজার ৯৬টি গাড়ী রাখা যাবে। মাটির নীচের পার্কে যাতায়াতের জন্য চলন্ত সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে। তাতে অযুর স্থান এবং টয়লেটও আছে। তাতে গাড়ীর জন্য ৪টি প্রবেশ ও ৪টি বের হওয়ার পথ আছে। পায়ে হেঁটে ঢুকা ও বের হওযার জন্য রয়েছে ২৮টি প্রবেশ পথ। মসজিদের আশ–পাশে নির্মাণ করা হয়েছে বিভিন্ন সরকারী অফিস। এছাড়াও ১৮হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে সৌন্দর্যের জন্য তৈরী হয়েছে সুন্দর পার্ক।

মসজিদের চারপাশের উন্নয়নের জন্য গঠিত হয়েছে তাইয়েবাহ পুঁজিবিনিয়োগ ও ভূমি উন্নয়ন নামক একটি বেসরকারী সংস্থা। এটি আবাসিক ভবন ও হোটেল তৈরী করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৫৬৬৭ বর্গ মিটার এলাকার উপর ১৫ তলা বিশিষ্ট বৃহদাকার ভবন তৈরীর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। উপরের ১০ তলায় ১৬টি করে ১৬০টি আবাসিক ফ্লাট তৈরী করা হবে। সংস্থা আরো ৩টি বৃহদাকার ভবন তৈরী করবে।

এক নজরে মসজিদে নবওয়ীর সংস্কারঃ

| সম্প্রসারণকারী | সন | সময়ের ব্যবধান | সম্প্রসারণের পরিমান |
|---|---|---|---|
| ১· রাসূলুল্লাহ (সা) | ৭ হিঃ | | ২৪৭৫ বর্গ মিটার |
| ২· উমার (রা) | ১৭ হিঃ | ১০ বছর | ১১০০ বর্গ মিটার |
| ৩· উসমান (রা) | ২৯–৩০ " | ১৩ " | ৪৯৬ " |
| ৪· ওয়ালিদ (উমাইয়া) | ৮৮–৯১ " | ৬৩ " | ২৩৬৯ " |
| ৫· মাহদী (আব্বাসী) | ১৬১–১৬৫ " | ৭২ " | ২৪৫০ " |
| ৬· আশরাফ কায়েতবায় (মিসর) | ৮৮৮" | ৭২৪ " | ১২০ " |
| ৭· তুর্কী সুলতান আবদুল মজীদ | ১২৬৫–১২৭৭" | ৩৮৯ " | ১২৯৩ " |
| ৮· সৌদী বাদশাহ আবদুল আযীয | ১৩৭০–১৩৭৫ " | ৯৮ " | ৬০২৪ " |
| ৯· সৌদী বাদশাহ ফয়সল বিন আঃ আযীয | ১৩৮৯ " | ৯ " | ৪০,৫৫০ " |
| ১০· সৌদী বাদশাহ খালেদ বিন আঃ আযীয | ১৩৯৭ " | ৮" | ৪৩,০০০ " |
| ১১· সৌদী বাদশাহ ফাহাদ বিন আঃ আযীয | ১৪০৬ " | ৯ " | ৮২,০০০ " |
| | | | ৬৭,০০০ " (ছাদ) |

রাসূলুল্লাহর (সা) কক্ষ সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে এক আয়াতে বলেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ ـ وَلَوْ

اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(الحجرات)

অর্থঃ 'আপনাকে যারা কক্ষসমূহের বাইর থেকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশই বুঝেনা। আপনি বেরিয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা অপেক্ষা করে, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' এখানে কক্ষ সমূহ বলতে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর বুঝানো হয়েছে। কেননা, একাধিক কক্ষ দ্বারা ঘর তৈরী হয় এবং সেগুলোতে তাঁর স্ত্রীগণ বাস করতেন।
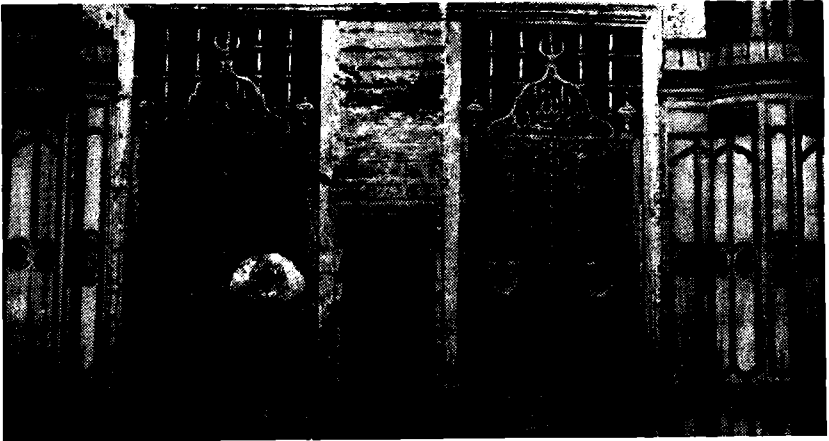
রাসূলুল্লাহর (সা) হুজরার ছবি

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

مَابَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

অর্থঃ–'আমার ঘর' ও মিম্বারের মাঝে বেহেশতের একটি বাগান রয়েছে।' মুসলমানগণ সাধারণভাবে এবং মদীনাবাসীরা বিশেষভাবে পবিত্র 'ঘর' বলতে সেই কক্ষকে বুঝে থাকেন যে কক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আয়েশাহ সিদ্দিকার সাথে বাস করেন। এর দ্বারা অন্যান্য কক্ষসমূহ বুঝায়না যদিও সেগুলো তাঁর পবিত্র ঘরেরই অংশ ছিল।

সামহুদীর মতে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে কক্ষের দৈর্ঘ হচ্ছে ৮ মিটার এবং প্রশস্ততা হচ্ছে ৫.৬ মিটার। আভ্যন্তরীণ দেয়ালের প্রশস্ততা প্রায় ১ মিটার।[৩৭]

## হুজরার সীমানা

পবিত্র হুজরাহ বা ঘর মুবারকের উত্তরে ছিল ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদের (সা) ঘর।

ইয়াহইয়া, উমার বিন আলী বিন হোসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'হযরত ফাতিমার ঘর ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) বের হওয়ার পথে। ফাতিমার ঘরে একটি ছিদ্র (ছোট জানালা) ছিল। জানালাটি হযরত আয়েশাহর (রা) কক্ষ বরাবর ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ কক্ষ থেকে বের হওয়ার সময় উক্ত জানালা দিয়ে ফাতিমার ঘরের খোঁজ-খবর নিতেন। তাবরানী আবু সা'লাবা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে নবওয়ীতে দুই রাকাত নামায পড়তেন। তারপর হযরত ফাতিমার ঘরে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতেন এবং সব শেষে তাঁর স্ত্রীদের কাছে যেতেন।[৩৮]

কক্ষের উত্তর দিকে সাথেই একটি রাস্তা ছিল। রাস্তা থেকে কক্ষে পৌছার জন্য একটি দরজাও ছিল। কক্ষের দক্ষিনে ছিল পথ এবং পথের পরেই ছিল উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসাহ বিনতে উমার বিন খাত্তাবের ঘর। অর্থাৎ হযরত হাফসা ও আয়েশার ঘরের মাঝখানে ছিল একটি পথ। দুইটি ঘর বা

---

৩৭. অফা-আল-অফা।। নূরুদ্দিন সামহুদী।

৩৮. অফা আল অফা।। নূরুদ্দীন সামহুদী

কক্ষ এত কাছে ছিল যে, কোন কোন সময় তাঁরা ঘরের ভেতর থেকেই একে অপরের সাথে কথা বলতেন। বর্তমানে হযরত হাফসার ঘরের স্থান হচ্ছে রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের ঘেরাও–এর ভেতর ও বাইরে। অর্থাৎ কবরের দক্ষিণ পার্শ্বে লোকেরা দাঁড়িয়ে যেখানে দোয়া করেন সেটিও হযরত হাফসার ঘরের স্থান। অবশ্য এখন তা মসজিদে নবওয়ীর সম্প্রসারণের ভেতর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং নামাযের সময় মুসল্লীরা তাতে জামাতে নামায আদায় করেন।

পূর্ব দিকে ছিল মোসাল্লা জানাযাহ। এই স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) জানাযার নামায পড়তেন। এটি বর্তমানে কক্ষ মুবারকের পূর্ব জানালার ভেতর অবস্থিত।

পশ্চিমে ছিল মসজিদে নবওয়ী। এতে'কাফের সময় তিনি কক্ষের পর্দা তুলে দিলে হযরত আয়েশাহ তাঁর মাথার চুল ঘরের ভেতর থেকে আঁচড়িয়ে দিতেন।

## হুজরাহ মুবারকের বর্ণনা

যেমনি করে মসজিদে নবওয়ীর দেয়াল কাঁচা ইট এবং ছাদ খেজুর গাছের কান্ড ও ডাল পাতা দিয়ে তৈরী, তেমনি করে রাসূলুল্লাহর (সা) হুজরা ঐ সকল উপাদন দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। হুজরাহ ছিল খুবই সাদা–মাটা ধরণের। ঘরের উপরে বর্ণিত সীমানার মধ্যে হযরত আয়েশাহর জন্য ঐ কক্ষটি তিনি পশমী চাদরকে আ'রআ'র (PRICKY CEDER) কাঠের সাথে বেঁধে তৈরী করেন। ছাদ ছিল নীচু। হাত দিয়েই নাগাল পাওয়া যেত। হুজরাহর দু'টো দরজা ছিল। একটি উত্তরমুখী এবং অন্যটি পশ্চিম মুখী। দরজার কোন ফ্রেম ছিলনা এবং হযরত আয়েশাহর জীবদ্দশা পর্যন্ত কোনটাতে তালাও ছিলনা। একপাট বিশিষ্ট দরজা ছিল আ'র আ'র কাঠের তৈরী। রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই হুজরাতেই বাস করেছেন। চাটাই বিছিয়ে ঘুমুতেন।

প্রথম দিকে মাত্র দুটো হুজরাহ ছিল। একটি ছিল হযরত আয়েশাহ এবং অন্যটি হযরত সাওদার। পরবর্তীতে তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীদের জন্য একটা একটা করে হুজরাহ তৈরী করা হয়। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহর (সা) এক স্ত্রীর হুজরাহ কুবা পল্লীর কাছে অবস্থিত ছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর তাঁকে তাঁর হুজরাহ তথা হযরত আয়েশাহর হুজরায় দাফন করা হয়। মাথা পশ্চিমে, পা পূর্বদিকে এবং চেহারা দক্ষিণ দিকে কিবলামুখী করে শুইয়ে দেয়া হয়। কেননা, মদীনা থেকে কিবলা হচ্ছে দক্ষিণে। তাঁর দেহ মুবারকের সাথে পূর্ব দিকের দেয়ালের দুরত্ব হচ্ছে ৯ ইঞ্চি এবং পশ্চিম দিকের দেয়ালের দূরত্ব হচ্ছে দেড় মিটার।

## হযরত আবু বকর (রা) এর কবর

রাসূলুল্লাহর (সা) হুজরায় তাঁরই পাশে শায়িত আছেন তাঁর একান্ত সাথী ও সাওর গুহার সঙ্গী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)। তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) কাঁধের পেছনে দাফন করা হয়। মাথা পশ্চিমে, পা পূর্বে ও মুখ কিবলামুখী করে তাঁকে শোয়ানো হয়। তাঁকে পবিত্র হুজরায় দাফনের অনুমতি চাওয়ার পর হযরত আয়েশা তা অনুমোদন করেন। সে ভিত্তিতে তাঁকে সেখানে দাফন করা হয়।

## হযরত উমার (রা) এর কবর

ছুরিকাহত হওয়র পর হযরত উমার ফারুক (রা) পবিত্র হুজরায় তাঁর অপর দুই সঙ্গীর সাথে দাফনের আগ্রহ প্রকাশ করে হযরত আয়েশার কাছে অনুমতি চান। হযরত আয়েশা অনুমতি দিয়ে বলেন, আমি নিজেই ঐ জায়গায় আমার কবরের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু আজ আমি হযরত উমারকে আমার উপর অগ্রাধিকার দিলাম। উমারের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকরের কাঁধের পেছনে তাঁকে দাফন করা হয়। মাথা পশ্চিমদিকে, পা পূর্বদিকে এবং মুখ কিবলামুখী করে তাঁকে কবরে শায়িত করা হয়। নাফে বিন আবি নাঈম এই বর্ণনা দিয়েছেন এবং সামহুদী বলেছেন, অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই বর্ণনাকেই গ্রহণকরেছেন।

পক্ষান্তরে, কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর সিদ্দিক থেকে বর্ণিত আছে, হযরত উমারের মাথা রাখা হয়েছে রাসূলুল্লাহর (সা) দুই পা বরাবর এবং তাঁর দুই পা রাখা হয়েছে হুজরার পূর্ব দেয়ালের দিকে।

কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বলেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দিকার কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) কবর দেখিয়ে দিন। তখন হযরত আয়েশা তাঁকে তিনটি কবর দেখান। তিনি প্রথমে রাসূলুল্লাহ, পরে তাঁর কাঁধ বরাবর হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং সবশেষে রাসূলুল্লাহর (সা) দুই পা বরাবর হযরত উমারের মাথার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

সামহুদী বলেছেন, ঐতিহাসিকরা তিনটি কবরের ব্যাপারে মোট ৭টি বর্ণনা দিয়েছেন।

নিম্নলিখিত কারণে কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবি বকরের বর্ণনা বেশী গ্রহণযোগ্যঃ

১· বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের শাসনামলে হুজরাহর দেয়াল ধসে পড়ে। মদীনার গভর্ণর উমার বিন আবদুল আযীয তা পুনঃ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। তখন তাঁরা একটি পা দেখে ঘাবড়ে যান। তাঁদের ধারণা যে, এটি রাসূলুল্লাহর (সা) পা। অনেককে জিজ্ঞাসা করার পর ওরওয়া বিন যুবায়ের জানান যে, ঐটি রাসূলুল্লাহর (সা) পা নয়, বরং তা উমার (রা) এর পা।

২· ঐতিহাসিকদের মতে, হুজরাহর পূর্বদিকের দেয়ালই ধসে পড়েছিল।

৩· যখন হযরত আয়েশা হুজরার দেয়াল নির্মাণ করেন, তখন তিনি হুজরাহকে দুইভাগে ভাগ করেন। দক্ষিণাংশে ছিল কবর এবং উত্তরাংশে ছিল তাঁর বাস করার স্থান।

৪· আমরা নাফে' বিন নাঈমের বর্ণনা গ্রহণ করলে হযরত উমার সহ কারুর পা-ই দেয়াল পুনঃ নির্মাণের সময় বেরিয়ে আসার কথা নয়। কেননা, তখন তাঁদের তিনজনের কবরই হুজরাহর ভেতর থাকার কথা এবং তা কিছুতেই পূর্ব দিকের দেয়াল পর্যন্ত যেতে পারেনা। যেহেতু দেয়াল কবর সমূহ থেকে বেশ দূরে অবস্থিত।

কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবি বকরের ২য় বর্ণনা অনুযায়ী, দেয়ালের সাথে হযরত উমারের পা দৃশ্যমান হওয়া যুক্তিসংগত। আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত অপর একটি বর্ণনাও এর সহায়ক। আবদুল্লাহর বর্ণনায় এসেছে, যখন হুজরাহর ভেতর উমারের পা সংকুলান হচ্ছিলনা, তখন দেয়ালের

ভিত্তিতে ভেতরে কিছুটা খোদাই করে কবরকে সম্প্রসারিত করা হয়।

আরেকটি সহায়ক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হুজরায় ৪র্থ আরেকটি কবরের স্থান খালি ছিল। হযরত আয়েশা সেই স্থানটি হযরত আবদুর রহমান বিন আ'ওফের কবরের জন্য প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে তিনি হযরত হাসান বিন আলীর কবরের জন্যও প্রস্তাব দেন। কিন্তু উমাইয়া শাসকরা উভয় প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করে এবং ঐ দু'জনকে সেখানে দাফন করতে নিষেধ করে। এই বর্ণনা তখনই গ্রহণ করা সম্ভব যদি কাসেম বিন মুহাম্মাদের রেওয়ায়েতকে গ্রহণ করা হয়। তাঁর বর্ণনাটিই বাস্তবধর্মী।

এখন আমরা ২ বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তিনটি কবরের ২টি অবস্থান চিত্র পেশ করলাম। দুটো চিত্রই প্রমাণ করে যে, নাফে'র বর্ণনা অনুযায়ী কবর তিনটির অবস্থান অসম্ভব।
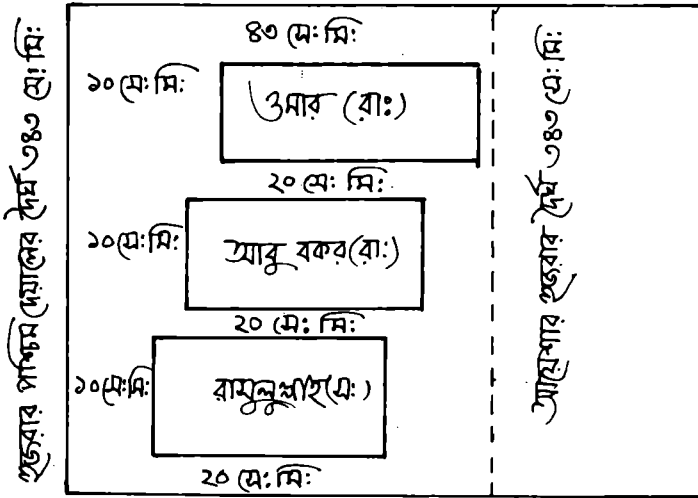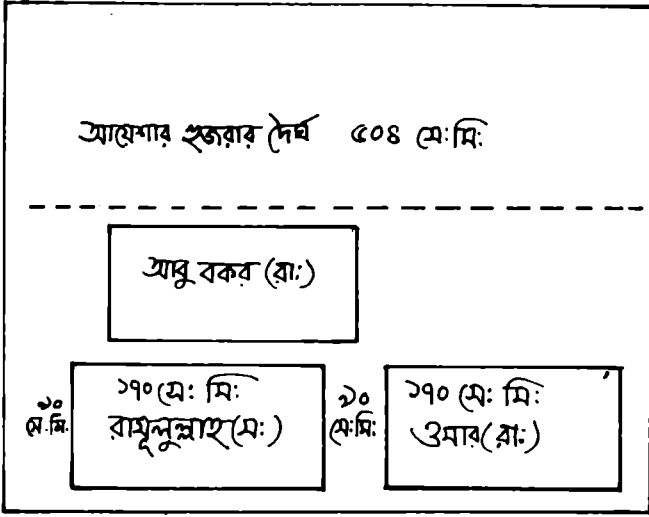
১' নাফে' বিন আবি নাঈমের বর্ণনা অনুযায়ী তিনটি কবরের অবস্থান চিত্র

২· কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবি বকরের বর্ণনা অনুযায়ী তিনটি কবরের অবস্থান চিত্র।

**নাফে'র বর্ণনা কেন অগ্রাধিকার যোগ্য নয়**

| | |
|---|---|
| o রাসূলুল্লাহর (সা) কবর ও দক্ষিণ দেয়ালের মাঝে ব্যবধান | ২০ সেঃ মিঃ |
| o রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের প্রশস্ততা | ৮০ সেঃ মিঃ |
| o রাসূলুল্লাহর (সা) কবর ও আবূ বকরের কবরের মাঝে ব্যবধান | ২০ সেঃ মিঃ |
| o আবু বকরের (রা) কবরের প্রশস্ততা | ৮০ সেঃ মিঃ |
| o আবূ বকর ও উমারের কবরের মাঝে ব্যবধান | ২০ সেঃ মিঃ |
| o উমারের কবরের প্রশস্ততা | ৮০ সেঃ মিঃ |
| মোট | ৩০০ সেঃমিঃ |

**কাসেমের বর্ণনা অগ্রাধিকারযোগ্য কেন?**

০ রাসূলুল্লাহর (সা) কবর ও পশ্চিম দেয়ালের মাঝে খালি স্থান ৯০ সেঃ মিঃ
০ রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের প্রশস্ততা ১৭০ সেঃ মিঃ
০ রাসূলুল্লাহর (সা) কবর ও উমারের কবরের মাঝে খালি স্থান ৯০ সেঃ মিঃ
০ উমারের কবরের প্রশস্ততা ১৭০ সেঃ মিঃ
মোট ৫২০ সেঃ মিঃ

এই পরিমাপের উপর ভিত্তি করে মুহাম্মাদ বিন কাসেমের বর্ণনা অগ্রাধিকারের দাবী রাখে। ফলে, পূর্ব দেয়ালে উমারের পা দৃষ্টি গোচর হওয়া এবং হুজরায় ৪র্থ কবরের স্থান খালি থাকা সম্ভব।[৩৯]

## ৪র্থ কবরের খালি স্থান

হুজরায় ৪র্থ কবরের স্থান খালি আছে। উমাইয়া শাসকদের কারণে আবদুর রহমান বিন আওফ এবং হাসান বিন আলীর দাফন সম্পর্কে হযরত আয়েশার প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি। পরে আয়েশা (রা) আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরকে অসিয়ত করেন যে, তাঁকে যেন হুজরায় দাফন করা না হয়। বরং তাঁকে যেন বাকী' গোরস্থানে তাঁর অন্যান্য সঙ্গীনীদের সাথে দাফন করা হয়।

উমার বিন আবদুল আযীযকে মদীনা সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলা হল, আপনি মদীনায় বাস করুন। তাহলে আপনার ইন্তিকালের পর আপনাকে ৪র্থ খালি কবরে দাফন করা যাবে। তিনি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেনঃ আমি নিজেকে ঐ কবরের উপযুক্ত মনে করার অপরাধে আল্লাহ আমাকে কঠিন শাস্তি দান করবেন। কিয়ামতের আগে এতে হযরত ঈসা (আ) এর কবর হবে। (মেরকাত–শরহে মেশকাত ৪র্থ খন্ড)

## হুজরার প্রথম পাকা দেয়াল

সর্বপ্রথম হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক খেজুর গাছের ডাল–পালার তৈরী কক্ষের পরিবর্তন সাধন করে তাতে দেয়াল নির্মাণ করেন। দেয়ালটি নীচু ছিল। পরবর্তীতে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের তা নির্মাণ করেন।

---

৩৯. ফুসূল মিন তারিখ–আল–মদীনা।। আলী হাফেজ।

প্রথমে কবর ৩টি মাটির সমান ছিল এবং এগুলোর উপর কিছু পাথর দিয়ে রাখা হয়েছিল। ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের নির্দেশক্রমে মদীনার গভর্ণর উমার বিন আবদুল আযীয মসজিদের নবওয়ী সম্প্রসারণের সময় হুজরায় দেয়াল নির্মাণ করেন এবং হুজরাকে মসজিদের সাথে সংযুক্ত করেন।

## হযরত আয়েশার (রা) দেয়াল

হযরত আয়েশা (রা) হুজরাকে দুই ভাগে ভাগ করে একটি দেয়াল নির্মাণ করেন। দক্ষিণাংশে কবর তিনটি এবং উত্তরাংশে তাঁর বাসস্থান ছিল। যখন মাত্র দু'টো কবর ছিল, তখন তিনি মাথায় ওড়না পরিধান না করেই হুজরায় যেতেন। কিন্তু যখন হযরত উমারকে দাফন করা হল তখন তিনি ওড়না ও পূর্ণ পর্দা সহকারে তাতে প্রবেশ করতেন। কেননা, প্রথম দু'জন তাঁর মুহরেম ছিলেন। তাই তাতে পর্দার প্রয়োজন ছিলনা। হযরত উমার মুহরেম ছিলেননা বলে তিনি পর্দাকরতেন।

বর্ণিত আছে, লোকেরা বরকতের জন্য কবরের মাটি নেয়া শুরু করে। তিনি তা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এক দেয়াল নির্মাণের আদেশ দেন এবং হুজরাকে দুইভাগে ভাগ করেন।

## কবর সংস্কার

মদীনার গভর্ণর উমার বিন আবদুল আযীয নিজেই কবর সংস্কারের উদ্যোগ নেন। তিনি নিজ দাস মোযাহেমকে তা সংস্কারের নির্দেশ দেন।

আবদুল্লাহ বিন ওকাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বৃষ্টির রাত তিনি মুগীরাহ বিন শো'বাহর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় এমন সুঘ্রান পেলেন, ইতিপূর্বে কখনও এ জাতীয় সুঘ্রান লাভ করেননি। তখন তিনি সোজা মসজিদে নবওয়ীতে যান এবং দেখতে পান যে, কবরের পূর্বাংশ ভেঙ্গে পড়ে গেছে। তিনি সালাম পেশ করে অনতিবিলম্বে বেরিয়ে যান। রাত্রেই উমার বিন আবদুল আযীয কাবাতী কাপড় দিয়ে ভগ্নাংশ ঢেকে দেয়ার নির্দেশ দেন।

পরের দিন সকালে তিনি রাজমিস্ত্রী ওয়ারদানকে ডাকেন। ওয়ারদান তাকে সাহায্যের জন্য একজন লোক চান। উমার বিন আবদুল আযীয নিজেই প্রস্তুত

হলেন। কিন্তু দেখলেন যে, কাসেম বিন মুহাম্মাদ ও সালেম বিন আবদুল্লাহও ওয়ারদানকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। উমার বিন আবদুল আযীয ঐ দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি করবে? তাঁরা বলেন, আমরা আপনার সাথে কবরে নামবো। তিনি বলেন, না আমরা এত বেশী লোক কবরে নেমে তাঁদেরকে কষ্ট দেবনা। তিনি মোযাহেমকে শুধু কবরে নেমে ওয়ারদানকে সাহায্যের নির্দেশ দেন।

ওয়ারদান দেয়ালের ভিত্তি খুঁড়ে ১টা পা দেখে পিছিয়ে আসেন। উমারও ভীত হয়ে পড়েন। তখন আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ বলেন, তোমাদের দাদা উমার বিন খাত্তাবের পা দেখে তোমরা ভয় পেয়োনা। কেননা, হুজরাহর ভেতর তাঁর পা সংকুলান না হওয়ায় দেয়ালের ভিত্তি খোদাই করে তাঁর পা দু'টো রাখা হয়। তিনি ওয়ারদানকে বলেন, পা দু'টো ঢেকে দাও। এরপর কবর সংস্কার করা হয় এবং ভাঙ্গা অংশ ঠিক করে দেয়া হয়।

## উমার বিন আবদুল আযীয কর্তৃক হুজরাহ শরীফ ও দেয়াল নির্মাণ

তিনি পবিত্র হুজরাহ শরীফ ভেঙ্গে ফেলে কাল স্ফটিক (গ্র্যানাইট) পাথর দিয়ে হুজরাহ শরীফের দেয়াল নির্মাণ করেন। কা'বা শরীফের কাল পাথরের মতই ঐ পাথরের রং ছিল কাল। রাসূলুল্লাহর (সা) সময় হুজরাহর আয়তন যা ছিল তিনি এতটুকু অংশের উপরই হুজরাহ পুনঃ নির্মাণ করেন। দেয়ালের উচ্চতা ছিল ৬·৭৫ মিটার। তারপর তিনি হুজরার চারদিকে পাথর দিয়ে আরেকটি প্রতিরক্ষা দেয়াল তৈরী করেন। বাইরের এই প্রাচীরের ছিল ৫টি কোণ। উত্তর দিকের দেয়ালকে ত্রিভুজাকৃতির করে তৈরী করেন যেন তা কা'বার মত চতুর্ভূজ আকৃতির না হয়। তাঁর নির্মিত বাইরের প্রাচীরের দৃশ্য হচ্ছে নিম্নরূপঃ

## কবরের জালি

প্রথম দিকে মুসলমানরা মাত্র ২ মিটার দূর থেকে উমার বিন আবদুল আযীযের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে বিনা আড়ালে সরাসরি দোয়া করত। কিন্তু পরবর্তীতে ১২৭২ খৃঃ মোতাবেক, ৬৬৮ হিজরী সনে মিসরের শাসক রোকনুদ্দিন জাহের বাইবারস পুরো হুজরাহ মূল্যবান কাঠের তৈরী জালি দিয়ে ঘিরে দেন। জালির ভেতর হযরত ফাতিমার ঘর এবং রাসূলুল্লাহর (সা) এর তাহাজ্জুদ নামায পড়ার স্থানটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই জালির তিনটি দরজা রাখা হয়। একটা দক্ষিণ, একটা পূর্ব ও আরেকটা পশ্চিম দিকে। জালির উচ্চতা ছিল প্রায় ১১ ফুট। এই জালি নির্মাণের পর যেয়ারতকারীরা জালির বাইরে দাঁড়িয়ে দোয়া করা শুরু করে। কেননা, জালির ভেতর দিয়ে পবিত্র কবর দেখা যায়। জালিকে কবরের জানালা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বাদশাহ জালি তৈরী করে ভাবলেন, তিনি হুজরাহ মুবারকের সম্মান বৃদ্ধির জন্যই এই কাজ করেছেন। তাই তিনি ফজীলতময় রাওদাহর যে অংশ হুজরার সাথে সংশ্লিষ্ট, সে অংশে নামায পড়া নিষিদ্ধ করেন।

১২৯৭ খৃঃ মোতাবেক, ৬৯৪ হিঃ সনে সুলতান আদেল যায়নুদ্দিন কাতবাগা উক্ত জালিকে উঁচু করে মসজিদের ছাদ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন। হিজরী ৮৮৮ সালে কাঠের পুরাতন জালি সরিয়ে তামার তৈরী জালি লাগানো হয়। পরবর্তীতে তুর্কী শাসনামলে তাও পরিবর্তন করে লোহার জালি লাগানো হয় যা বর্তমান কাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন রয়েছে।

## হুজরাহর উপর গম্বুজ নির্মাণ

৬৭৮ হিঃ মোতাবেক, ১২৮২ খৃঃ পর্যন্ত হুজরাহর উপর কোন গম্বুজ ছিলনা। হুজরার বিশেষ চিহ্ন হিসেবে মসজিদের ছাদের উপর উঁচু টাইলস বসিয়ে ১ মিটার উঁচু একটি দেয়াল নির্মাণ করা হয়। ৬৭৮ হিজরীতে সুলতান কালাউন আস্-সালেহী প্রথম হুজরাহর উপর গম্বুজ নির্মাণ করেন। এর ভিত্তি ছিল চার সমকোণ বিশিষ্ট চতুর্ভূজ এবং উপরের আকৃতি ছিল ৮ সমকোণ বিশিষ্ট অষ্টভুজ। হুজরার চারদিকের খুঁটির উপর কাঠ দিয়ে তা তৈরী করা হয়।

সুলতান নাসের হাসান বিন মুহাম্মাদ কালাউনের আমলে গুম্বুজটির সংস্কার করা হয়। তারপর ১৩৬৬ খৃঃ মোতাবেক, ৭৬৫ হিজরীতে আশরাফ শা'বান বিন হুসাইনের আমলে তা পুনরায় মেরামত করা হয়। ১৪৭৯ খৃঃ মোতাবেক, ৮৮১ হিজরীতে সুলতান কায়েতবায়ের আমলে তা পুনরায় মেরামত করা হয়।

হিজরী ৮৮৬ সনে মোতাবেক ১৪৮৬ খৃঃ মসজিদে নবওয়ীতে আগুন লাগার ফলে হুজরার জালি ও গম্বুজ জ্বলে যায়। সুলতান কায়েতবায়ের আমলে ৮৮৭ হিঃ সনে গম্বুজ মেরামত করা হয় এবং ইটের তৈরী মজবুত খুঁটির ভিত্তির উপর উক্ত গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। হুজরাহর পূর্ব দিকের দেয়াল ও খুঁটির মাঝখানের জায়গা সংকীর্ণ হয়ে আসার কারণে পূর্ব দিকের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) 'মোসাল্লা জানায়েযের দিকে প্রায় এক মিটার বাড়ানো হয়। তবে উক্ত অগ্নিকান্ডের কারণে পোড়া গম্বুজের কোন কিছু হুজরাহ শরীফের উপর পড়েনি। কেননা, সুলতান কায়েতবায় কর্তৃক হুজরাহ ও কবরের উপর নির্মিত ছোট গম্বুজের কারণে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

যাই হোক, পরবর্তীতে গম্বুজের উপরের অংশে ফাটল ধরে এবং মেরামত কাজ দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ায় সুলতান কায়েতবায় উপরের অংশ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন এবং ৮৯২ হিঃ মোতাবেক, ১৪৯০ খৃঃ সাদা চুন দিয়ে মজবুত করে গম্বুজ পুনঃনির্মাণ করেন।

হিজরী দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি তুর্কী সুলতান সুলাইমান হুজরাহ শরীফের মেঝেতে মার্বেল পাথর লাগান এবং মসজিদের ছাদ পর্যন্ত মর্মর পাথরের মজবুত খাম নির্মাণ করেন। এছাড়াও তিনি গম্বুজ এবং হুজরাহর কয়েকটি অংশে কিছু কারুকার্য করেন।

তুর্কী সুলতান মাহমুদ বিন আবদুল হামীদ উসমানীর আমলে গম্বুজের উপরের অংশে ফাটল ধরে। তিনি গম্বুজের উপরের অংশ ভেঙ্গে তা পুনরায় মেরামত করার নির্দেশ দেন। ১২৫৩ হিঃ মোতাবেক, ১৮৩৭ খৃঃ, গম্বুজটি মজবুত ভাবে তৈরী করা হয় যা আজ পর্যন্ত টিকে আছে।

### গম্বুজের সবুজ রং

১২৫৩ হিঃ মোতাবেক, ১৮৩৭ খৃঃ তুর্কী সুলতান আবদুল হামীদ উসমানী সর্বপ্রথম গম্বুজে সবুজ রং লাগানোর নির্দেশ দেন। আজ পর্যন্ত উক্ত রং বহাল আছে এবং প্রয়োজন হলে সবুজ রং দিয়ে তা বারবার মেরামত করা হয়। সবুজ রং দেয়ার পর এটাকে 'কুববাহখাদরা' বা সবুজ গম্বুজ বলা হয়। প্রথমে এর রং ছিল সাদা। তখন এটি 'কুববাহ বায়দাহ' সাদা গম্বুজ নামে পরিচিত ছিল। অন্য সময় এটা 'কুববাহ ফাইহা' ও 'কুববা যারকা' নামেও পরিচিত ছিল।

বাদশাহ আবদুল আযীয জানতে পারলেন যে, হুজরাহর ভেতর কিছু মেরামত কাজ করা জরুরী। তখন তিনি তা মেরামতের নির্দেশ দেন। দেখা গেল যে খামের রং ফেটে পড়ে যাচ্ছে। রাত্রে উক্ত সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

### একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন।[৪০]

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلّم أَنْ يُّجَصَّصَ الْقَبْرُوَانْ يُّقْعَدَ

عَلَيْهِ وَاَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ (رواه مسلم)

অর্থঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) কবর পাকা করা, কবরের উপর বসা এবং কবরের উপর কোন ঘর বা ইমারত তৈরী করা নিষেধ করেছেন।' (মুসলিম শরীফ)। এই হাদীসের আলোকে, রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের গম্বুজকে বিবেচনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ও দুই খলীফার কবরের লাশ চুরির কয়েকটি ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার পর কবরগুলোর চারদিকে মজবুত ভিত্তি তৈরী করে দেয়াল নির্মাণ করা হয়। প্রায় সাড়ে ছয় শ বছর পর্যন্ত তাতে কেউ গম্বুজ তৈরী করেননি।

কিন্তু ৬৭৮ হিঃ মোতাবেক, ১২৮২ খৃঃ সুলতান কালাউন আসসালেহী কেন এই কাজটি করলেন, তার কোন কারণ জানা যায়না।

---

৪০· রিয়াদুস সালেহীন–৪র্থ খন্ড কবর পাকা করা নিষিদ্ধ অধ্যায়।

## হারামে মাদানীর ফেকাহ্ সম্পর্কিত বিশেষ মাসআলাসমূহ

**১. শিকার করাঃ**

(ক) ইমাম শাফেঈ, মালেক ও আহমাদের মতে হারামে মাদানীতে শিকার করা ও গাছ কাটা নাজায়েয। ইমাম আবূ হানীফাহর মত এর বিপরীত।[৪১] প্রথমোক্ত দলের প্রমাণ হলঃ (ক) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 'আমি মদীনাহকে হারাম ঘোষণা করলাম, যেমন করে ইবরাহীম (আ) মক্কাহকে হারাম ঘোষণা করেছেন।' এই হাদীসটুকুই মদীনাহকে হারাম ঘোষণার জন্য যথেষ্ট।

(খ) আবূ দাউদে বর্ণিত আছে। সা'দ বিন আবি ওয়াককাস (রা) হারামে মাদানীতে শিকারকারী এক গোলামকে আটক করেন এবং তার কাপড় চোপড় ছিনিয়ে নেন। গোলামের মনিব পক্ষ এসে বিষয়টি আলোচনা করে। তখন সা'দ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনাহকে হারাম বা সম্মানিত এলাকা ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেনঃ ( مَنْ اَخَذَ اَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ) অর্থঃ 'যে হারামে মাদানীতে শিকারকারী ব্যক্তিকে আটক করে সে যেন তার সব কিছু ছিনিয়ে নেয়।' তাই রাসূলুল্লাহ (সা) যা আমার জন্য হালাল করেছেন আমি তা ফেরত দেবোনা। তবে তোমরা চাইলে এর মূল্য নিতে পার।

(গ) মোয়াত্তা ইমাম মালেকে আবূ আইউব আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি দেখলেন যে কিছু সংখ্যক বালক একটি শিয়ালকে তাড়িয়ে এক কোণে নিয়ে গেছে। তিনি তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) হারামে এরকম করা হচ্ছে?

(ঘ) তাবরানী শোরাহবিল বিন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি (মদীনার) আসওয়াফ নামক জায়গায় একটি পাখী ধরি। যায়েদ বিন সাবেত (রা) তা আমার হাত থেকে নিয়ে ছেড়ে দেন এবং বলেন, তুমি কি জাননা যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার দুই উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করেছেন? ইবনে যাবালাহ আরো বর্ণনা করেছেন, যায়েদ বিন সাবেত শোরাহবিলের পিঠে একটি থাপ্পড় লাগান ও পাখীটা ছেড়ে দেন।

---

৪১. অফা-আল-অফা প্রথম খন্ড।। নুরুদ্দীন সামহূদী,

(ঙ) উবাদাহ বিন সাবেত এবং আবদুর রহমান বিন আওফও শিকারী পাখী ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, হারামে মাদানীতে শিকার করা নিষিদ্ধ।[৪২]

**২. গাছ কাটাঃ**

আবু দাউদ শরীফে সা'দের গোলাম থেকে বর্ণিত। হযরত সা'দ মদীনার কিছু গোলামকে হারামে মদীনাহর ভেতর গাছ কাটতে দেখে তাদের সামগ্রীসমূহ আটক করেন এবং বলেন আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছিঃ

يَنْهَى اَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِالْمَدِيْنَةِ شَيْئٌ وَمَنْ قَطَعَ شَيْئاً فَلِمَنْ اَخَذَهُ سَلَبَهُ

অর্থঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার গাছ কাটা নিষিদ্ধ করেছেন। কেউ যদি গাছ কাটে, যে তাকে আটক করবে সে তার সব ছিনিয়ে নেবে।'

ইবনে যাবালাহ থেকে বর্ণিত। সা'দ বিন আবি ওয়াককাস আসিয়া সোলামিয়ার এক দাসীকে গাছ কাটতে দেখে তাকে মার দেন এবং তার একটা চাদর ও কুড়াল ছিনিয়ে নেন। পরে আসিয়া হযরত উমারের কাছে বিচার চান। উমার বলেন, হে আবু ইসহাক! চাদর ও কুড়াল ফেরত দিন। সা'দ বলেন, আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ আমাকে যে মালে গনীমতের অধিকারী করেছেন আমি তা কখনও ফেরত দেবনা। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তোমরা কাউকে মদীনাহর গাছ কাটতে দেখলে তাকে মার দেবে ও তার সব ছিনিযে নেবে।'

পক্ষান্তরে, যারা হারামে মাদানীতে শিকার ও গাছ কাটা নিষিদ্ধ মনে করেননা, তাদের বক্তব্য হল, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনাহর সৌন্দর্য রক্ষার জন্য ঐ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। কেননা, একই উদ্দেশ্যে তিনি মদীনাহর দুর্গ সমূহ ধ্বংস না করারও আদেশ দিয়েছিলেন। আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত।

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَدْمِ اٰطَامِ الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ

اِنَّهَا زِيْنَةُ الْمَدِيْنَةِ

---

৪২·অফা-আল-অফা-১ম খন্ড।। নুরুদ্দিন সামহুদী।

অর্থঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার দুর্গ সমূহ ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এগুলো মদীনাহর সৌন্দর্য।' এই মতের অনুসারীদের মতে এই নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে মাকরূহ তানযীহি। পক্ষান্তরে, প্রথমোক্ত দলের দৃষ্টিতে এই নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে মাকরূহ তাহরীমি।

তাদের ২য় প্রমাণ হল, কাদী ইয়াদ বলেছেন, মাহলাব উল্লেখ করেছেন, মসজিদে নবওয়ী নির্মাণের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার খেজুর গাছ কেটে ছিলেন।[৪৩] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য গাছ কাটা নিষিদ্ধ নয়। অর্থাৎ প্রয়োজনে গাছ কাটা যায়। তবে বিনা প্রয়োজনে এবং ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গাছ কাটা যাবেনা যাতে করে মদীনার সৌন্দর্য অবশিষ্ট থাকে।

ঘাস এই নিষেধাজ্ঞার বহির্ভুত। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

لاَ يُخْبَطُ شَجَرَةٌ اِلاَّ لِعَلَفٍ

অর্থঃ 'ঘাস ছাড়া গাছ কাটা যাবেনা।' এই হাদীস অনুযায়ী ঘাস হিসেবে গাছের পাতা ছিড়া যাবে। তবে গাছের শাখা কাটা যাবেনা।

ওষুধের উদ্দেশ্যেও গাছ কাটা যাবে। কৃষি কাজের জন্য ফসল কাটা জায়েয আছে। কেননা, রাসূলুল্লাহর (সা) আমল সহ আরো আগ থেকেই মদীনা কৃষি প্রধান এলাকা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) কৃষিক্ষেত্রে ফসল কাটতে নিষেধ করেননি।

**৩. মদীনায় কঠোর রক্তপণ কার্যকর ঃ**

কেউ যদি কাউকে ভুলে হত্যা করে তাহলে অন্যস্থানের তুলনায় এখানে রক্তপণ কঠোর হবে। মক্কায়ও অনুরূপ কঠোর রক্তপণ কার্যকর। কেননা, মদীনাহ মক্কার মতই হারাম বা সম্মানিত।[৪৪]

**৪. মদীনাহ ও মক্কায় কাফেরদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ঃ**

তবে একটু পার্থক্য হল, মক্কাতে কোন অবস্থায়ই কাফেরগণ প্রবেশ করতে পারবেনা। কেননা, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে মক্কা থেকে বের করার

---

৪৩· অফা আল অফা, ১ম খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহুদী

৪৪· অফা আল অফা, ১ম খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহুদী

কারণে আল্লাহ পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে তাদের জন্য এই শাস্তি ঘোষণা করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মান ও আল্লাহর বিশেষ হেকমতের কারণেই উক্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে কাফেরগণ মুসলিম শাসক বা তাঁর প্রতিনিধির অনুমতিক্রমে মদীনায় প্রবেশ করতে পারে। ৪৫ রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতিক্রমে অনেক মুশরিক মদীনায় প্রবেশ করেছিল। এমন কি ইহুদীরাও মদীনার বাসিন্দা ছিল।

**৫. পড়ে থাকা জিনিস ভোগ করা নাজায়েয ঃ**

মক্কার মতই মদীনায়ও পড়ে থাকা জিনিস ভোগ–ব্যবহার করার জন্য তুলে নেয়া যাবেনা। বরং মূল মালিকের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তার হেফাজত করা যাবে।

**৬. মদীনায় যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ঃ**

রাসূলুল্লাহ (সা) হারামে মক্কী সম্পর্কে বলেছেনঃ 'সেখানে লড়াইর উদ্দেশ্যে অস্ত্র বহন করা যাবেনা।' এই নির্দেশ হারামে মাদানীর জন্যও সমান ভাবে প্রযোজ্য। তবে মুসলিম খলীফার বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইর ব্যাপারে একদল উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হল, তাদেরকে সংকীর্ণ করে এনে শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের সাথে লড়াই করা যাবেনা। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জায়েয বলেছেন। কেননা, এজাতীয় লড়াই আল্লাহর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম এলাকা হচ্ছে আল্লাহর সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার উত্তম জায়গা। এছাড়াও হারাম এলাকা কোন পাপীকে আশ্রয় দেয়না।

**৭. হারামে মদীনার পাথর দিয়ে এস্তেঞ্জা করা ঃ**

হারাম এলাকার মাটি ও পাথর বাইরে নিয়ে সেগুলো দিয়ে এস্তেঞ্জা করা নাজায়েয। তবে হারাম এলাকায় পেশাব–পায়খানা করা যেমন জায়েয, তেমনি এর মাটি ও পাথর দিয়েও এস্তেঞ্জা করা জায়েয আছে। বাগাওয়ী বলেছেন, এক মত অনুযায়ী, হারামের মাটি ও পাথর দিয়ে এস্তেঞ্জা করলে গুনাহর সাথে পবিত্রতা অর্জিত হবে। ইমাম নওয়ী বলেছেন, দোমাইরী উল্লেখ করেছেন, হারামে মাদানীর মাটি বাইরে নিয়ে পানপাত্র ও হাড়ি–পাতিল তৈরী করলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবেনা।

---

৪৫. অফা আল অফা, ১ম খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহুদী

**৮. হারামে মাদানীর মাটি বাইরে নেয়া ঃ**

ইমাম নওয়ী হারামের মাটি ও পাথর হারাম সীমানার বাইরে নেয়াকে হারাম বলেছেন। আল্লামাহ আর-রাফেঈ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। ইমাম শাফেঈ তাঁর 'আল-উম্ম' কিতাবে লিখেছেন, 'হারামের মাটি বাইরে নেয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। কেননা, অন্যান্য এলাকার মাটি থেকে এর সম্মান সম্পূর্ণ আলাদা। তাই আমার মতে, এই সম্মানিত এলাকার মাটি অন্যত্র স্থানান্তর করা জায়েয নেই।'

ইমাম শাফেঈ হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা এটাকে মাকরূহ মনে করতেন। ইমাম শাফেঈ আবু ইউসূফ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইমাম আবু হানীফাহকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি জবাবে বলেন, এতে কোন ক্ষতি নেই।

তবে সোআইব এলাকার মাটি কিংবা মদীনার ঘাস বা গাছ যদি ওষুধ হিসেবে বাইরে নেয়া হয়, তাহলে তা জায়েয আছে। শুধু বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে হারাম এলাকার মাটি, পাথর বা অন্য কিছু বাইরে নেয়া জায়েয নেই। লোকেরা এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের পাশ থেকে মাটি নেয়া শুরু করায় হযরত আয়েশা তা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে দেয়াল নির্মাণের নির্দেশ দেন।

হাম্বলী মাজহাবে, হারাম এলাকার মাটি ও পাথর বাইরে নেয়া জায়েয নেই এবং বাইরের মাটি-পাথর হারাম এলাকায় মিশানো নিষিদ্ধ। ইমাম আহমদ হারাম এলাকার মাটি বাইরে নেয়াকে বেশী নিষিদ্ধ মনে করতেন। হারাম এলাকার মাটি ও পাথর বাইরে নিয়ে গেলে তা আবার ফেরত দেয়া ওয়াজিব।[৪৬]

---

৪৬· অফা আল অফা, ১ম খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহূদী

## সাকীফাহ বনি সায়েদাহ

সাকীফাহ বলতে এমন ঘরকে বুঝায় যা ইট ও পাথরের তৈরী তিন দেয়াল বিশিষ্ট এবং যাতে তাল জাতীয় গাছ বা পাতার ছাউনী রয়েছে। এ জাতীয় ঘর তৈরী করে মদীনার লোকেরা তাতে বৈঠকে মিলিত হত। দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে দেয়াল নির্মাণ করে উত্তর দিক খালি রাখা হত যাতে গরমের সময় বৈঠক খানা ঠান্ডা থাকে। বনি সায়েদাহ গোত্রের একটি সাকীফাহ ছিল।

সাকীফাহ বনি সায়েদাহ

রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তিকালের পর মদীনায় আনসার ও মুহাজিরদের প্রথম বৈঠক সাকীফাহ বনি সায়েদাহতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিংএ সমবেত মুসলমানগণ হযরত আবু বকরের হাতে খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করেন। মূলতঃ ইসলামী খেলাফতের সূচনা সেখান থেকে হওয়ার কারণে মুসলিম উম্মাহর কাছে ঐ স্থানের গুরুত্ব অনেক বেশী

ইবনে যাবালাহ (রা) সাহল বিন সা'দ বিন উবাইদাহ আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে নবওয়ীর কাছে উক্ত সাকীফাহ বনি সায়েদাহতে বসেন এবং সা'দ বিন উবাইদাহকে দধি বা ছানা পান করান। ঐতিহাসিকগণ সাকীফাহ বনি সায়েদাহর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ পোষণ করেন। ঐতিহাসিক সামহুদী বলেছেন, সাকীফাহ বনি সায়েদাহ বোদাআ' কূপের কাছে অবস্থিত। আবদুল কুদ্দুস আনসারী ও তাঁর 'আসারুল মদীনা' বইতে এই একই কথা উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক আল-মাতাবীর ও একই মত। এটি মসজিদে নবওয়ী থেকে উত্তরে ৫শ মিটার দূরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সম্প্রসারিত মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। আনসারী উল্লেখ করেছেন, ১০৩০ হিজরীতে (১৬২০ খৃঃ) আলী পাশার আমলে সেখানে বারান্দাহ বিশিষ্ট চূনা দ্বারা তৈরী একটি রুদ্ধ দ্বার ছিল। এটি বাবে শামীর কাছে সোহাইমী নামক রাস্তায় অবস্থিত। বিল্ডিং এর পার্শ্বে শেখ আনূনামীল নামক একটি ছোট গম্বুজ ছিল। এটিই সাকীফাহ বনি সায়ে'দাহ নামে পরিচিতি।[৪৭]

ঐতিহাসিকগণ যে স্থানে সাকীফাহ বনি সায়েদার কথা উল্লেখ করেছেন সেটিই সাকীফাহ বনি সায়েদাহ। যদি হুবহু তা সাকীফাহ বনি সায়েদাহ নাও হয়, তাহলে এর নিকটবর্তী কোন স্থানেই তা অবস্থিত হবে। সাকীফাহ বনি সায়েদাহ বর্তমানে মোসাল্লাস আস্-সোলতানিয়ার অন্তর্ভূক্ত এবং এটি বাবে শামীর কাছে একটি খালি বাগানের নাম যাতে বিভিন্ন ফুলগাছ সহ অন্যান্য গাছ-গাছড়া রয়েছে। মোসাল্লাস শব্দের অর্থ হচ্ছে ত্রিভূজ। স্থানটি ত্রিভূজ আকৃতির। এর আয়তন হচ্ছে ৪৯৩৮ বর্গমিটার। সাকীফাহ বনি সায়েদাহ ২টি প্রধান সড়কের মিলনস্থলে অবস্থিত। এর পশ্চিমে আল-মানাখাহ সড়ক এবং উত্তরে আস্-সোহাইমী সড়ক অবস্থিত। বর্তমানে দক্ষিণের সোলতানিয়াহ সড়কটি মসজিদ সম্প্রসারণের কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মোসাল্লাস আস-সোলাইমানিয়াহ আস্- সোহাইমী সড়কের মুখে অবস্থিত যা বাবে শামী থেকে বেশী দূরে নয়। বাবে শামী বলতে সেখানকার আবাসিক এলাকাকেবুঝায়।

---

৪৭· আসারুল মদীনাহ।। আবদুল কুদ্দুস আনসারী।

## সানিয়াতুল অদা

সানিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে পাহাড়ী পথ এবং অদা শব্দের অর্থ হচ্ছে বিদায়। এর পুরো অর্থ দাঁড়ায় 'বিদায়ের পাহাড়ী পথ।' মদীনার দু'টো স্থানের নাম সানিয়াতুল অদা। একটি হচ্ছে মক্কার উদ্দেশ্যে গমনকারী মুসাফিরদের বিদায়-স্থান। অপরটি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে গমনকারীদের বিদায় কেন্দ্র। এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার সময় সানিয়াতুল অদা'য় অস্থায়ী সেনা শিবির কায়েম করেন। সানিয়াতুল অদা' বলতে প্রধানতঃ মক্কার উদ্দেশ্যে যেয়ারতকারীদের বিদায়ক্ষেত্রকেই বুঝায়। এটি আকীক উপত্যকার সাথে অবস্থিত। এর চারদিকে জনবসতি রয়েছে। অপরদিকে, নূরুদ্দিন আলী বিন আহমাদ সামহুদী লিখেছেনঃ "সানিয়াতুল অদা' বলতে কেবলমাত্র সিরিয়ার দিকের বিদায়কেন্দ্রকেই বুঝায়। এটি জোবাব পাহাড়ের মসজিদ আর রায়াহ এবং মাশহাদে নফসে যাকিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সালা' পাহাড়ের কাছে অবস্থিত।[৪৮]

যাই হোক, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় আসার পথে এই দুই সানিয়াতুল অদা'র যে কোন একটায় মদীনার বালিকারা তাঁকে স্বাগত জানিয়ে গান গেয়েছিল।

গানের অর্থ হলঃ 'সানিয়াতুল অদা' থেকে আমাদের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। তাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পথের আহবানকারী ডাকতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শুকরিয়াহ আদায় করা কর্তব্য।'

## মানাখাহ বা সোকুল মদীনাহ

মানাখাহ বা সোকুল মদীনাহ মূলতঃ মক্কার মুহাজিরদের বাজার ছিল। আ'তা বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় একটি বাজার কায়েম করার ইচ্ছে করেন, তখন তিনি বনি কাইনুকার বাজারে যান। তারপর সোকুল মদীনায় এসে যমীনে পা দিয়ে আঘাত করে বলেন, 'এটাই তোমাদের বাজার, একে সংকীর্ণ করা যাবেনা এবং এখান থেকে খাজনা আদায় করাও চলবেনা।'[৪৯] সোকুল মদীনার বর্তমান নাম হচ্ছে মানাখাহ। এটি মসজিদে

---

৪৮. অফা-আল-অফা-১ম খন্ড।। নূরুদ্দিন সামহুদী।

৪৯. অফা আল অফা, ১ম খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহুদী

নবওয়ীর পশ্চিমে অবস্থিত। এর মূল সীমানা মসজিদে মোসল্লা থেকে শুরু করে কিল্লা বাবে শামী পর্যন্ত বিস্তৃত। যুগের পর যুগ ধরে বাজারটির বহু ভাংগা–গড়া হয়েছে। ইসলামের প্রথম বাজার হিসেবে এর মর্যাদা অনেক বেশী। বর্তমানে এখানে বানিজ্যিক ও আবাসিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

## মদীনার দেয়াল

খন্দক যুদ্ধে পরিখা খনন করার পর মদীনা শহরকে দুশমনের হাত থেকে রক্ষা করার চিন্তা–ভাবনা শুরু হয়। মসজিদে নবওয়ীর এলাকাকে ঘেরাও করে দেয়াল তৈরীর ধারণা ক্রমান্বয়ে জোরদার হতে থাকে। তাই ২৬৩ হিজরী সনে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আল–জা'দী সর্বপ্রথম মদীনার দেয়াল নির্মাণ করেন। ৩৬০ হিজরীতে আত্–তায়ে' লিল্লাহ আব্বাসীর আমলে আদদ আদ–দৌলা বিন বুইয়াহ এর সংস্কার করেন। ৫০০ হিজরীতে জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আবুল মনসুর ইসফাহানী, ৫৫৭ হিজরীতে শহীদ নুরুদ্দিন মাহমুদ বিন যংকী, ৭৫৫ হিজরীতে সালেহ বিন নাসের বিন কালাউন ও ৮৮০ হিজরীতে আশরাফ কায়েতবায় এর সংস্কার করেন। ৯৪৮ হিজরীতে সর্বশেষ সংস্কার করেন তুর্কী সুলতান সুলাইমান আল উসমানী।

তিনি সুদীর্ঘ ১০ বছরে একটি দুর্গসহ মদীনার প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এই দেয়াল নির্মাণ করেন। চুন ও পাথর দিয়ে মজবুত করে উক্ত দেয়াল তৈরী করা হয়। দেয়াল ঘেরা এই শহরটিকে সামরিক প্রতিরক্ষা দ্বীপের মত মনে হত। দেয়ালের দরজা সমূহ বন্ধ করে দিলে তা গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। এর ভেতর ছিল দুর্গ, অস্ত্রাগার, মালগুদাম ও সামরিক কেন্দ্র।[৫০] দেয়ালটির দৈর্ঘ ছিল ২৩০৪ মিটার। ১ লাখ দীনার ব্যয়ে ঐ দেয়ালটি তৈরী করা হয়। দেয়ালের মধ্যে কয়েকটি ফটক ছিল। সেগুলো হচ্ছে, বাব মিসরী, বাব শামী, বাব কুবা, বাব বসরী, বাব মজীদী, বাব জুমা ইত্যাদি।

সৌদী শাসনামলে রাস্তা প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে উক্ত দেয়াল ও দুর্গ ভেঙ্গে ফেলা হয়। এ ছাড়াও বর্তমান উন্নত সামরিক যুগে এ জাতীয় দেয়ালের তেমন কোন গুরুত্ব নেই।

---

৫০· আল মাদীনাতুল মোনাওয়ারা।। উমার ফারুক সাইয়েদ রজব

সুলতান সুলাইমানের নির্মিত দেয়ালের বাইরে পশ্চিম ও দক্ষিণে অবস্থিত বাড়ীসমূহকে দেয়াল ঘেরা করার উদ্দেশ্যে ২য় আরেকটি দেয়াল তৈরী করা হয়। দ্বিতীয় দেয়ালটি বাকী গোরস্থান থেকে দক্ষিণে কুবা, আল–আম্বারিয়া ও কিল্লা হয়ে বড় দেয়ালের সাথে গিয়ে মিশেছে। এতে ৫টি ফটক আছে। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মদীনা শহর চারদিকে দেয়াল ঘেরা ছিল। গাড়ী ও বিমান চলাচল শুরুর পর সৌদী সরকার উক্ত দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠু করার উদ্দেশ্যে প্রশস্ত রাস্তা–ঘাট তৈরী করে।

## মানাসে'

মানাসে' শব্দটি মানসা শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ হল, পায়খানা বা ময়লা নিক্ষেপের স্থান। এটি মদীনার পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এর স্ত্রীগণ সহ মহিলারা ঘরের পার্শ্বে পায়খানা নির্মাণের আগ পর্যন্ত রাত্রে এই জায়গায় পায়খানার উদ্দেশ্যে যেতেন। এটাই তখন আরব মহিলাদের সাধারণ রীতি ছিল। এই স্থানটি বাকী কবরস্থানের উত্তরে আবু আইউব কূপের পার্শ্বে অবস্থিত। উক্ত কূপের দক্ষিণ–পূর্বে বিদ্যমান উন্মুক্ত ময়দানটিই মানাসে' নামে পরিচিত ছিল। আজ কাল সেখানে বাড়ী ঘর নির্মিত হওয়ায় এর কোন চিহ্ন অবশিষ্টনেই।

## হাররাহ ওয়াকেম

'হাররাহ' ও 'লাবাহ' শব্দের অর্থ হলঃ এমন জায়গা যা পোড়া কাল পাথর দ্বারা গঠিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 'আমি মদীনার দুই লাবাহর মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করলাম।' অর্থাৎ তিনি হাররাহ ওয়াকেম ও হাররাহ ওয়াবরাহর মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করেছেন। ওয়াকেম আ'মালিক সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির নাম যিনি প্রথম যুগে মদীনায় অবতরণ করেন। তাঁর নামানুসারে এই এলাকার নামকরণ করা হয়েছে 'হাররাহ ওয়াকেম'। অন্য একমত অনুযায়ী ওয়াকেম অর্থ দুর্গ। সেখানকার এক দূর্গের নামানুসারে উক্ত এলাকার এই নামকরণ করা হয়েছে।

হাররাহ ওয়াকেম হারামে মদীনার পূর্ব সীমানা এবং তা হারাম সীমানার অন্তর্ভূক্ত। পূর্বে জনবসতির দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ এলাকা পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল। দুই জায়গায় ইহুদী ও তিন জায়গায় আউস গোত্রের আনসারগণ বাস করতেন।

যাহরা নামক জায়গায় ইহুদী বনি নাদীর এবং এর উত্তরে বনি কোরাইজাহ গোত্র বাস করত। এখন পর্যন্ত দর্শকরা উক্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রাচীন বসতির ঘর-বাড়ী ও দুর্গের চিহ্ন দেখতে পায়। এই এলাকায় প্রাকৃতিক অগ্ন্যুৎপাতের লক্ষণও বিদ্যমান আছে।

## হাররাহ ওয়াবরাহ

এটি হারামে মদীনার পশ্চিম সীমানা এবং হারামের অন্তর্ভুক্ত। মসজিদে নবওয়ী থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে ৩ মাইল। এর পশ্চিমাংশে আকীকের কিছু রাজপ্রসাদ এবং উত্তরে কিবলা তাইন মসজিদ অবস্থিত।

## আসওয়াফ

একে আসাঈফও বলা হয়। এটি বাকী কবরস্থানের উত্তরে ওহোদ গামী রাস্তায় অবস্থিত। আদ্‌দাগানী তাঁর আ'বাব বইতে একথা উল্লেখ করেছেন। তাবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আসওয়াফে অবস্থিত প্রখ্যাত সাহাবী সা'দ বিন রাবী আল্-আনসারীর বাড়ীতে গেলেন। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা) কে খেজুর গাছ দ্বারা তৈরী দেয়ালের পার্শ্বে বসার ব্যবস্থা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে বসেন এবং সেখানে কয়েকজনকে বেহেশতের সুসংবাদ দেন।

## খাখ

খাখ হামরাউল আসাদের নিকট অবস্থিত। ওয়াকেদী বলেছেন, এটি মদীনা থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে। ইবনে আবদুল বার এই মতকে সমর্থন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ৮ম হিজরীতে গোপনে মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তখন সাহাবী হাতেব বিন বালতাআ'হ মক্কার কুরাইশদের কাছে তা জানিয়ে একটি চিঠি লিখেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এই চিঠি পেয়ে কুরাইশরা মক্কায় তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও সহায়-সম্পত্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। তিনি চিঠিটা মোযাইনা গোত্রের এক মহিলার কাছে পাঠান। সেই মহিলা তা নিজ চুলের খোঁপার ভেতর লুকিয়ে মক্কা রওনা হয়। জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) কে এই খবর জানিয়ে দেয়ায় তিনি হযরত আলী, যুবায়ের এবং মিকদাদকে পাঠান এবং চিঠিটি উদ্ধার করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা মহিলাটিকে রওদাতুল খাখে পাবে। তাঁরা সেখানে গিয়ে সেই মহিলা থেকে চিঠিটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

## সানিয়া শেখান

ওহোদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) এই জায়গায় শিবির স্থাপন করেন। এখানেই লোকেরা এসে জিহাদে রিপোর্ট করে এবং এখান থেকেই যাদেরকে ফেরত পাঠানো উচিত তিনি তাদেরকে ফেরত দেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন, সেখান থেকে যাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়েছে আমি তাদের একজন।

ঐতিহাসিক মাতারীর মতে, এই স্থানটি মদীনা ও ওহোদ পাহাড়ের মাঝে রাস্তার পার্শ্বে একটি জায়গার নাম। তাঁর মতে ওহোদ দিবসে সকালে এখান থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ বাহিনী নিয়ে রওনা করেন। মক্কার কুরাইশরা আকীক উপত্যকায় অবতরণ করে। নবী (সা) শুক্রবারে মদীনায় জুমার নামায পড়েন। তারপর যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হন এবং মদীনার পূর্বাংশে অবস্থিত হাররাহ ওয়াকেমের শেখানে রাত্রি যাপন করেন। শনিবার সকালে তিনি সানিয়া শেখান থেকে ওহোদের দিকে রওনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর মোসল্লায়–সানিয়া শেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

## সোআইব

একে সোআইনও বলা হয়। এটি বাতহা উপত্যকার রাস্তায়, পূর্ব মাজেশুনিয়ার আগে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এটি বনি হারেস বিন খাযরাজ গোত্রের বাড়ীর কাছে অবস্থিত। এই উপত্যকায় একটি গর্ত আছে। সেখানকার মাটি পানিতে মিশিয়ে তা দিয়ে জ্বরের রোগীকে গোসল দিলে জ্বর ভাল হয়ে যায়। ইবরাহীম বিন আবিল জাহাম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) হারেস বিন খাযরাজের বাড়ী গিয়ে দেখলেন যে, তারা সবাই অসুস্থ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, 'আমরা জ্বরে আক্রান্ত।' তিনি আরো জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সোআইবের জ্বরের জন্য কি করেছ? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি করবো'? তখন তিনি বললেনঃ 'তোমরা এই উপত্যকার মাটি পানিতে মিশিয়ে তাতে কিছু থুথু দিয়ে নিম্নের দোয়া পড়ে রোগীকে গোসল দিলে রোগী আরোগ্য লাভ করবে। দোয়াটি হচ্ছে এইরূপঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تُرَابُ اَرْضِنَا بِرِيْقِ بَعْضِنَا شِفَاءٌ لِمَرِيْضِنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا

অর্থঃ 'আল্লাহর নামে আমাদের যমীনের মাটিতে আমাদের কারুর থুথুতে আল্লাহর হুকুমে আমাদের রোগীদের রোগমুক্তি রয়েছে।' তারা অনুরূপ করায় জ্বর সেরে গেল।

আদ্-দার্‌রাহ কিতাবে ইবনে নাজ্জার উল্লেখ করেছেন, আমি সেই গর্তটি দেখেছি এবং লোকদেরকে সেখান থেকে মাটি নিতেও দেখেছি। তারা জানিয়েছে, এর দ্বারা তাদের চিকিৎসা হচ্ছে। আমি নিজেও তা দিয়ে উপকৃত হয়েছি। আল-মাজদ বলেছেন, আমার গোলামও উক্ত মাটি দিয়ে আরোগ্য লাভ করেছে।৫১ আবুল কাসেম বলেছেন, বাতহা উপত্যকার সোআইব নামক জায়গাটি মাজেশুনিয়ার আগে অবস্থিত এবং তাতে একটি গর্ত আছে, পরবর্তীতে মাজেশুনিয়ায় একটি প্রসিদ্ধ বাগান তৈরী করা হয় যা মাদশুনিয়া নামেখ্যাত।

## মেহরাস বা মাহারীস

মোবার্‌রার বলেছেন, ওহোদ পাহাড়ের যে স্থানে পানি আছে তার নাম হচ্ছে মেহরাস বা মাহারীস। ওহোদ পাহাড়ের সর্বশেষ পাদদেশে এই স্থানটি অবস্থিত। পাহাড়ের পাদদেশে বৃষ্টির পানি এসে যে গর্তে জমা হয় এটি সেই স্থান। বর্ণিত আছে, ওহোদ যুদ্ধের দিন নবী (সা) পিপাসার্ত হলে হযরত আলী একটি পাত্রে করে সেই গর্ত থেকে পানি আনেন। পানি দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) তা পান করা অপসন্দ করেন। তখন ঐ পানি দিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা থেকে রক্ত পরিষ্কার করেন এবং মাথায় ঢালেন।

মূলতঃ ওহোদ পাহাড়ের পূর্বদিকের শেষ পাদদেশে একটি মেহরাস বা গর্ত আছে। এটি ওহোদ পাহাড়ের উপর হযরত হারুন (আ) এর নামানুসারে কোববা হারুনে নির্মিত ইমারতের পথ সংলগ্ন। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, হযরত হারুন (আ) হজ্জ শেষে ফেরার পথে ওহোদ পাহাড়ে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। সম্ভবতঃ সেখানেই 'কোববা হারুন' নির্মিত হয়েছে।

---

৫১. ওমদাতুল আখবারী ফী মাদীনাতিল মুখতার।। শেখ আহমাদ আবদুল হামীদ আব্বাসী

অপরদিকে, ২য় মেহরাসটি ওহোদের পশ্চিম দিকের ঢালুতে অবস্থিত। এতে কিছু বড় পাথর অতিক্রম করে যেতে হয়। হযরত আলী উক্ত দুই মেহরাসের কোনটি থেকে ওহোদ যুদ্ধের দিন পানি এনেছিলেন, তা জানা যায়না। তবে শীতকালে সেই গর্ত দু'টোতে মিষ্টি পানি জমে থাকে। বৃষ্টি হলে পানি বাড়ে ও পরিষ্কার হয় এবং তা পান করার উপযোগী হয়। শীত চলে গেলে কিংবা দীর্ঘদিন যাবত বৃষ্টি না হলে পানির স্বাদ, রং ও ঘ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। ওহোদের শহীদানের কবর থেকে উত্তর দিকে গেলে কিছুক্ষণ পর দু'টো সরু গিরিপথ পাওয়া যায়। একটি পূর্ব-উত্তরমুখী, এটা দিয়ে পূর্ব মেহরাসে যাওয়া যায়। ২য় গিরিপথটি পশ্চিম-উত্তরমুখী। এটা দিয়ে পশ্চিম মেহরাসে যাওয়া যায়।

## কুলসুম বিন আল হামাদ এবং সাদ বিন খাইসামার ঘর ঃ

ঘর দু'টো ঐতিহাসিক হলেও আজ আর এগুলো নিয়ে কোন আলোচনা নেই। কেউ সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারেনা, এগুলো কোথায় অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিকরা একথায় একমত, ঘর দু'টো মসজিদে কুবা সংলগ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে এসে সর্বপ্রথম ঐ ঘর দু'টোতে অবস্থান করেন। কুবার আবহাওয়া স্নিগ্ধ এবং সেখানে রয়েছে সবুজের সমারোহ। তিনি ১৪ দিন পর্যন্ত সুন্দর কুবা পল্লীর সেই ঘর দু'টোতে বাস করেন। ঘর দু'টো ৮ম ও ৯ম হিজরী শতাব্দীর ঐতিহাসিক আল-মাতারী এবং সামহুদী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) কুলসুমের ঘরে থাকতেন এবং সা' দ এর ঘরে মানুষের সাথে সাক্ষাত করতেন।

সামহুদী উল্লেখ করেছেন, ঘর দু'টো মসজিদে কুবার দক্ষিণে অবস্থিত। বিশেষ করে সা'দ বিন খাইসামার ঘরটি ছিল একেবারে মসজিদ সংলগ্ন। আগে দর্শকরা মসজিদে কুবা যেয়ারত শেষে ঘর দু'টোতেও নামায পড়ত। উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বুঝা যায়, বর্তমানে ঘর দু'টো সম্প্রসারিত কুবা মসজিদের অন্তর্ভূক্ত।

## আবু আইউব আনসারীর (রা) ঘর

হযরত আবু আইউব আনসারী খাযরাজ গোত্রের বনি নাজ্জার শাখার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বনি নাজ্জার শাখা রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মামার গোত্র। হাশেম বিন আবদে মান্নাফ বনি নাজ্জার শাখার কন্যা সালমাহ বিনতে আ'মরকে বিয়ে করেন। সালমাহ হচ্ছেন আবদুল মুত্তালিবের মা। হাশেমের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে বড় হয় ও মদীনার ছেলেদের সাথে তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় নিজেকে কোরেশী বলে গর্ব প্রকাশ করে। মক্কায় অবস্থানকারী তার চাচা মুত্তালিব এই ভাতিজা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলেন। মদীনার লোকেরা তাঁকে এই খবর জানালে তিনি মদীনা গিয়ে ভাতিজাকে নিজ

উটের পেছনে বাসিয়ে মক্কায় নিয়ে আসেন। কুরাইশরা এই দৃশ্য দেখে মন্তব্য করে, এটি 'আবদুল মুত্তালিব' বা মুত্তালিবের দাস। তাঁর আসল নাম ছিল শায়বা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আবু আইউব আনসারী রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাদার বংশধর ও আত্মীয়।[৫২]

রাসূলুল্লাহর (সা) জন্মের ৭শ বছর আগে ইয়েমেনের প্রথম তুববা' শাসক তুববান আস আ'দ বিন কাল কোকাইরাব আবু আইউব আনসারীর (রা) ঘরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সর্বশেষ ৩য় তুব্বা শাসক কারব বিন হাসসান বিন আসআদ হোমাইরীর বাপ। ইবনে ইসহাক তার মোবতাদা কিতাবে লিখেছেন, তুব্বা' তার সাথে ৪শ আলেম সহকারে মদীনা থেকে বের না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। তাঁরা বলেন, আমরা মদীনাকে আমাদের আসমানী কিতাবে শেষ নবী–আহমাদের হিজরাতের স্থান হিসেবে বর্ণিত দেখেছি। পরে তুব্বা মদীনায় বিয়ে করেন এবং সবার জন্য একটি করে ঘর তৈরী করেন। তিনি শেষ নবীর বাসস্থানের জন্যও একটি ঘর তৈরী করেন। তিনি শেষ নবীর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেন এবং অসিয়ত করে যান যেন চিঠিটি তাঁর হাতে দেয়া হয়। চিঠির ভাষা হলঃ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি যদি জীবিত থাকি, তাহলে অবশ্যই আপনার সাহায্যকারী হবো,[৫৩] আবু আইউব আনসারী (রা) বংশানুক্রমে ঐ ঘরের অধিবাসী হন এবং তাঁর কাছে চিঠিটি সংরক্ষিত ছিল। তিনি চিঠিটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে হস্তান্তর করেন এবং তাঁকে নিজঘরে বাস করার আহবান জানান। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই ঘরে ৭ মাস অবস্থান করেন।[৫৪] এই তুব্বাই সর্বপ্রথম কাবাশরীফে ইয়েমেনী গেলাফ লাগান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ তুব্বা'কে মন্দ বলোনা, সে ইসলাম কবুল করেছিল। (আহমদ) আবু আইউব আনসারীর ঘরটি মসজিদে নবওয়ীর দক্ষিণ পূর্বে এবং হুজরাহ নবওয়ীর ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। এর দক্ষিণে ছিল হযরত জাফর সাদেকের ঘর। আবু আইউবের মৃত্যুর পর তার দাস আফলাহ ঐ ঘরের মালিক হন।[৫৫] ঘরটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এক হাজার দীনার মূল্যের বিনিময়ে

---

৫২· অফা আল অফা, ১ম খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহুদী

৫৩· অফা আল অফা, ১ম খন্ড।। নুরুদ্দীন সামহুদী

৫৪· অফা আল অফা, ১ম খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহুদী

৫৫· আসারুল মাদীনাহ আল মোনাওয়ারাহ।। আবদুল কুদ্দুস আনসারী

আফলাহ তা মুগীরাহ বিন আবদুর রহমানের কাছে বিক্রি করেন। তিনি সব মেরামত করে পরে মদীনার গরীব লোকদের থাকার জন্য ওয়াকফ করে দেন। তারপর বাদশাহ শিহাবুদ্দিন গাযী এটিকে কিনে তাতে এক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের নামানুসারে এর নামকরণ করেন 'মাদ্রাসা শিহাবিয়াহ।' তারপর ১৩শ হিজরীর শেষ দিকে এটিকে মেহরাব ও গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের মত তৈরী করা হয়। এর দেয়ালে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা ছিল এটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর মেজবান আবু আইউব আনসারীর ঘর (১২৯১ হিঃ)।

ঘরটি দোতলা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) নীচ তলায় থাকতেন এবং তাঁর মেজবান আবু আইউব আনসারী স্বপরিবারে উপরের তলায় থাকতেন। তাঁর কাছে এটা খারাপ মনে হওয়ায় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে উপর তলায় এবং নিজেরা নীচ তলায় থাকার প্রস্তাব করেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, লোকের সাথে যোগাযোগের জন্য আমার নীচ তলাতেই সুবিধে, সেজন্য আমি নীচে থাকা পছন্দ করি। একরাতে উপর তলায় একটি পাত্র থেকে পানি পড়ে যায়। পানি চুইয়ে যাতে নীচে না পড়ে এবং রাসূলুল্লাহর কষ্ট না হয়, সেজন্য ঘরে মওজুদ একটি মাত্র লেপ দ্বারা স্বামী–স্ত্রী দু'জনে সেই পানি মুছে ফেলেন এবং লেপ ছাড়াই তাঁরা সেই শীতের রাত কাটিয়ে দেন। অবশেষে আবু আইউবের পীড়াপীড়িতে তিনি উপরে বাস করেন। (মুসলিম)[৫৬] বর্তমানে ঘরটি আর নেই। তা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

## হযরত আবদুল্লাহ বিন উমারের (রা) ঘর

মাতারী উল্লেখ করেছেন, মসজিদে নবওয়ীর দক্ষিণ–পূর্বে দারুল আ'শারাহ নামে পরিচিত ঘরটিই হযরত উমার ফারুক (রা) এর উত্তরসূরীদের ঘর। অফা–আল–অফা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এটিই আবদুল্লাহ বিন উমার (রা) এর ঘর যা তিনি নিজ বোন উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসা (রা) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। মসজিদে নবওয়ী সম্প্রসারণের সময় হযরত হাফসার কামরা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি এর ক্ষতি পূরণ স্বরূপ এই ঘরটি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে, সৌদী সম্প্রসারণের সময় এই ঘরটি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং সেখানে রাস্তা তৈরী করা হয়।

---

৫৬· অফা আল অফা, ১ম খন্ড।। নূরুদ্দীন সামহূদী

## হযরত উসমানের (রা) ঘর

মদীনার ইতিহাস থেকে জানা যায়, মসজিদে নবওয়ীর পূর্বে হযরত উসমান (রা) এর দু'টো ঘর একসাথে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) জীবদ্দশায় ঘর দু'টো তৈরী করা হয়। সেই যুগে, হযরত উসমানের ঘর দু'টো খুবই মজবুত ছিল। সামহুদী লিখেছেন, হযরত উসমানের হত্যাকারীরা ছোট ঘরের দেয়াল টপকিয়ে বড় ঘরে গিয়ে তাঁকে হত্যা করে। ঐ ঘরের দক্ষিণের সরু রাস্তাটির নাম হচ্ছে যোকাকে হাবশা। এটি ২ মিটার চওড়া। বড় ঘরের পূর্বে ছিল ছোট ঘরটি যা পরবর্তীতে 'রেবাতে উসমান' বা যিয়ারতকারীদের জন্য উসমান বোর্ডিং হিসেবে খ্যাত ছিল। পশ্চিমে নামাযের খালি স্থান, উত্তরে বাকী আল-গারকাদমুখী রাস্তা এবং দক্ষিনে যোকাক হাবশা অবস্থিত। পরবর্তীতে বড় ঘরটি 'রেবাতে আজম' নামে পরিচিত হয়। এর কিছু অংশ মসজিদে নবওয়ীর পূর্বে নূতন রাস্তায় পড়েছে এবং ছোট ঘরের কিছু অংশ বাবে জিবরীলের সামনে খালি জায়গায় বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমানে ঘরের কোন অংশ অবশিষ্ট নেই।

## হযরত আবু বকরের (রা) ঘর

অফা আল অফা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবুবকর (রা) কে যে ঘরটি দিয়েছিলেন, তা মসজিদে নবওয়ীর পূর্ব দিকে এবং হযরত উসমান (রা) এর ছোট ঘরের সামনে ছিল। ঐটি বাকী কবর স্থানের রাস্তার উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ পূর্ব দিকে রেবাতে উসমান, পশ্চিমে বাবুন্নিসার সামনের মাদ্রাসা, দক্ষিণে বাকী কবরস্থানমুখী রাস্তা এবং উত্তরে সীমানা জানা নেই। হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবুবকর ঐ ঘরেই ইন্তেকাল করেন। বর্তমানে ঐ ঘরের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই।

## হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের ঘর

দারে রীতার উত্তর পাশ সংলগ্ন রেবাতে খালেদ বিন ওয়ালিদ নামক ঘরটিই মূলতঃ হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের ঘর ছিল। দীর্ঘদিন যাবত তা গরীবদের বোর্ডিং হিসেবে বিদ্যমান ছিল। পরে তা মসজিদে নবওয়ীর ওয়াকফ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিজ ঘরের সংকীর্ণতার অভিযোগ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেছিলেন, ঘরটি আকাশের দিকে উঁচুকর এবং আল্লাহর কাছে এর প্রশস্ততার জন্য দোয়া কর। বর্তমানে ঐ ঘরের কোন চিহ্ন নেই।

## হযরত ফাতিমার (রা) ঘর

হযরত আলীর (রা) নামে কোন ঘরের উল্লেখ পাওয়া যায়না। তবে হযরত ফাতিমার (রা) নামে হুজরায়ে নবওয়ীর একটি অংশ নির্ধারিত ছিল। হযরত আলী এতেই বাস করতেন। এখানে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলে হাসান ও হুসাইন (রা) বাস করেন। পরে খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালেক তা মসজিদের অন্তর্ভূক্ত করে দেন।

## ওরওয়া প্রাসাদ

আকীক উপত্যকায় ওরওয়া বিন যুবায়ের বিন আওয়াম বিন খোয়াইলাদের 'কাসর' বা প্রাসাদ অবস্থিত। ওরওয়া বিন যুবায়ের সেখানে একটি কূপ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ঐগুলোই 'ওরওয়া কূপ ও প্রাসাদ' নামে পরিচিত।

## সাঈদ বিন আল—আ'স প্রাসাদ

হযরত মুয়াওয়িয়াহ (রা) এর খেলাফতের আমলে মদীনার গভর্ণর সাঈদ বিন আল–আস এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এইটি সেই যুগের সবচাইতে সুন্দর ও মজবুত প্রাসাদ ছিল। মদীনার নিকটবর্তী আকীক উপত্যকার পশ্চিমাংশকে বড় আকীক বলা হয়। এতে কাসরে ওরওয়া অবস্থিত। আকীক উপত্যকার উত্তরাংশকে ছোট আকীক বলে। কাসরে সাঈদ এই ছোট আকীকে অবস্থিত।

## কা'ব বিন আশরাফ আন্—নাবহানী দুর্গ

এই দুর্গটি মদীনার দক্ষিণ–পূর্বাংশে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ ৩৩ মিটার। প্রস্থ ৩৩ মিটার, দুর্গের ভগ্নাংশের অবশিষ্ট দেয়ালের উচ্চতা ৪ মিটার এবং দেয়ালটি ১ মিটার পুরো। পশ্চিম দিক থেকে মাত্র ১টি দরজা এবং তাতে ৮টি টাওয়ার ছিল। এটি মজবুত পাথরের তৈরী। কোন কোন পাথরের দৈর্ঘ ১৪০ সেঃমিঃ, প্রস্থ ৮০ সেঃমিঃ এবং তা ৪০ সেঃ মিঃ পুরো। সামরিক উদ্দেশ্যে তৈরী বলে তাতে কোন ডিজাইন নেই। বরং পাথরের উপর পাথর বসানো। এর মাঝখানে রয়েছে ১ হাজার বর্গমিটার বিশিষ্ট প্রশস্ত এক আঙ্গিনা। দুর্গের ভেতরের বিভিন্ন দিকে রয়েছে বিভিন্ন আকৃতির ১০টা কক্ষ।

কা'ব বিন আশরাফ ছিল চরম মুসলিম বিদ্বেষী। সে কাব্যের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং মুসলমানদের নিন্দা করত। বনি নাদীর গোত্রের মধ্যে তার

কা'ব বিন আশরাফের দুর্গ

যথেষ্ট প্রভাব ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে হত্যার আহবান জানানোর পর মুহাম্মাদ বিন মুসলিমাহ নামক সাহাবী রাত্রে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফিরে আসেন। এই দুর্গটি ইহুদী বনি নাদীর গোত্রের কাছে অবস্থিত ছিল। হিজরী ৪র্থ সালে রাসূলুল্লাহ (সা) বনি নাদীর গোত্রের শত্রুতার কারণে তাদেরকে অবরোধ করে রাখায় তারা আত্মসমর্পন করে। চুক্তির শর্ত মুতাবিক ইহুদীরা সাথে যা বহন করে নিয়ে যেতে পারে তা নিয়ে চলে যায়। এমন কি দুর্গের কাঠ ও ছাদ পর্যন্ত তারা সাথে নিয়ে যায়। তখন থেকে ঐ দুর্গটি অনাবাদ থাকে। অফা-আল-অফা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, দুর্গটি যাহরাহ পল্লীতে অবস্থিত। এটি মদীনার উঁচু অংশে মোজাইনের উপত্যকার পার্শ্বে বিদ্যমান। ঐ দুর্গে পৌছার রাস্তা হচ্ছে বাব-আল-আওয়ালী-কোরবান রোড-উম্মে আশ্‌র-উম্মে আরবা'। ঐ এলাকার একটি ক্ষুদ্র অংশে দুর্গটি অবস্থিত। দুর্গটি বর্তমানে ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে।

আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময় লোকেরা কূপ থেকেই পানি সংগ্রহ করে পান করত। রাসূলুল্লাহর (সা) যুগেও পানি সংগ্রহের একই পদ্ধতি বহাল থাকে। হযরত মুআওয়িয়াহর খেলাফতকালে মদীনায় একটু ব্যতিক্রম ঘটে। তখন 'আইনে যারকা' বা যারকা খাল প্রবাহিত করা হয়। তারপরও বহু কূপ বহাল রাখা হয় এবং সেগুলোর হেফাজত করা হয়। এখন আমরা মদীনার ৯টি ঐতিহাসিক কূপ সম্পর্কে আলোচনা করবো। যদিও মদীনায় মোট ১৯টি ঐতিহাসিক কূপ ছিল। বর্তমানে অনেকগুলোই বিলুপ্ত।

## ১. বোদাআ'হ কূপ

ইবনে শিবাহ সহল বিন সা'দ থেকে বর্ণনা করেন, 'আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ (সা) কে বোদাআ'হ কূপের পানি পান করিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) এই কূপের পানিকে লক্ষ্য করেই বলেছেনঃ 'বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত পানি পবিত্র থাকে।' কূপটি মসজিদে নবওয়ীর উত্তর দিকে 'হা' কূপের পশ্চিমে অবস্থিত। মাতারী বলেছেন, এটি শামী বাগানের কাছে অবস্থিত এবং কূপের দক্ষিণে হচ্ছে বাগানটি। এই কূপের পানি বাগানে সেচ করা হয়। আশে-পাশের কূপের পানি লোনা হওয়া সত্ত্বেও এই কূপের পানি মিষ্টি।

মসজিদে নবওয়ীর প্রধান খাদেম শুজা শাহীন আল জামালী পার্শবর্তী বাগান দু'টো সহ কূপটি কিনে এর হেফাজতের জন্য এর উপর একটি ঘর নির্মাণ করেন। তিনি পানি সেচের জন্য আরেকটি কূপ খনন করেন।

ইবন নাজ্জার বলেন, তিনি কূপটি নিজে মেপে দেখেছেন যে এর গভীরতা সাড়ে ৪ মিটার এবং কূপের ভেতর পানির স্তর প্রায় আধা মিটার।

বাবে শামীর নিকটবর্তী এক বাগানে কূপটি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সে সকল বাগান ধ্বংস করে সেখানে বিল্ডিং তৈরী করা হয়। বাগানের মাঝামাঝি স্থানেই কূপটি মওজুদ ছিল। যায়েদ বিন শিহাত সেখানে একটি বিল্ডিং তৈরী করেন এবং কূপটি সেই বিল্ডিং এর মাঝামাঝি বিদ্যমান আছে। পরে তাঁর ছেলে শরীফ দর্শকদের জন্য কূপটি দেখার ব্যবস্থা করেন। আলী

হাফেজ বলেন, আমি নিজে দেখেছি, ভেতরে একটি মজবুত কক্ষে কূপটি সংরক্ষিত আছে। আমি নিজে মেপে দেখেছি এর দৈর্ঘ সাড়ে ১০ মিটার এবং ব্যাস ৪–৫ মিটার।[৫৭] সম্প্রতি সব বাড়ী–ঘর ভেঙ্গে ফেলায় বর্তমানে কূপটির কোন অস্তিত্ব নেই। এটি মসজিদে নবওয়ী থেকে আধা কিলোমিটার দূরে বোদাআ'হ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বোদাআ'হ কূপে এসে বালতি থেকে এর পানি দিয়ে অজু করে তা পুনরায় কূপে ফেলেন। তিনি নিজেও কূপের পানি পান করেন এবং তাতে বরকতের জন্য থুথু নিক্ষেপ করেন। ঐ যুগে অসুস্থ লোকদেরকে উক্ত কূপের পানি দিয়ে গোসল করানো হত। তখন তারা যেন বন্ধনমুক্ত হয়েছেন বলে অনুভব করতেন। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেনঃ আমরা রোগীকে তিনদিন পর্যন্ত ঐ কূপের পানি দিয়ে গোসল দিতাম। এতে তারা সুস্থ হয়ে যেত।[৫৮]

## ২. 'হা' কূপ

সহীহ বোখারী শরীফের এক হাদীসে রয়েছে, যখন আল্লাহ কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থঃ 'তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করে কখনো নেক ও কল্যাণ পেতে পারনা' তখন মদীনার ধনী আনসার হযরত আবু তালহা বিন সহল (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে বলেন, মসজিদে নবওয়ীর সামনে 'হা' কূপটি আমার সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ। আমি এটাকে দান করে দিতে চাই এবং এর মাধ্যমে উল্লেখিত নেক ও কল্যাণ পেতে চাই। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এটাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) একথা শুনে বলেন, বাঃ বাঃ এটা অত্যন্ত লাভজনক সম্পদ। হে আবু তালহা! তুমি যা বলেছো তা আমি শুনেছি। আমার মতে তুমি তা তোমার আত্মীয়–স্বজনকে দিয়ে দাও। তখন আবু তালহা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি নিজ হাতে তা দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবু তালহার আত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে তা ভাগ করে দিলেন। ফলে তাঁর আত্মীয়, কারী শ্রেষ্ঠ

---

৫৭· ফুসুল মিন তারীখ–আল–মদীনাহ।। আলী হাফেজ

৫৮· ওমদাতুল আখবার ফি মদীনাতিল মোখতার।। শেখ আহমদ আবদুল হামীদ আব্বাসী।

উবাই বিন কা'ব এবং হাস্সান বিন সাবেতের ভাগে তা এসে যায়।

এই কূপে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে মাঝে মাঝে যেতেন ও পানি পান করতেন।

কূপটির নামকরণের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, 'হা' এক ব্যক্তি কিংবা গোত্রের নাম। সে অনুসারে এর 'হা' নামকরণ করা হয়েছে। এর অন্য উচ্চারণ হচ্ছে, 'বারাহা' বা 'বারুহা'। যমখশরী বলেছেন, 'বী'রে হা' আবু তালহার একটি যমীনের নাম। এটি বারাহ শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে, খোলা জায়গা।

অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানের মত এরও বহু পরিবর্তন ও ভাংগা-গড়া সাধিত হয়েছে। কূপটি এখন পর্যন্ত মওজুদ আছে এবং তাতে একটি পাম্প মেশিন লাগানো আছে। তবে পাম্প মেশিনটি অব্যবহৃত। কূপটি গোলাকার এবং এর উপর একটি বিল্ডিং ছিল। বিল্ডিং এর উত্তর পাশের জানালা দিয়ে কূপটি দেখা যেত। সম্প্রতি এই এলাকার সব বিল্ডিং ভেঙ্গে ফেলায় কূপটির আর কোন অস্তিত্ব নেই।

### ৩. বোস্সা কূপ

বাস্সা শব্দের অর্থ হচ্ছে পানি ছিটানো। এই শব্দ থেকেই কূপটির নামকরণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) শহীদ পরিবারে গিয়ে তাদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। সেই হিসেবে একদিন তিনি আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বাড়ী যান এবং জিজ্ঞেস করেন, আজ শুক্রবার, তোমাদের কাছে কি কূল (বরই) পাতা আছে? তিনি উত্তরে বলেন, জ্বি হাঁ এবং নিজে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বোস্সা কূপে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) কূপের পানি দিয়ে মাথা ধৌত করেন এবং মাথা ও চুল ধোয়া পানি কূপে ঢেলে দেন।

বর্তমানে মদীনার একটি প্রসিদ্ধ বাগানের নাম হচ্ছে বোস্সা। বাকী কবরস্থানের পশ্চিম কোণ থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে আওয়ালী হয়ে কুবা ও কোরবান এলাকায় যাওয়ার পথে উক্ত বাগানটি অবস্থিত। বাগানে পুরাতন ইটের একটি দেয়াল ও খুঁটি আছে। ঐতিহাসিক আব্বাসীও ঐ বাগানের কথা উল্লেখ করেছেন। বাগানের ভেতর দু'টো কূপ আছে। একটি বড় ও অন্যটি ছোট। বড়টি ছোটটি থেকে কেবল মাত্র ৬০ মিটার দূরে অবস্থিত। এর মধ্যে কোনটি আসল বোস্সা কূপ তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে ঐতিহাসিক ইবন নাজ্জার বলেছেন, বোস্সা কূপের গভীরতা ৪.৯ মিটার এবং ব্যাস হচ্ছে, ২.৭ মিটার। সম্ভবতঃ

বড় কূপটিই আসল বোসৃসা কূপ। কূপটি বর্তমানে বিলুপ্ত হওয়ার পথে। এর পার্শ্বে একটি গাছ বর্ধিত হওয়ায় তা কূপটির বিলোপ সাধনে আরো সাহায্য করছে। বাগানটি বর্তমানে মসজিদে নবওয়ীর ওয়াকফ বিভাগের আওতাধীন। মদীনাবাসীরা এটিকে 'বুসা' বলে। তবে ছোট কূপটি বর্তমানে চালু আছে এবং সেখান থেকে পানি উঠানো হয়।

## ৪. আরীস কূপ বা আংটি কূপ

আরিস নামক এক ইহুদীর নামানুসারে এই কূপের আরীস নামকরণ করা হয়েছে। আরিস শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃষক। এই কূপে হযরত উসমানের হাত থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) আংটি পড়ে যাওয়ায় এটিকে বি'রে খাতামও বলা হয়। খাতাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আংটি। এই নামটিই সর্বাধিক পরিচিত।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আরীস কূপের মুখে বসে কূপের ভেতর নিজ পা দু'টো ঝুলিয়ে দেন এবং হাঁটুর নীচের অংশের কাপড় খুলে ফেলেন। তখন হযরত আবু বকর আসেন এবং তাঁর ডানে বসেন ও রাসূলুল্লাহর (সা) মত নিজ পা দু'টো কূপের ভেতর ঝুলিয়ে দেন। তারপর হযরত উমার আসেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বাঁয়ে বসেন ও রাসূলুল্লাহর (সা) মত নিজ পা দু'টো কূপের ভেতর ঝুলিয়ে দেন। তারপর হযরত উসমান (রা) আসেন। তিনি কূপের মুখে জায়গা না থাকায় তিনজনের দিকে মুখ করে কূপের এক পার্শ্বে বসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তিনজনকে বেহেশতের সুসংবাদ দেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে যে আংটি ব্যবহার করতেন, তা পরবর্তীতে হযরত আবু বকর, উমার ও উসমান (রা) ব্যবহার করেন। হযরত উসমানের খেলাফতের ৬ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন তিনি আরীস কূপের মুখে বসেন। তিনি আংটিটি নাড়াচাড়া করার সময় তা কূপে পড়ে যায়। তিন দিন পর্যন্ত তিনি কূপে আংটি তালাশ করে শেষ পর্যন্ত তা না পেয়ে দুঃখ পান।

কূপটি মসজিদে কুবার প্রধান দরজা থেকে ৪২ মিটার দূরে অবস্থিত। কবে কূপটি খনন করা হয়েছে তার সঠিক তারিখ জানা যায়না। তবে তা রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতের আগে খনন করা হয়েছে। কাল পাথর দিয়ে কূপটি নির্মাণ করা হয়েছে।

ইবন নাজ্জার বলেন, কূপটি ৬·৩ মিটার গভীর, ২·২ মিটার চওড়া এবং তাতে পানির স্তর হচ্ছে ১·৩ মিটার। বৃষ্টিপাতের ফলে পানির স্তর উঠানামা করে। ১৩১৭ খৃঃ (৭১৪ হিঃ) কূপের তলদেশে নামার জন্য একটি সিঁড়ি তৈরী করা হয়। কেউ বলেছেন, শেখ সাইফুদ্দিন বিন আবু বকর বিন আহমদ আস–সালামী তা নির্মাণ করেন। আবার অন্যদের মতে, নাজমুদ্দীন ইউসুফ আর রুমী (শাহজাদা তোফায়েলের প্রধানমন্ত্রী) তা নির্মাণ করেন। তুরস্কের উসমানী শাসনামলে এর উপর জিপসাম দিয়ে একটি গম্বুজ এবং এর দক্ষিণে নিকটে আরেকটি গম্বুজ তৈরী করা হয়।

১৯৬৪ সালে (১৩৮৪ হিঃ মদীনা পৌরসভা গম্বুজ দু'টো ভেঙ্গে ফেলে এবং কূপটি মাটি দিয়ে ভরাট করে দেয়। তারপর কুবা মসজিদকে নূতনভাবে বর্গাকৃতি করে তৈরী করে। ফলে,আজ আর ঐ কূপের অস্তিত্ব নেই।

## ৫. আল–গারস কূপ

ইবনে মাজাহ হযরত আলী (রা) থেকে সহীহ সনদসূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি মারা গেলে আমার কূপ (গারস) থেকে ৭মশক পানি দিয়ে আমাকে গোসল দেবে। হযরত আলী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আল–গারস কূপের পানি পান করতেন। ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাতে সহীহ সনদসূত্রে আবু জাফর আল বাকের মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হোসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কে ইন্তিকালের পর কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে জামা পরিহিত অবস্থায় তিনবার গোসল দেয়া হয়েছে। তাঁকে যে কূপের পানি দিয়ে গোসল দেয়া হয়েছে সেটার নাম আল–গারস এবং তা ছিল কুবায় সা'দ বিন খাইসামারকূপ।

কূপটি মসজিদে কুবার উত্তরে আধা মাইল দূরে অবস্থিত। এর চারদিকে রয়েছে খেজুর বাগান। কূপটি ১১ মিটার গভীর এবং ৩·৩ মিটার চওড়া। কূপের পানি মিষ্ট। ৩৭ হাজার বর্গ মিটার এলাকায় পাম্প মেশিনের সাহায্যে এর পানি দিয়ে কৃষি কাজ করা হয়।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ কূপের পানি দিয়ে অজু করে বালতির অবশিষ্ট পানি কূপে ঢেলে দেন। তারপর থেকে কূপটি আর কোনদিনশুকায়নি।[৫৯]

## ৬. আস্ সোকিয়া কূপ

আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য আস সোকিয়া কূপের মিষ্টি পানি আনা হত এবং তিনি তা পান করতেন। ওয়াকেদী আবু রাফে এর স্ত্রী সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত আবু আইউব আনসারীর ঘরে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে আস্-সোকিয়া কূপের পানি পান করানো হত। রাসূলুল্লাহ (সা) এর কৃষ্ণকায় গোলাম রেবাহ তাঁর জন্য কোন সময় আস্-সোকিয়া কূপের পানি এবং কোন সময় গারস কূপের পানি নিয়ে আসত। ঐতিহাসিক আল-মাতারী বলেছেন, কূপটি আল-নাক্কার সর্বশেষ প্রান্তে এবং যুল-হোলায়ফায় অবস্থিত বীরে আলীর পূর্বদিকে। আল-আম্বারিয়া ময়দান থেকে তা মাত্র ১০০ মিটার দূরে। কূপটি যে জায়গায় অবস্থিত তার নাম হচ্ছে ফালজান। কূপের মালিক ছিল যাকওয়ান বিন কায়েস আয্-যারকী। পরে ২টা উটের বিনিময়ে তা হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াককাস কিনে নেন।

আম্বারিয়া ময়দান থেকে ওরওয়া পর্যন্ত ৪০ মিটার প্রশস্ত আম্বারিয়া সড়ক নির্মাণের সময় কূপটি ভরাট করে ফেলা হয়।

মসজিদে নবওয়ী থেকে কূপে যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে মানাখা সড়ক-আম্বারিয়া সড়ক-আম্বারিয়া ময়দান। তারপরই হচ্ছে আস-সোকিয়া কূপ।

## ৭. রুমাহ কূপ

এর অপর নাম হচ্ছে উসমান কূপ। রুমাহ কূপের মালিক ছিল একজন ইহুদী। সে মুসলমানদের কাছে এই কূপের পানি বিক্রী করত। হযরত উসমান তা কিনে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আবু আবদুল্লাহ বিন মুনজের বলেছেন, ঐ কূপের মালিক রুমাতুল গেফারী প্রতি মশক পানি এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রী করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলতেন, এই কূপের বিনিময়ে বেহেশতে অনুরূপ একটি কূপ পাওয়া যাবে। তিনি তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কে বললেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আয়ের আর কোন উৎস নেই, তাই আমি তা দান করতে পারছিনা। হযরত উসমান (রা) ঐ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাঁকে এর বিনিময়ে

---

৫৯· ওমদাতুল আখবার ফি মাদীনাতিল মোখতার।। শেখ আবদুল হামীদ আব্বাসী।

বেহেশতে যে ধরণের কূপের সুসংবাদ দিয়েছেন, আমি কিনে তা দান করে দিলে আমাকেও অনুরূপ সুসংবাদ দেবেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) 'হাঁ' বলেন। তখন হযরত উসমান (রা) ৩৫ হাজার দিরহাম দিয়ে তা কিনে মুসলমানদের জন্য দান করে দেন। বুখারী শরীফে হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে রূমাহ কূপটি খনন করবে তার জন্য রয়েছে বেহেশত।

সামহুদী বলেছেন, এই কূপটি আকীক উপত্যকার মাঝখানে অবস্থিত এবং তা মসজিদে কিবলাতাইনের ১ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। ইবন নাজ্জার বলেছেন, কূপটি ৮ মিটার গভীর এবং ৩৬ মিটার চওড়া। এটি বর্তমানে পানি শূণ্য কিংবা তাতে সামান্য পানি আছে। এটি এখন এক বাগানের মাঝামাঝি বিদ্যমান। বাগানটি বর্তমানে মসজিদে নবওয়ীর ওয়াকফ বিভাগের অধীন এবং ওয়াকফ বিভাগ তা কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছে লীজ দিয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় এটাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষামূলকভাবে একটি কৃষি কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কূপের পানি মিষ্ট। কূপে যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে, মসজিদে নবওয়ীর কাছ থেকে মানাখা সড়ক দিয়ে উত্তর দিকে সুলতানা সড়কে যেতে হবে। সুলতানা সড়কটিই বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সড়ক। সে পথ ধরে এগুলে হাতের ডানে একটি কাল পাহাড় পড়ে। সেখান থেকে ডানে মোড় নিয়ে পাহাড়ের পাশ দিয়ে পশ্চিমমুখী রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে রূমাহ কূপ পড়বে।

## ৮. এহন বা ইয়াসীরাহ কূপ

রাসূলুল্লাহ (সা) এই কূপে গিয়ে এর পানি দিয়ে অজু করেছেন এবং বরকতের জন্য তাতে থুথু নিক্ষেপ করেছেন। এর নাম ছিল আ'সেরাহ (কঠিন)। তিনি এর নামকরণ করেন ইয়াসীরাহ (সহজ)। মাতারী বলেছেন, এটি আ'ওয়ালী এলাকায় অবস্থিত এবং তা পাহাড় খোদাই করে তৈরী করা হয়েছে। আসলে এটি পাথর খোদাই করে তৈরী করা হয়েছে, পাহাড় নয়। কূপটির গভীরতা হচ্ছে ১৬·৫ মিটার এবং প্রশস্ততা হচ্ছে ৩৬ মিটার। এটি কাল পাথরের তৈরী। এটি আজকাল অব্যবহৃত। বর্তমানে নাকীরা নামক অন্য আরেকটি কূপ থেকে এহন কূপ সংলগ্ন বাগানে পানি সেচ করা হয়। এহন কূপের পানি মিষ্ট।

কূপে পৌছার রাস্তা হচ্ছে মানাখা সড়ক দিয়ে মাদরাজ ওভারব্রীজ কিংবা হোস মানসুর ওভারব্রীজ পেরিয়ে কুবামুখী সড়ক দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

বাঁয়ের গলিতে ন্যাশনাল ব্যাংক কমপ্লেক্সের পাশ দিয়ে আজকাল লোকেরা বাতহা উপত্যকায় যাওয়া-আসা করে। বাতহা উপত্যকা দিয়ে দক্ষিণ দিকে গেলে কোরবান এলাকায় পৌঁছা যাবে।সেখান থেকে পূর্ব দিকে গেলে বামদিকে থাকবে নোওয়াইমা এবং আল-এহ্‌ন এবং ডানে থাকবে হারামিয়াহ। তারপর আসবে আল-বেলাদ আল-এহ্‌ন এবং কূপ।

## ৯. জারওয়ান কূপ

লবীদ বিন আ'সাম ইহুদী এই কূপেই চিরুনী ও মোমের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে যাদু করেছিল। কূপটির মালিক ছিল বনি যোরাইক আনসার গোত্র। কূপের কোন দোষ নয়, বরং দোষ ছিল যাদুকরের। যাদুর মাধ্যমে লবীদ বনি যোরাইক গোত্রেরও ক্ষতি সাধন করে। যাদুর পর তারা ঐ কূপটি অকেজো করে দেয়। তারপর তার মধ্যে ও আশ-পাশে ময়লা-আবর্জনা ফেলে তা ভরাট করে দেয়া হয়। কূপটি জারওয়ান মহল্লায় অবস্থিত ছিল। মাতারীর মতে কূপটি মদীনার প্রাচীরের ভেতর ছিল। জারওয়ান হচ্ছে বাব-আল আ'ওয়ালী সংলগ্ন মহল্লা নাখাওয়ালার সামনের মহল্লার নাম।

নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক কূপগুলো সম্পর্কে বর্তমানে তেমন কিছু জানা যায়না। ১· আহাব কূপ, ২· আনা কূপ, ৩· জাশাম কূপ, ৪· জামাল কূপ, ৫· খারেজা কূপ, ৬· খাতমা কূপ, ৭· আবু আম্বা কূপ, ৮· কারাসাহ কূপ, ৯· জাসুম কূপ ও ১০· হালওয়া কূপ।

মদীনার উপত্যকাগুলোর মধ্যে তিনটা হচ্ছে প্রধান। ১· আকীক, ২· যোগাবাহ ও ৩· কানাহ। যোগাবাহ উত্তর-পশ্চিমের নিম্নভূমিতে অবস্থিত। অন্যান্য উপত্যকাগুলো এর সামনে গিয়ে মিশেছে। ফলে বৃষ্টি ও বন্যার পানি এর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

## আ'কীক উপত্যকা

এক সময়ে আ'কীক ছিল চিত্ত বিনোদন, মুক্ত বাতাস গ্রহণ ও মিষ্ট পানি সংগ্রহের জন্য প্রশস্ত উপত্যকা। তাই প্রথম দিকে তাতে বহু প্রাসাদ নির্মিত হয় ও মানুষের চিত্তবিনোদনের খোরাক জোগায়। কিন্তু আজকাল তাতে বসতি স্থাপিত হওয়ায় তা এখন পুরো আবাসিক এলাকায় রূপান্তরিত হয়েছে। আ'কীক শব্দের অর্থ হল পানি প্রবাহের স্থান যা বন্যার কারণে গভীর ও প্রশস্ত আকার ধারণ করে। আ'কীক উপত্যকার অবস্থাও তাই। মদীনার পূর্বদিকের উঁচু পাহাড়ী এলাকার পানি এই উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমাঞ্চলের নীচু ভূমিতে অবস্থিত যোগাবাহ উপত্যকায় গিয়ে পড়ে। আজকাল আ'কীক উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কৃষি কাজের জন্য পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে মদীনার উত্তর-পশ্চিমের অধিকাংশ বসতি আ'কীক উপত্যকার মধ্যেই অবস্থিত।

নবুওয়াতের প্রথম যুগে মদীনাবাসীরা আ'কীক উপত্যকার কূপ ও ডোবা থেকে পানি সংগ্রহ করত। তখন এটিই ছিল মদীনায় পানি সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। হিজরাতের পর এবং তুর্কী শাসনের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ব্যাপী তাতে বসতি ছিল। কিন্তু তুর্কী শাসনামলে আকীকের কৃষি খামার ও গ্রাম সমূহ থেকে বসতি সরে যায় এবং পানির উৎসসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। তখন কেবল শহরের দেয়াল ঘেরা অংশের মধ্যেই মানুষ বাস করতে থাকে। সাম্প্রতিকালে মদীনা আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে উঠার সাথে সাথে আকীক উপত্যকায়ও বসতি সম্প্রসারিত হয়।

আকীক উপত্যকা মদীনার পশ্চিমে অবস্থিত। মক্কা-মদীনা সড়ক এর উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। বাবুল আম্বারিয়া থেকে মাদরাজ হয়ে আ'কীকে যাওয়া

যায়। এছাড়াও আ'কীকের সাথে সংযোগ সৃষ্টিকারী অন্যান্য সড়কও রয়েছে।

আকীক উপত্যকা দুইভাগে বিভক্ত। ছোট আকীক ও বড় আকীক। ছোট আকীককে 'আকীকে মদীনা' বলা হয়। আকীকে মদীনাতেই রুমাহ কূপ অবস্থিত এবং তা যুলহোলায়ফার সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। যুলহোলায়ফা থেকে নাকী পর্যন্ত এলাকাকে বড় আকীক বলা হয়। এই বড় আকীকেই ওরওয়াহ কূপ অবস্থিত। মূলতঃ আকীক উপত্যকার পূর্ব সীমানা হচ্ছে যুল হোলায়ফার কাছে হাররাতুল ওয়াবরাহ এবং পশ্চিম সীমানা হচ্ছে যোগাবাহ উপত্যকা।

পূর্বে এতে বেশকিছু লোকের প্রাসাদ ছিল। এর মধ্যে মারওয়ান বিন হাকাম, সাঈদ বিন আল-আস এবং হযরত উসমান (রা) এর বংশধরের অনেকের প্রাসাদই উল্লেখযোগ্য। এই উপত্যকায় হযরত আবু হুরাইরা, ওরওয়াহ বিন যুবায়ের, মারওয়ান বিন হাকাম, সাঈদ বিন আল-আ'স এর বাগান ও কৃষি খামার ছিল। ইবনে যাবালাহ বর্ণনা করেছেন যে, এতে রাসূলুল্লাহ (সা) এরও একটি কৃষি খামার ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বেলাল বিন হারেস আল-মোযানীকে পুরো আকীক উপত্যকা দান করে দিয়ে বলেন, বেলাল এর চাষযোগ্য এলাকায় চাষ করবে। বেলাল তা চাষ না করায় হযরত উমার ফারুক (রা) নিজ খেলাফত আমলে এর একটি অংশ বেলালের জন্য রেখে বাকী অংশ অন্যান্য লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত উমারের মতে বেলাল তাতে চাষ না করায় এর উপর থেকে তার মালিকানা শেষ হয়ে গেছে। ২য়তঃ মদীনা মুসলিম বিশ্বের রাজধানী হিসেবে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তা লোকজনের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়।

## আ'কীক উপত্যকার ফজীলত

হযরত আ'মের বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আকীকের উদ্দেশ্যে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং পরে ফিরে এসে হযরত আয়েশা (রা) কে বলেনঃ আমি আকীক থেকে ফিরে আসলাম। সেটি কতইনা উত্তম জায়গা এবং এর পানি কতইনা মিষ্ট। তখন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সেখানে বসবাস করবেন? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন, তা কি করে হয়? লোকেরা সেখানে ঘর-বাড়ী তৈরী করেছে।

যাকারিয়া বিন ইবরাহীম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, দু'ব্যক্তি আকীক উপত্যকায় রাত্রি যাপন করে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোথায় রাত্রি যাপন করেছ? তারা বলল, 'আকীকে'। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা এক মুবারক উপত্যকায় রাত্রি যাপন করেছ।

বুখারী শরীফে এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'এই রাতে আমার কাছে একজন আগমনকারী এসে বলল, 'এই মুবারক উপত্যকায় আপনি নামায পড়ুন।' হাদীসে পবিত্র উপত্যকা বলতে আকীক উপত্যকাকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত উমার ফারুক (রা) বলেছেন, এই উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর নামাযের স্থানটিকে পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রাখ।[৬০]

## বাতহা উপত্যাকা

মসজিদে মোসাল্লাহর পশ্চিম থেকে আল-হাররাহ আল-গারবিয়াহ পর্যন্ত এলাকাকে বাতহা উপত্যকা বলে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে; রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বাতহা উপত্যকা বেহেশতের একটি সোপানের উপর অবস্থিত। সাইয়েদ বলেছেন, মদীনার মাটি কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা মর্মে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী মানুষ বাতহা উপত্যকার বালুর স্তুপ থেকে বালু আনার জন্য সেখানে যেত ও বালু এনে তা ব্যবহার করত।

## কানাহ উপত্যকা

কানাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে খাল যা দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। এটি মদীনা শহর ও ওহোদ পাহাড়ের মাঝামাঝি অবস্থিত। এই উপত্যকাটিকে কানাহ নামকরণের কারণ হল, একবার ইয়েমেনের শাসক তুব্বা' এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, এটি যমীনের কানাহ বা খাল। সেখান থেকেই এর কানাহ নামকরণ করা হয়। ইবনে শোববাহ বলেন, কানাহ উপত্যকা তায়েফের উজ্জ উপত্যকার সাথে সংযুক্ত। ওহোদের শহীদানের কবরের উপর দিয়ে কানাহ উপত্যকার পানি প্রবাহিত হয়।

ইমাম মালেক তাঁর মোয়াত্তা গ্রন্থে লিখেছেন, সাহাবী উমার বিন আল-জামুহ এবং আবদুল্লাহ বিন উমার বিন হারাম (রা) উভয়েই ওহোদ যুদ্ধের

---

৬০. আছারুল মদীনা আল-মোনাওয়ারাহ।। আবদুল কুদ্দুস আনসারী

শহীদ এবং তাঁদেরকে সেখানে একই কবরে দাফন করা হয়। তাঁদের কবরের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়ার কারণে তাঁদের কবর স্থানান্তরের সময় দেখা যায় যে, তাদের লাশ সম্পূর্ণ অবিকৃত এবং মনে হল যেন মাত্র গতকাল দাফন করা হয়েছে। তাদের একজন আহত ছিলেন। তাঁর হাত জখমের স্থানে ছিল। এমতাবস্থায়ই তাঁকে দাফন করা হয়। কবর খোঁড়ার পর জখমের স্থান থেকে হাত সরানোর পর তা পুনরায় জখমের স্থানে এসে লেগে যায়। ওহোদ যুদ্ধের ৪৬ বছর পর ঐ ঘটনা ঘটে।[৬১]

সাহাবী আবদুল্লাহও আহত হন এবং পরে শহীদ হন। ক্ষত স্থানের উপর তাঁর হাত লেগে ছিল। কবর খোঁড়ার পর হাত সরালে জখমের স্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু পুনরায় হাত জখমের স্থানে রাখায় রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।[৬২]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর বাপ আবদুল্লাহর কবরে অন্য আরেকজনকে দাফন করায় তিনি তা অপসন্দ করেন। ৬ মাস পর তিনি তাঁকে পৃথক কবরে রাখার জন্য কবর খুঁড়ে বের করে দেখেন যে, তিনি দাফনের প্রথম দিনের মতই সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আছেন।

এই উপত্যকার উপর দিয়ে বিভিন্ন সময় বন্যা প্রবাহিত হয়। ওহোদের শহীদানকে বুকে ধারণ করে রাখায় এই উপত্যকার মর্যাদা অনেক বেশী।

---

৬১· ওমদাতুল আখবার ফি মদীনাতিল মোখতার– শেখ আহমদ আবদুল হামীদ আব্বাসী।

৬২· ওমদাতুল আখবার ফি মাদীনাতিল মুখপর।। শেখ আহমদ আবদুল হামীদ আব্বাসী

## ওহোদ পাহাড়

ওহোদ পাহাড় মদীনার উত্তরে সাড়ে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং মরুদ্যানের স্তর থেকে ৩৫০ মিটার উঁচু। পাহাড়টি কঠোর পাথরে তৈরী। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর দৈর্ঘ হচ্ছে ৯ কিলোমিটার এবং প্রশস্ততা হচ্ছে ১শ থেকে ৩শ মিটার। এর চারদিকে রয়েছে নোমান, কানাহ এবং হামদ নামক প্রবহমান উপত্যকা। 'ওহোদ' শব্দের অর্থ হল এক বা একক। সোহাইলীর মতে, এটি অন্যান্য পাহাড় থেকে স্বতন্ত্র ও একক বলে এর ওহোদ নামকরণ করা হয়েছে। এতে অনেক চূড়া আছে। উঁচু চূড়ার কারণে দর্শকেরা তাতে একাধিক বড় ও ছোট পাহাড় আছে বলে ভুল করতে পারে। অথচ এগুলো সবই ওহোদ পাহাড়ের অবিচ্ছিন্ন অংশ এবং পরস্পর সংযুক্ত। এই পাহাড়ে বিভিন্ন রকম মূল্যবান পাথর পাওয়া গেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পাহাড়টি মূল্যবান পাথরে সমৃদ্ধ। পাহাড়ের পূর্বের সীমানা বিমান বন্দর রোড এবং পশ্চিম সীমানা আল-উ'য়ুন গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত।
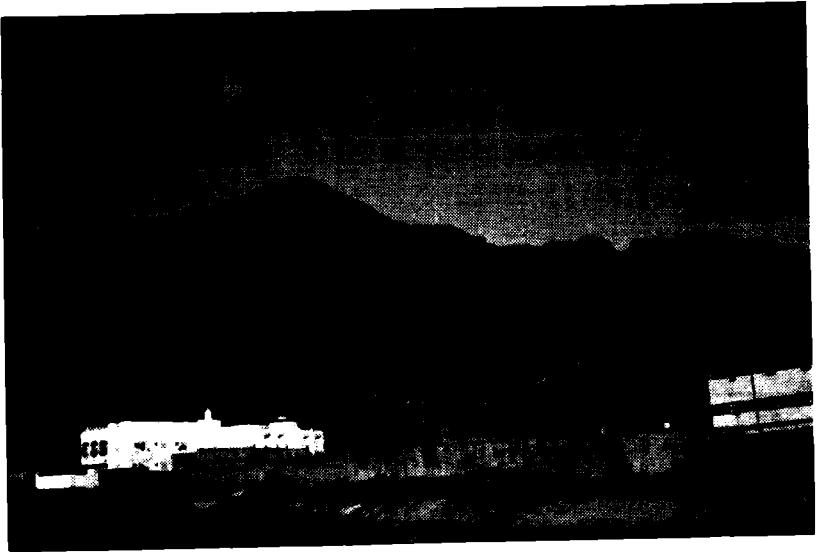
ওহোদ পাহাড়

ঐতিহাসিক মাতারী লিখেছেন, ওহোদের যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) ওহোদ পাহাড়ে জোহর ও আসরের নামায পড়েন। পাহাড়ের উত্তরাংশে একটি গর্ত আছে। কথিত আছে, ওহোদ যুদ্ধের দিন এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে আশ্রয়নিয়েছিলেন।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বকর, উমার এবং উসমান (রা) সহ ওহোদ পাহাড়ে উঠেন। তখন পাহাড়টি কেঁপে উঠে। রাসূলুল্লাহ (সা) পাহাড়টিকে লক্ষ্য করে বলেন, হে পাহাড়, স্থির হও, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ আছেন।[৬৩]

অন্য আরেক হাদীসে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 'ওহোদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও ওহোদ পাহাড়কে ভালবাসি।[৬৪] ইবনে মাজার এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 'ওহোদ পাহাড় বেহেশতের একটি সিঁড়ি এবং আ'ইর পাহাড় হচ্ছে দোযখের সিঁড়ি।' তাবরানী একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ওহোদকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'এই পাহাড়টি আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও একে ভালবাসি এবং এটি বেহেশতের একটি দরজা। আর ঐটি হচ্ছে আ'ইর পাহাড়, যা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট, আমরাও এর উপর অসন্তুষ্ট এবং এটি দোযখের একটি দরজা।'

ওহোদের শহীদানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'তোমাদের যে ভাইয়েরা ওহোদে মারা গেছেন, আল্লাহ তাদের আত্মাকে সবুজ পাখীর ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। তারা বেহেশতের নদীতে অবতরণ করে, সেখানকার ফল-মূল খায় এবং পরে আরশের ছায়ায় সোনালী প্যান্ডেলে অবস্থান করে। তারা যখন উত্তম খাবার, পানীয় ও সংলাপ দ্বারা তৃপ্ত হয়, তখন আফসুস করে বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কি করেন তা যদি আমাদের ভাইয়েরা জানত! তারপর ওহোদের শহীদানের ব্যাপারে আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেনঃ

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

---

৬৩. ওমদাতুল আখবার ফি মদীনাতিল মোখতার-শেখ আহমদ আবদুল হামদী আব্বাসী।

৬৪. ওমদাতুল আখবার ফি মদীনাতিল মোখতার।। শেখ আহমদ আবদুল হামীদ আব্বাসী।

অর্থঃ 'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলনা। তারা জীবিত এবং আল্লাহর কাছ থেকে তারা রিযকপ্রাপ্ত।' কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত বদর যুদ্ধ এবং অন্যদের মতে, এটি বীরে মাউ'নার শহীদানের উদ্দেশ্যে নাযিলহয়েছে।

## জাবালে আইনাইন বা আর্ রুমাহ পাহাড়

এটি হচ্ছে, ওহোদ পাহাড়ের ১·৫ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি ছোট পাহাড়ের নাম। পাহাড়টি হযরত হামযাহ সহ শহীদানে ওহোদের কবরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। কানাহ উপত্যকা এই পাহাড় এবং শহীদানের কবরস্থানের মাঝে বিদ্যমান। কবরস্থান থেকে পাহাড়ের দূরত্ব হচ্ছে মাত্র ৬২ মিটার। ওহোদের দক্ষিণে এটি ছাড়া আর কোন পাহাড় নেই এবং তা গোলাকার ও কিছুটা লাল বর্ণের। পাহাড়টিতে বাড়ী-ঘরের ভগ্নাংশের চিহ্ন রয়েছে।
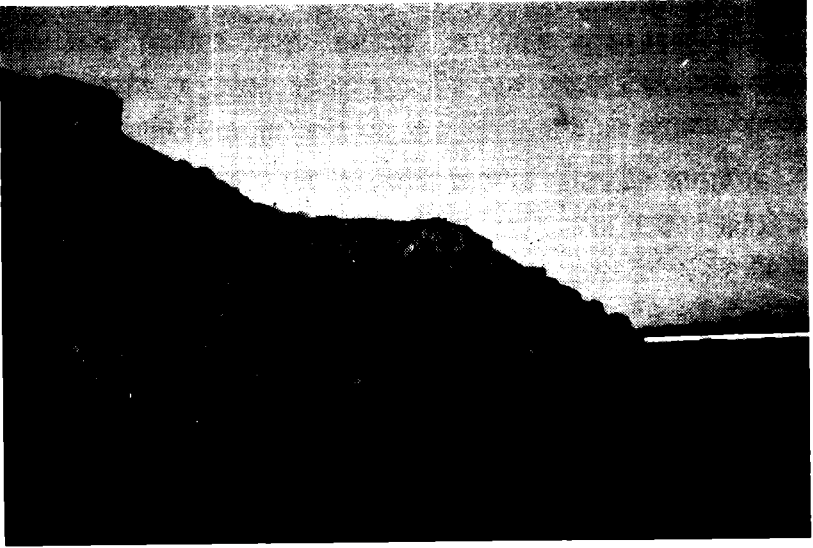
জাবালে আইনাইন বা আর-রুমাহ পাহাড়

জাবালে আ'ইনাইন বা রোমাহ (তীর নিক্ষেপকারীদের) পাহাড় বলতে সেই পাহাড়কে বুঝায়, যার উপর ওহোদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ বিন

জুবায়ের আল-আনসারীর নেতৃত্বে মোট ৫০ জন তীর নিক্ষেপকারী সাহাবাকে মোতায়েন করেছিলেন, যেন শত্রুবাহিনী পাহাড়টির পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে। পাহাড়ে অবস্থানকারী তীরন্দাজেরা ওহোদ যুদ্ধের প্রাথমিক বিজয় পর্বে দলনেতা আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ অমান্য করায় পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর উপর বিরাট বিপর্যয় নেমে আসে। এই পাহাড় সেনাপতির আদেশ অমান্য করার পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

## জাবালে সালা

এটি মদীনার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এর অধিকাংশই কাল পাথর। ইবনে সা'দ বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধে নবী (সা) সালা' পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়টিকে পেছনে রেখে সেনা ছাউনী কায়েম করেন এবং তাতে রাত্রি যাপন করেন।
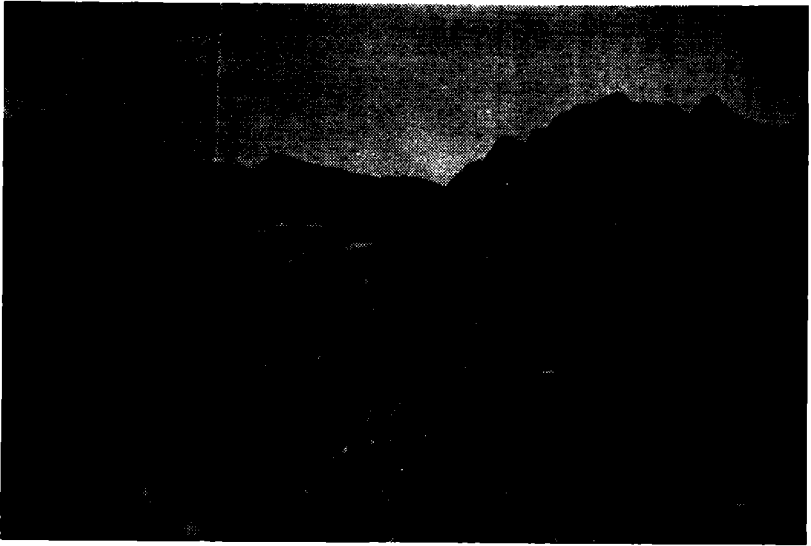
সালা' পাহাড়

পাহাড়ের পাদদেশের স্থানটিকে 'কাহাফে বনি হারাম' ও বলা হয়। সালা' পাহাড়টি সোকে মদীনার একটি পাহাড় যা মাশহাদে নফসে যাকিয়্যার পশ্চিমে অবস্থিত।

## জাবালে সোলাই'

এই ক্ষুদ্র পাহাড়টি বাবে শামীর নিকট সালা' পাহাড়ের বিপরীত দিকে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগে এতে বনি আসলাম গোত্রের মুহাজেরীন বাস করতেন। পরবর্তীতে এর উপর একটি কিল্লা নির্মাণ করা হয়, যাতে সেখান থেকে মদীনার সকল উপকন্ঠ দেখা যায় ও মদীনার প্রতিরক্ষা সম্ভব হয়।

## জোবাব পাহাড়

এই পাহাড়টিকে জোবাব বা জেবাব পাহাড় বলে। সামহুদী উল্লেখ করেছেন, এই পাহাড়ের উপর মসজিদ আর-রায়াহ অবস্থিত। এটি বনি সায়েদাহ গোত্রের কাছাকাছি। তবে আলী মূসা আফেন্দী তাঁর বইতে এর আরো সূক্ষ্ম অবস্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, এটি শামী আল-কোরাইনে অর্থাৎ সানিয়াতুল অদা'য় অবস্থিত। এতে মসজিদে আর রায়াহ আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বাইরে কোন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পতাকা দাঁড় করানোর স্থানে বর্তমান মসজিদে আর-রায়াহ অবস্থিত যার অর্থ হল 'পতাকা মসজিদ।'

জোবাব পাহাড়

বর্তমানে এই পাহাড়ের সঠিক অবস্থান হল, সানিয়াতুল অদা' থেকে রওনা করে এর পূর্বাংশের পানি প্রবাহের স্থানকে ডানে রেখে আবু বকর সিদ্দিক রোড

দিয়ে (সাবেক সুলতানা রোড) পশ্চিম কিংবা উত্তর–পশ্চিমে যাওয়ার সময় আয়–যোগায়বী পেট্রোল পাম্পকে ডানে রেখে এগুতে হবে। এর পেছনে অর্থাৎ পূর্ব দিকের পাহাড়টিই জোবাব পাহাড়। এর পূর্বে রয়েছে আল উয়ু'ন রোড এবং উত্তরে রয়েছে আন–নাসার এলাকা। পাহাড়টিতে বর্তমানে বহু বাড়ীঘর নির্মিত হয়েছে যার কারণে দূর থেকে ছোট মসজিদটি দেখতে পাওয়া যায়না। পাহাড়ের সামনে রয়েছে ১০ম বালিকা স্কুল।

খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) এই পাহাড়ের উপর তাঁবু কায়েম করে তাতে অবস্থান করেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) সালা' পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু কায়েম করে তাতে অবস্থান করেন। এই দুই বর্ণনার মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, খন্দক বা আহযাব যুদ্ধ শামী এলাকার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশে সম্প্রসারিত ছিল। এমন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দু'বার দু'জায়গায় তাঁবু খাটান। প্রথমে পরিখা খননের সময় জোবাব পাহাড়ের উপর এবং ২য় বার পরিখা খনন শেষে এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত জাবালে আহযাব বা সালা' পাহাড়ের ঢালুতে তাঁবু খাটান। তিনি যে স্থানে নামায পড়েছিলেন, সেস্থানেই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে।

## সাওর পাহাড়

অপরদিকে হারামে–মদীনার উত্তর সীমান্তে অবস্থান করছে সাওর পাহাড়। এটি মসজিদে নবওয়ী থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে ওহোদ পাহাড়ের পেছনে উত্তর দিকে বিদ্যমান। পাহাড়টি ছোট ও দেখতে তাঁবুর মত গোলাকার। এর রং কিছুটা লাল। মুসলিম শরীফে হযরত আলী থেকে বর্ণিত। মদীনার হারাম হচ্ছে, আ'ইর ও সাওর পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের নাম।'

বর্তমান বিমান বন্দর রোড দিয়ে এগিয়ে গেলে মাকআ'দে মাতীর নামক ছোট একটি পাহাড় পড়ে। এই পাহাড়ের উপর শহরে পানি সরবরাহের জন্য আইনে যারকার ২টি পানির ট্যাংক নির্মিত হয়েছে। তা ছাড়িয়ে আরো সামনে এগিয়ে পশ্চিমে মোড় নিতে হয়। উয়ুন ও জোরফ গামী রাস্তা দিয়ে সামনে এগুলে ওহোদ পাহাড় বাঁয়ে পড়বে। তখনই সাওর পাহাড়টি পরিষ্কার নজরে পড়ে।

## আ'ইর পাহাড়

আ'ইর পাহাড় মদীনার দক্ষিণে মসজিদে নবওয়ী থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে হারামে-মদীনার শেষ সীমানায় অবস্থিত। এটি একটি বড় পাহাড়। ইবনে মাজাহ একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন, আ'ইর পাহাড় দোযখের একটি দরজা। এটি যুল-হোলাইফা বা বর্তমান আবইয়ারে আলী নামক স্থানের কাছে অবস্থিত।
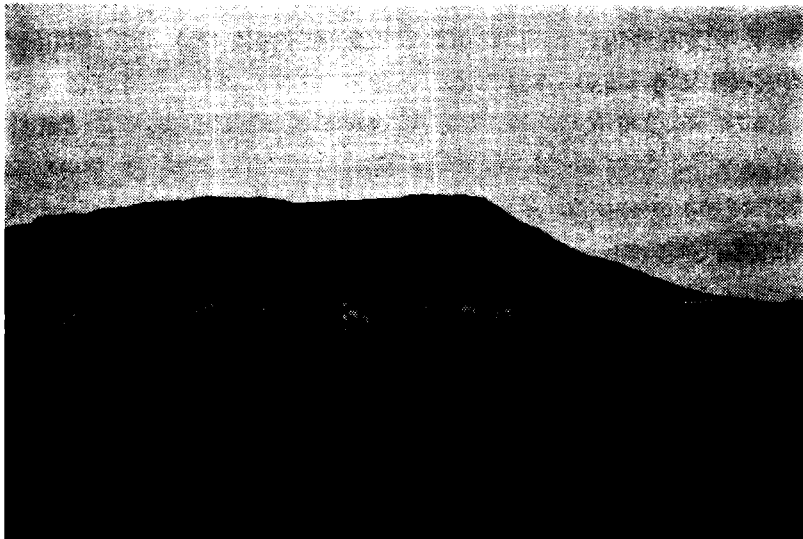
আইর পাহাড়

আ'ইর ও সাওর পাহাড়দ্বয় হারামে-মদীনার ভেতর অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এ দু'টো হারাম এলাকা বহির্ভূত।

# মদীনার ঐতিহাসিক মসজিদসমূহ

মদীনা অঞ্চলের ওয়াকফ ও মসজিদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে মদীনা অঞ্চলের শহর ও গ্রামে মোট ১৩০০ আধুনিক মসজিদ আছে। এর মধ্যে মদীনা শহরের ভেতরেই আছে ৫৭০টি এবং বাইরে ৭৩০টি মসজিদ। তাছাড়াও মদীনায় আরো ১৮টি ঐতিহাসিক মসজিদ আছে, যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে নামায পড়েছেন এবং যেগুলোর সঠিক অবস্থান বর্তমানে চিহ্নিত আছে। আরো কতগুলো মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়েছেন, যেগুলোর কোন চিহ্ন বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। তবে সেগুলোর সাবেক অবস্থান সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। এজাতীয় মসজিদের সংখ্যা হচ্ছে ৪৬। সব মিলিয়ে মদীনার ঐতিহাসিক মসজিদের সংখ্যা ৬৪।

## ১. কুবা মসজিদ

মসজিদে কুবা সম্পর্কে আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেনঃ

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيهِ-

فِيهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

অর্থঃ 'যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত তাতেই আপনার নামায পড়া বেশী যুক্তিসংগত। তাতে এমন সব লোক রয়েছে যারা অধিকতর পবিত্রতা পসন্দ করে। আল্লাহ বেশী পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।'

কুবা একটি কূপের নাম। কূপের নাম অনুসারে কুবার নামকরণ করা হয়েছে। কুবা পল্লী মদীনার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। আজকাল দক্ষিণে মদীনা শহর সম্প্রসারিত হওয়ায় তা মূল শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এখন আর তা আগের মত শহর থেকে পৃথক পল্লী নয়। মসজিদে নবওয়ী থেকে দক্ষিণে এর দূরত্ব হচ্ছে তিন কিলোমিটার। প্রথম থেকেই কুবা মিষ্ট পানি ও কৃষির জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে খেজুর, লেবু, আঙ্গুর, সবজী ও তরি-তরকারি পর্যাপ্ত জন্মে। এখানকার
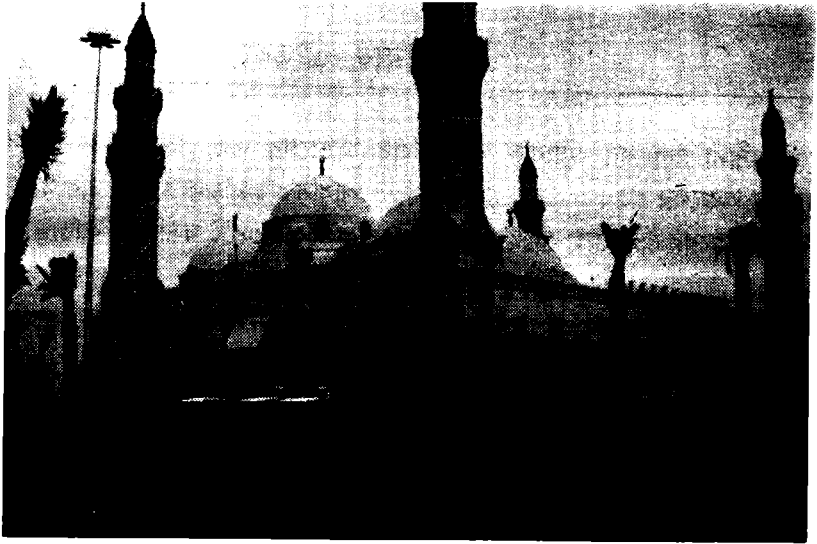
মসজিদে কুবা

আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও মনোরম। মসজিদে নবওয়ীর পাশ দিয়ে মানাখা হয়ে সরাসরি কুবা পর্যন্ত প্রশস্ত দ্বিমুখী সড়ক রয়েছে। মক্কা–জিদ্দা নূতন এক্সপ্রেস রোড কুবাতে গিয়ে মিশেছে।

বোখারী ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি শনিবার পায়ে হেঁটে কিংবা সওয়ারীতে আরোহণ করে মসজিদে কুবায় আসতেন।' এখানে শনিবার বলতে মূল শনিবারও হতে পারে। আবার কারো মতে এর অর্থ হল সপ্তাহ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) সপ্তাহে একবার মসজিদে কুবায় আসতেন। তিরমিযী শরীফে ওসাইদ বিন জহীর আল–আনসারী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'মসজিদে কুবায় নামায উমরাহর সমান।' ইবনে মাজাহ ও ইবনে শো'বা সহল বিন হানিফ থেকে ভাল সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি ঘরে পবিত্রতা (অজু) অর্জন করে মসজিদে কুবায় এসে নামায পড়ে, সে উমরাহর সওয়াব পায়।' তাবরানী সহল বিন হানিফ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে ভাল করে অজু করে মসজিদে কুবায় চার রাকাত নামায পড়ে, সে একটি গোলাম মুক্ত করার সওয়াব পায়।'

হযরত উমার ফারুক (রা) প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার মসজিদে কুবায় যেতেন। হযরত আবু বকর এবং উসমানও মসজিদে কুবায় যেতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা থেকে সোয়াইকা হয়ে মসজিদে কুবায় আসা-যাওয়া করতেন। পথে মসজিদ আল-মোসাল্লা এবং মসজিদে বনি যোরাইক পড়ত। যারা বাকী কবরস্থানের পাশ দিয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তায় কুবায় যান, তারা রাসূলুল্লাহর (সা) কুবায় যাওয়ার রাস্তার হুবহু সুন্নত পালন করতে পারেননা। রাসূলুল্লাহ (সা) এই পথে কুবা যেতেন না।

রবিউল আউয়াল মাসে মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় পৌছার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বকর সহ কুবা পল্লীতে বনি আমর বিন আওফ গোত্রের কাছে কয়েকদিন মেহমান হিসেবে অবস্থান করেন। তিনি গোত্র প্রধান কুলসুম বিন আল হাদামের ঘরে উঠেন এবং ঘরের পার্শ্বে কুলসুমের উটের আস্তাবলে মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটি ইসলামের ১ম মসজিদ।

এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৮ই রবিউল আউয়াল সোমবার মদীনায় পৌছেন। কুবা পল্লীতে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৪দিন থাকেন এবং ১২ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার মদীনার ভেতর পৌছার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি কুবায় ১৩ থেকে ১৯ দিন অবস্থান করেন। ফতহুল বারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুবায় ১৪ দিন অবস্থান করেন। ইবনে যাবালাহ কাসেম বিন আওফ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুবায় ২২ দিন অবস্থান করেন। কুবায় অবস্থানকালীন সময়ে তিনি এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

তাবরানী শামুস বিনতে নোমান নামক একজন আনসার মহিলা থেকে বর্ণনা করেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে মসজিদে কুবা নির্মাণ করতে দেখেছি। তিনি নিজ হাতে পাথর বহন করেন ও তা নির্মাণ করেন। আমি নিজে তাঁর পেট ও নাভীতে মাটি লেগে থাকতে দেখেছি। কোন মুহাজির কিংবা আনসার এগিয়ে গিয়ে যখন বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে পাথরটি দিন, আমি নিয়ে যাই। তিনি তখন জবাবে বলতেন, না, তুমি অন্য আরেকটি পাথর নিয়ে আস। আনসার মহিলাটি বলেন, আমি এখনও যেন তাঁর পেট ও নাভীতে বালুর শুভ্রতা দেখছি। তারপর জিবরীল (আ) আসেন এবং কিবলামুখী হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের ইমামতি করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) উষ্ট্রী মসজিদে কুবার মাঝামাঝি স্থানে বসেছিল। আজকে যেখানে মেহরাব, তা রাসূলুল্লাহ (সা) এর মোসল্লা নয়। আস্‌-সামহুদী ইবনে যাবালাহ থেকে, তিনি ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণনা করেন, কা'বার দিকে ফিরে তাঁর নামায পড়ার স্থান হল, বর্তমান মেহরাব থেকে একটু পূর্বে এবং মেহরাবের পরবর্তী সারির স্তম্ভ বরাবর। পক্ষান্তরে, মসজিদে আকসার দিকে ফিরে তাঁর নামায পড়ার স্থান হল, মসজিদের ২য় দরজা দিয়ে ঢুকার পর খোলা আঙ্গিনায় ৩য় স্তম্ভের কাছে। খোলা আঙ্গিনা বলতে সা'দ বিন খায়সামার ঘরের সামনের খোলা জায়গাকে বুঝায়। অবশ্য আজ কাল আর ঐ ঘর বর্তমান নেই। মসজিদে কুবাতেই তিনি জামাত সহকারে প্রথমে মসজিদে আকসার দিকে ফিরে নামায পড়েন।

৮৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৪৮৬খৃঃ আশরাফ কায়েতবায় মসজিদে নবওয়ীর জন্য সাদা মার্বেল পাথরের তৈরী একটা মিম্বার পাঠান। মিম্বারটি মসজিদে নবওয়ীতে কিছু কাল থাকার পর ৯৯৮ হিঃ মোতাবেক ১৫৯৩ খৃঃ তুর্কী সুলতান মুরাদ মসজিদে নবওয়ীর জন্য আরেকটা মিম্বার পাঠান। তখন আশরাফ কায়েতবায়ের প্রেরিত মিম্বারটি মসজিদে কুবায় স্থানান্তরিত করা হয়। বাদশাহ ফাহাদের সর্বশেষ সংস্কারের সময় উক্ত মিম্বারটি মদীনার বাদশাহ আবদুল আযীয লাইব্রেরীতে ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে রাখা হয়।

মসজিদের সংস্কারঃ ইসলামের ৩য় খলীফা হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা) সর্বপ্রথম মসজিদে কুবার সংস্কার করেন এবং আগের চাইতে আরো সম্প্রসারণ করেন। ৯১-৯৩ হিঃ (৭১১-৭১৩ খৃঃ) উমাইয়া শাসনামলে, মদীনার গভর্ণর উমার বিন আবদুল আযীয মসজিদে কুবার সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন। তিনিই প্রথম মসজিদের মিনারা ও বারান্দা তৈরী করেন, মোজাইক দ্বারা মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন এবং গাছের শাখা ও পাতার পরিবর্তে লোহার ভীম দ্বারা মসজিদের ছাদ তৈরী করেন। ৪৩৫ হিজরীতে (১০৪৫ খৃঃ) আবু ইয়া'লা আল-হুসাইনী পুনরায় মসজিদের সংস্কার করেন এবং মসজিদের মেহরাব তৈরী করেন। ৫৫৫ হিঃ (১১৬২ খৃঃ) মোসেলের শাসক বনি যাকীর মুখ্যমন্ত্রী জামালুদ্দিন ইসফাহানী মসজিদের সংস্কার করেন। তারপর ৬৭১ হিঃ (১২৭৫ খৃঃ) পুনরায় মসজিদের সংস্কার করা হয়। মিসরের শাসক নাসের বিন কালাউন ৭৩৩ হিঃ (১৩৩৫ খৃঃ) এবং মিসরের অন্য শাসক

আশরাফ বারসাবাই ৮৪০ হিঃ (১৪৩৯ খৃঃ) মসজিদের সংস্কার করেন ও ছাদ পুনঃনির্মাণ করেন। ১২৪০ হিঃ তুর্কী সুলতান মাহমুদ খান উসমানী মসজিদের সংস্কার করেন। ১৩৪৫ হিঃ তুর্কী সুলতান ২য় মাহমুদ ও তাঁর ছেলে আবদুল মজিদের আমলে আরেকবার সংস্কার কার্য সম্পন্ন হয়। ১৩৮৮ হিঃ বাদশাহ ফয়সল বিন আবদুল আযীয মসজিদের সংস্কার করেন এবং উত্তর দিকে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। তাতে মসজিদের আয়তন দাঁড়ায় ১৬শ বর্গমিটার। তারপর বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আযীযের আমলে মসজিদের খোলা আঙ্গিনার উপর ছাদ নির্মাণ করে উত্তর দিকে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়।

প্রতিবছর হজ্জ উপলক্ষে বেশী সংখ্যক হাজীর আগমনের কারণে বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয মসজিদে কুবা সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। বিন লাদিন কোম্পানী মসজিদটি নূতন করে নির্মাণ করে এবং ১৪০৭ হিঃ (১৯৮৬ খৃঃ) তা সম্পন্ন হয়। মসজিদের উত্তর দিকের যমীন কিনে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমান মসজিদের আয়তন হচ্ছে ১৩ হাজার ৫শ বর্গমিটার। মসজিদের উত্তরাংশকে মহিলাদের নামাযের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। বর্তমানে মসজিদে বিশ হাজার মুসল্লীর সংকুলান হয়। সম্পূর্ণ মসজিদ এয়ারকন্ডিশনযুক্ত এবং তাতে ৪টি মিনারা ও ৬টি গম্বুজ আছে। মসজিদে ইমাম ও মুয়ায্যিনের থাকার জায়গা আছে এবং সম্পূর্ণ আধুনিক ডিজাইনে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের সাথে একটি ইসলামী লাইব্রেরীও রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) কুবার কুলসুম বিন আল হাদামের যে ঘরে অবস্থান করেন সেখানেই আসমা বিনতু আবু বকরের ঘরে মুহাজিরদের প্রথম সন্তান আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের মদীনায় জন্মগ্রহণ করে।

## ২. মসজিদে জুমা'আ

রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরাতের সময় কয়েকদিন কুবায় অবস্থান করার পর মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সে দিন ছিল শুক্রবার। পথে জুমাআর নামাযের সময় হয়ে গেল। মদীনার লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কুবার অদূরে রানুনা উপত্যকায় বনি সালেম বিন আওফ গোত্রের বসতিতে পৌছলেন। তাঁর সাথে ছিলেন ১শ সাহাবায়ে কেরাম। তিনি সেখানে প্রথম জুমাআর নামায

পড়েন। তাঁর ঐ নামাযের স্থানে যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, সেটাই মসজিদে জুমাআ নামে পরিচিত।
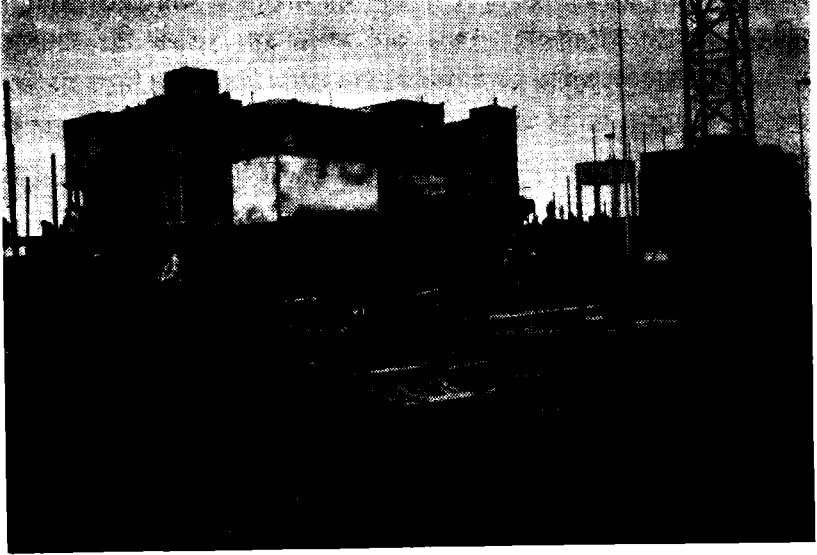
নির্মাণাধীন মসজিদে জুমা'আ

মসজিদটি বিভিন্ন সময়ে ভাংগা-গড়ার সম্মুখীন হয় এবং ৯ম শতাব্দীতে উসমানী খলীফা সুলতান বায়েজীদ পাথর দিয়ে তা পুনঃ নির্মাণ করেন। কয়েক বছর আগে মসজিদটির পুনঃসংস্কার করা হয়। তখন এর দৈর্ঘ ৮ মিটার ও প্রস্থ ৪ মিটার এবং দেয়ালের উচ্চতা ছিল ২ মিটার। অর্থাৎ মসজিদটি খুবই ছোট ছিল। কিন্তু ১৪১১ হিঃ মোতাবেক, ১৯৯১ সালে সৌদী বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয মসজিদটি পুনঃ সংস্কার করেন এবং তাতে ইসলামী স্থাপত্য বিদ্যার আধুনিক ছোঁয়া লাগিয়ে সর্বাধুনিক ডিজাইনের ভিত্তিতে তা তৈরী করেন। ফলে, বর্তমান মসজিদের মোট আয়তন হচ্ছে ২ হাজার বর্গমিটার। এতে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক নামাযের স্থান নির্ধারিত আছে। বর্তমানে মসজিদে একটি হাফেজী মাদ্রাসাও চালু করা হয়েছে। এছাড়াও তাতে নারী পুরুষের পৃথক অজুর স্থান ও টয়লেট রয়েছে এবং ইমাম মুআয্যিনের থাকার ব্যবস্থা আছে। মসজিদের আরো ২টা নাম প্রচলিত আছে। সেগুলো হচ্ছে মসজিদে আতেকা এবং মসজিদ আল-ওয়াদী। মসজিদের একটি খালি আঙ্গিনাও আছে। বর্তমান বাদশাহ ফাহাদ

বিন আবদুল আযীযের আমলে তা ভেঙ্গে আরো সম্প্রসারিত করা হয়। মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে মহিলা শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ কলেজ।

## ৩. মসজিদে গামামাহ

এই মসজিদকে মসজিদে মোসাল্লাহও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) মানাখা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার খোলা ময়দানে ঈদের নামায পড়েছেন, তবে তিনি প্রথম ঈদের নামায ও শেষ জীবনের ঈদের নামাযগুলো মানাখার বর্তমান মসজিদে গামামার স্থানে পড়েন। ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম ঈদের নামায পড়েন মোসাল্লায় ২য় হিজরী সালে।[৬৫]
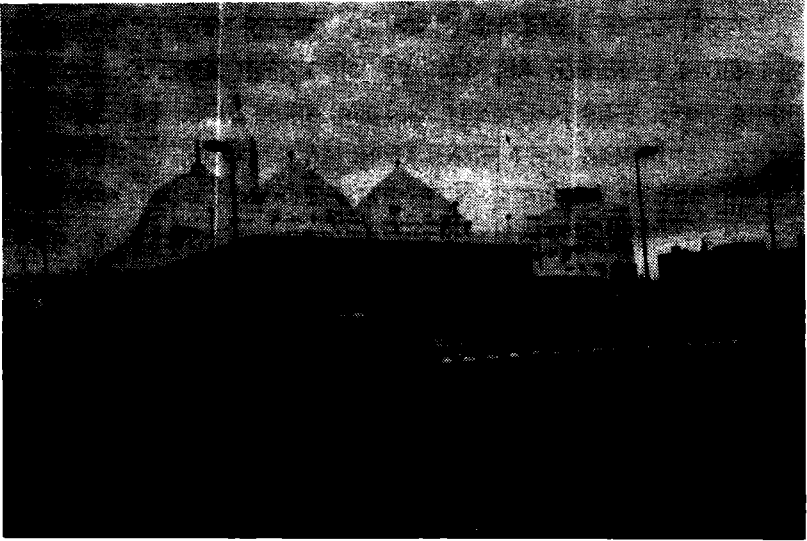
**মসজিদ আল-গামামাহ**

হযরত আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ (সা) মোসাল্লায় বৃষ্টি প্রার্থনার নামায পড়ার জন্য বের হলেন। তিনি সেখানে প্রথমে খুতবা দিলেন, পরে নামায পড়লেন এবং বললেন, এটি আমাদের জমায়েত হওয়ার স্থান, বৃষ্টি প্রার্থনার জায়গা, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযের জন্য ঈদগাহ। এখানে কোন আবাসিক ভবন নির্মাণ কিংবা তাঁবু কায়েম করা যাবেনা।"

---

৬৫· ফুসূল বিন তারীখ আল-মদীনাহ ।। আলী হাফেজ

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সা) সফর থেকে ফিরে আসলে মোসাল্লায় যেতেন এবং কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন।'৬৬

মসজিদে গামামাহ মানাখা বাবে শামী ও মানাখা দাইরোর দক্ষিণে এবং মানাখা আল-হাতাবের উত্তরে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটিকে ঈদগাহ হিসেবে ব্যবহার করেন। গামামাহ শব্দের অর্থ মেঘ। সম্ভবতঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযের জন্য গামামাহ নামকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে মসজিদে নবওয়ীর ব্যাপক সম্প্রসারণের কারণে এটি মসজিদের নবওয়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে।

সামহুদী বলেছেন, এটা স্পষ্ট যে মসজিদে মোসাল্লা সহ মসজিদে আলী বিন আবি তালেব ও মসজিদে আবু বকর এই ৩টি মসজিদ হিজরী ৯১-৯৩ সালে মদীনার গভর্ণর উমার বিন আবদুল আযীযের আমলে নির্মিত হয়। ৭৪৮ হিঃ (১৩৫০ খৃঃ) মিসরের শাসক নাসের হাসান বিন কালাউনের আমলে মসজিদে নবওয়ীর কর্মকর্তা ইজ্জুদ্দিন মসজিদে গামামাহর সংস্কার করেন। ৮৬১ হিঃ, (১৪০৬ খৃঃ) মিসরের শাসক আশরাফ আনিয়ালের আমলে মদীনার গভর্ণর বারবাক মসজিদটির সংস্কার করেন। ১৪০০ হিজরীতে তুর্কী সুলতান আবদুল মজীদ উসমানী মসজিদটি পুনঃসংস্কার করেন যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। মসজিদের দৈর্ঘ ২৬ মিটার, প্রস্থ ১৩ মিটার, উচ্চতা ১২ মিটার এবং দেয়াল দেড় মিটার চওড়া। মসজিদের মূল আয়তন হচ্ছে ৭৭৫ বর্গমিটার। এটি পাথর দিয়ে মজবুত করে নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে তা সৌদী হজ্জ ও ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে আছে।

## ৪. মসজিদে আবু বকর

এই মসজিদটি মসজিদে গামামাহর উত্তরে অবস্থিত। পূর্বে এটি আরিরদিয়া বাগান নামে পরিচিত ছিল। মাতারী উল্লেখ করেছেন, ইবনে যাবালাহ মসজিদে গামামাহ ব্যতীত আরো যে দু'টো মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদের নামায আদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো হচ্ছে, মসজিদে গামামাহর উত্তরে আবু

---

৬৬. ওমদীতুল আখবার ফি মদীনাতিল মোখতার।। শেখ আহমদ আবুল হামীদ আব্বাসী।

বকর মসজিদ এবং আরিদিয়া বাগানের উত্তরে অবস্থিত মসজিদে আলী। হযরত আবু বকর (রা) খলীফা থাকা কালীন সময়ে এই মসজিদে ঈদের নামায পড়ান। তাই ঐটি মসজিদে আবু বকর নামে পরিচিতি লাভ করেছে।
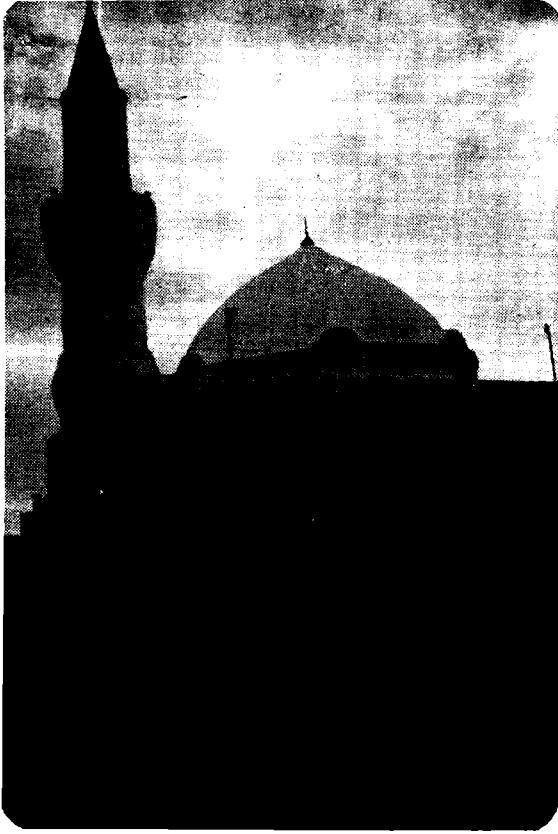
মসজিদে আবু বকর (হারামে নবওয়ী সংলগ্ন)

সামহূদী উল্লেখ করেছেন, মসজিদে গামামাহ, মসজিদে আবু বকর ও মসজিদে আলী তদানীন্তন মদীনার উমাইয়া গভর্ণর উমার বিন আবদুল আযীয নির্মাণ করেন। ১২৫৪ হিঃ (১৮৩৮ খৃঃ) তুর্কী সুলতান মাহমুদ উসমানী তা সংস্কার করেন এবং বর্তমান ইমারত তাঁরই তৈরী। মসজিদের আয়তন হচ্ছে প্রায় ২৪০ বর্গমিটার।

## ৫. মসজিদে উমার বিন খাত্তাব

মসজিদে গামামাহর দক্ষিণে বাতহা উপত্যকার পূর্বে এবং বর্তমান মাদরাজ ২ নং ওভারব্রীজের নিকট এই মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদের সামনেই রয়েছে কুবা, আম্বারিয়া ও মানাখাগামী সড়কের ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ার। মদীনার ইতিহাসে এই মসজিদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না। তবে একথাও সত্য যে, ঐতিহাসিক মসজিদ না হলে মসজিদের গামামাহর এত নিকট এত বড়

মসজিদে ওমার (মসজিদে নবওয়ী সংলগ্ন)

মসজিদ নির্মিত হতে পারেনা। সম্ভবতঃ এটি মানাখার দাররা পরিবারের আঙ্গিনা, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদের নামায পড়েছেন। সম্ভবতঃ হযরত উমার (রা) এর খেলাফতকালে তিনিও তাতে ঈদের নামায পড়েছেন। তাই এটিকে মসজিদে উমার বলা হয়। ১২৫৪ হিঃ (১৮৩৮ খৃঃ) তুর্কী সুলতান মাহমুদ উসমানী তা সংস্কার করেন।

## ৬. মসজিদে আলী বিন আবি তালিব

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) মানাখার কয়েকটি স্থানে ঈদের নামায পড়েছেন। এর মধ্যে বর্তমান মসজিদে আলী বিন আবি তালিব নামক

স্থানেও রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদের নামায পড়েছেন। এটি মসজিদে আবু বকরের অদূরে উত্তর দিকে এবং বর্তমান সম্প্রসারিত মসজিদে নবওয়ীর পশ্চিম সীমানায়অবস্থিত।

ইবনে যাবালাহ ও ইবনে শেবাহ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় প্রথম ঈদুল ফিতরের নামায আদায় করেন হাকিম বিন আ'দার ঘরের সামনের আঙ্গিনায়। ইবনে শেবাহ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম ঈদুল ফিতরের নামায পড়েন আ'দা বিন খালেদের ঘরের সামনের আঙ্গিনায় একটি কসাইখানার পেছনে। সামহুদী বলেছেন, এটি হচ্ছে হাকিম বিন আ'দার ছেলের বাড়ী এবং ঐটি মসজিদে মোসাল্লার কাছে মোযাইনা গোত্রের বাসস্থানের সাথে ছিল।

একথা ধারণা করা যায়না যে, হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর ঈদগাহ বাদ দিয়ে নিজে আলাদা ঈদগাহে ঈদের নামায পড়েছেন। বরং রাসূলুল্লাহ (সা) যে সকল জায়গায় ঈদের নামায পড়েছেন, এটি তার মধ্যে একটি। তবে মসজিদে গামামায় স্থায়ীভাবে ঈদের নামায শুরুর আগে রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে আলী নামক স্থানে ঈদের নামায পড়েছেন। ইবনে শেবাহ আরো বলেছেন, হযরত উসমান (রা) মদীনায় বিদ্রোহীদের দ্বারা যখন ঘেরাও হন, তখন হযরত আলী (রা) বর্তমান মসজিদে আলী নামক স্থানে ঈদের নামায পড়েছেন। বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীযের আমলে মসজিদটি ভেঙ্গে নূতন করে তৈরী করা হয়েছে।

## ৭. মসজিদে কিবলাতাইন

এই মসজিদে বাইতুল মাকদেস থেকে কাবা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ হওয়ায় একে কিবলাতাইন মসজিদ (দুই কিবলার মসজিদ) বলা হয়। এটি মসজিদে নবওয়ী থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে হাররা-আল-ওয়াবরাহর একটি উঁচু স্থানে খালেদ বিন ওয়ালিদ রোডে নির্মিত এই মসজিদটি রুমাহ কূপের নিকটবর্তী। এই এলাকাটি বনি সালামা গোত্রের বাসস্থান ছিল। এর পশ্চিমেই রয়েছে আকীক উপত্যকা।

তাবকাতে ইবনে সা'দে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদের মুসল্লীদেরকে নিয়ে জোহরের নামায পড়ার সময় মসজিদে হারামের দিকে
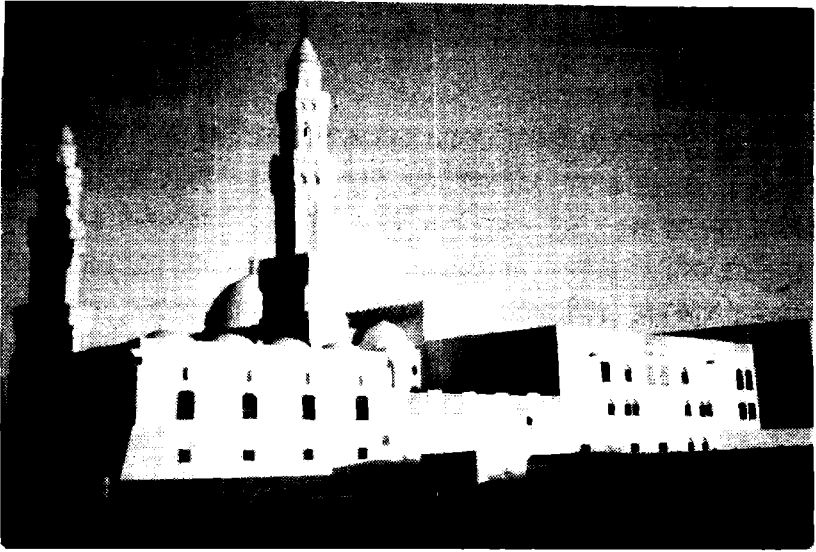
মসজিদে কেবলাতাইন

কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ পান। আল্লাহ বলেন, "আপনি আপনার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরান।" (সূরা বাকারাহ) কা'বা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তনের ইচ্ছা বহু আগ থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা) পোষণ করে আসছিলেন। দীর্ঘ ১৭ মাস তিনি বাইতুল মাকদেসের দিকে ফিরে নামায পড়েন। তারপর ১৭ মাসের শুরুতে রজব মাসের মাঝামাঝি সোমবার তিনি কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ পান। এটা মদীনার মুসলমানদের জন্য একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দেয়। এতে বিরক্ত হয়ে ইহুদীরা মুসলমানদের কিবলা পরিবর্তনের বিষয়ে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করতে থাকে। আল্লাহ স্বয়ং ঐ সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকই আল্লাহর।' (বাকারাহ –১১৫) ইহুদীরা প্রশ্ন করে, 'কোন জিনিস মুসলমানদেরকে কিবলা পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করল? (হে নবী) আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম–সকল দিকই আল্লাহর।' (বাকারা–১৪২)

ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ আল–আখনাস বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বনি সালামাহ গোত্রের উম্মে বাশারের ঘরে গেলেন। উম্মে বাশার তাঁর জন্য খানা পাকালেন। তখন জোহরের নামাযের সময় উপস্থিত। তিনি জামাতে দু'রাকাত

ফরজ পড়ার পর কা'বার দিকে কিবলাহ পরিবর্তনের নির্দেশ পান এবং কা'বার দিকে ফিরে দাঁড়ান।' তাই এটিকে মসজিদে কিবলাতাইন বলা হয়।

রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে পাথর, ইট এবং খেজুর গাছের ডাল-পাতা দিয়ে মসজিদটি তৈরী হয়েছিল। সামহুদী বলেছেন, পরবর্তীতে মসজিদটি পাকা ও ছাদ বিশিষ্ট ছিল। কারা কখন তা করেছে এটা জানা যায়না। তবে ৮৯৩ হিঃ ( ১৪৯১ খৃঃ) শাহীন জামালী মসজিদটির সংস্কার করেন ও ছাদ নির্মাণ করেন। তারপর তুর্কী সুলতান সুলাইমান ৯৫০ হিঃ (১৫৪৬ খৃঃ) তা পুনঃসংস্কার করেন। বাদশাহ আবদুল আযীয মসজিদটি সংস্কার করেন এবং মিনারা ও সিঁড়ি নির্মাণ করেন। ১৪০৮ হিঃ (১৯৮৭ খৃঃ) বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয মসজিদটি পুনরায় নির্মাণ করেন ও সম্প্রসারণ করেন। মসজিদে বর্তমানে ২টা মিনারা আছে। এতে পুরুষ ও মহিলাদের প্রবেশের জন্য পৃথক দরজা আছে। মহিলাদের নামাযের স্থান দোতলা। মসজিদে অজুর জায়গা, ইমাম ও মুয়ায্যিনের থাকার ঘর এবং একটি লাইব্রেরী আছে। মসজিদের আয়তন ১১৯০ মিটার এবং তাতে ২ হাজার লোক এক সাথে নামায পড়তে পারে।

## ৮. মসজিদে আল—ফাত্হ

'ফাত্হ' শব্দের অর্থ বিজয়। খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের প্রতি ঈঙ্গিত স্বরূপ এর এই নামকরণ করা হয়েছে। এই মসজিদকে 'মসজিদে আহযাব' এবং 'মসজিদে আ'লা'ও বলা হয়। এখানে ৭টি মসজিদ আছে। এইগুলোকে এক সাথে 'মাসাজেদ আল-ফাত্হ' কিংবা 'মাসাজেদে সাবআহ'বলে।

এই মসজিদটি খন্দক ময়দানের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। পশ্চিম দিক থেকে এটি সালা' পাহাড়ের অংশ বিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর পশ্চিমে রয়েছে বাতহা উপত্যকা যার বর্তমান নাম হচ্ছে, আবু জিদাহ উপত্যকা। মসজিদের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে অনেক খেজুর বাগান। মসজিদটি পাহাড়ের ঢালুতে নির্মিত হলেও তা যথেষ্ট উঁচুতে অবস্থিত।

ইবনে ইসহাক বিন শা'বান বলেনঃ কারুর কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তার জন্য খন্দকে অবস্থিত মসজিদে ফাত্হে জোহর ও আসরের নমাযের মাঝে এসে রুকু করে কল্যাণের জন্য দোয়া করাকে আমি উত্তম মনে করি।

ইমাম আহমাদ হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে ফাতহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সোম, মঙ্গল ও বুধবার বদদোয়া করেছেন। বুধবার দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর দোয়া কবুল হয়। তখন তাঁর চেহারায় খোশ–খবরের লক্ষণ ফুটে উঠে। আল্লাহ মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কুফরী শক্তিকে পরাজিত করেন। হযরত জাবের বলেন, আমি যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতাম, তখন ঐ সময়ে আমি সেখানে গিয়ে দোয়া করতাম এবং দোয়া যে কবুল হয়েছে তা টের পেতাম।'

হযরত জাফর বিন মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে ফাতহের মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমে এক কদম হাঁটেন। তারপর দ্বিতীয় কদমের পর দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে দোয়া করেন। তিনি হাত এতটুকু উঁচু করেন যে তাঁর বগলের নীচের শুভ্রতা দেখা যায়। দোয়া করতে করতে পিঠ থেকে চাদর নীচে পড়ে যায়। কিন্তু তিনি তা উঠাননি। বরং দীর্ঘক্ষণ দোয়া করেন ও দোয়া শেষে ফিরে আসেন।'

হারুন বিন কাসীর তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খন্দকের দিন দোয়া করেন যার ফলে ইসলামের বিজয় হয়।

ইমাম আহমাদ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে ফাতহের মধ্যে যান। তখন আসরের সময়। তিনি মসজিদে আসরের নামায পড়েন।' কিন্তু উলামায়ে কেরাম বলেন, আসরের আগে গিয়ে সেখানে দোয়া করলে তা যে কবুল হয় এটা পরীক্ষিত ব্যাপার।

মসজিদে ফাতহের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) নামায ও দোয়ার স্থান একটাই। আর সেটা হচ্ছে, মসজিদের উন্মুক্ত স্থানের মধ্যম স্তম্ভের কাছে। ঐটা মসজিদের মেহরাবের বিপরীত দিকে অবস্থিত।

মসজিদের সংস্কারঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সময় মসজিদটি পাথর, গাছের কান্ড এবং খেজুর গাছের ডাল–পালা দিয়ে তৈরী ছিল। ৯৩ হিজরীতে (৭১৩খৃঃ) উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের আমলে মদীনার গভর্ণর উমার বিন আবদুল আযীয মসজিদটির সংস্কার করেন। ৫৭৫ হিজরীতে (১১৮২ খৃঃ) মিসরের রাজা হুসাইন বিন আবিল হাইজা মসজিদটি পুনঃসংস্কার করেন। সৌদী

শাসনামলে মসজিদের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং তাতে সিমেন্টের একটি সিঁড়ি তৈরী করা হয়। মসজিদটি ছোট এবং বর্তমানে চারদিকে রয়েছে সবুজের সমারোহ।

## পাঁচ মসজিদ

মসজিদে ফাত্‌হের সামনে দক্ষিণ দিকের ময়দানে আরো ছোট ৫টা মসজিদ আছে। সেগুলোর ধারাবাহিক অবস্থান হচ্ছে নিম্নরূপঃ (উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে)।
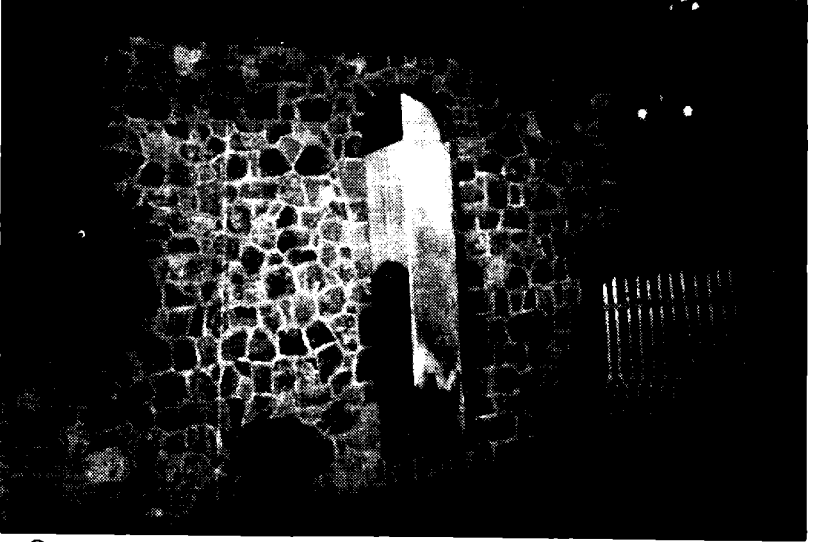
মসজিদে ফাতেমা

**৯. মসজিদে সালমান ফারেসী**

**১০. মসজিদে আবু বকর**

**১১. মসজিদে উমার**

**১২. মসজিদে ফাতিমা**

**১৩. মসজিদে আলী** – এটি মসজিদে ফাতিমার পূর্বদিকে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। তাতে উঠার জন্য সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে।

এই ময়দানে ৭ মসজিদের কথা উল্লেখ থাকলেও মোট মসজিদ সংখ্যা হচ্ছে ৬টা। ১টার কোন. অস্তিত্ব নেই। সম্ভবতঃ কালের আবর্তনে একটা মসজিদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আলী হাফেজ লিখেছেন, এই মসজিদগুলোর নামকরণের বিশেষ কোন কারণ কোথাও উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ যেয়ারতকারীদের জন্য পথ-প্রদর্শকগণ এসকল মসজিদের উক্ত নামকরণ করেছে। তবে খন্দকের যুদ্ধের সময় উল্লেখিত মসজিদসমূহের স্থানে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন আরব গোত্রের লোকেরা শিবির স্থাপন করে। স্বাভাবিকভাবে সেখানে তাদের নামায পড়ার স্থানও ছিল। যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সেগুলোতে নামায পড়েছেন।[৬৭]

**খন্দকের মসজিদে আলী**

সৌদী শাসনামলে ঐ সকল মসজিদে নামায পড়ার জন্য ময়দানের পূর্ব পার্শ্বে পাহাড়ের গা ঘেঁষে অজুর স্থান ও পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাতে নারী-পুরুষের পৃথক ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে শুধু মসজিদে আবু বকরেই জামাত সহকারে ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বাকী মসজিদগুলোতে নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হয়না। ময়দানটি বর্তমানে গাছ-গাছড়ায় সবুজ।

---

৬৭· ফুসুল মিন তারীখ আল-মদীনা।। আলী হাফেজ।

কাহাফ বনি হারামঃ খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত গুহায় রাত্রি কাটান। তাবরানী বর্ণনা করেন, হযরত মুআ'জ বিন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) তালাশে বের হন। কিন্তু কোথাও তাঁকে পাচ্ছিলেননা। তারপর তিনি একটি সরু পথ দিয়ে চলার সময় বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জাবালে সাওয়াবে আছেন। তিনি জাবালে সাওয়াবে (সালা') যান এবং ডানে-বামে দেখতে থাকেন। তিনি তাঁকে উক্ত গুহায় সেজদারত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি বলেন, আমি পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নামলাম। তখন পর্যন্ত তিনি সেজদায় আছেন। তখন আমার সন্দেহ হল, তিনি হয়তো সেখানে ইন্তিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া থেকে অবসর হয়ে বললেনঃ আমার কাছে জিবরীল (আ) এসে বলেন, আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছেন, তিনি আপনার উম্মাতের জন্য কি করবেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহই ভাল জানেন।' জিবরীল চলে যান একং কিছু পরে ফিরে এসে বলেন, আল্লাহ আপনার উম্মাতের কোন অমঙ্গল করবেননা। একথা শুনে আমি আবার সেজদায় পড়লাম। তিনি বলেন, আল্লাহর কাছে বান্দাহর নৈকট্য লাভ করার উত্তম উপায় হচ্ছে সেজদা।

গুহাটির উপর একটি বড় পাথর আছে যাকে গুহার ছাদ বলা যেতে পারে। সালা' পাহাড় থেকে বাতহা উপত্যকায় প্রবাহিত নালা হতে একটু পূর্বদিকে উপরে উঠলে হাতের ডানে ঐ গুহা পড়ে।

## ১৪. মসজিদ আল-ফাদীখ

ইবনে শেবাহ হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) ইহুদী বনি নাদীর গোত্র অবরোধ করেন। যে জায়গায় তাঁর তাঁবু খাটানো হয় পরবর্তীতে সেখানে নির্মিত মসজিদের নাম হচ্ছে মসজিদ আল-ফাদীখ। তিনি সেখানে ৬ রাত নামায পড়েন। ইহুদী বনি নাদীর গোত্র রাসূলুল্লাহ (সা) এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)কে ডেকে ঘরের পার্শ্বে বসিয়ে ছাদের উপর থেকে বড় পাথর মাথার উপর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারই শাস্তি হিসেবে তিনি তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। পরে তারা খাইবারে গিয়ে বসতি স্থাপনকরে।
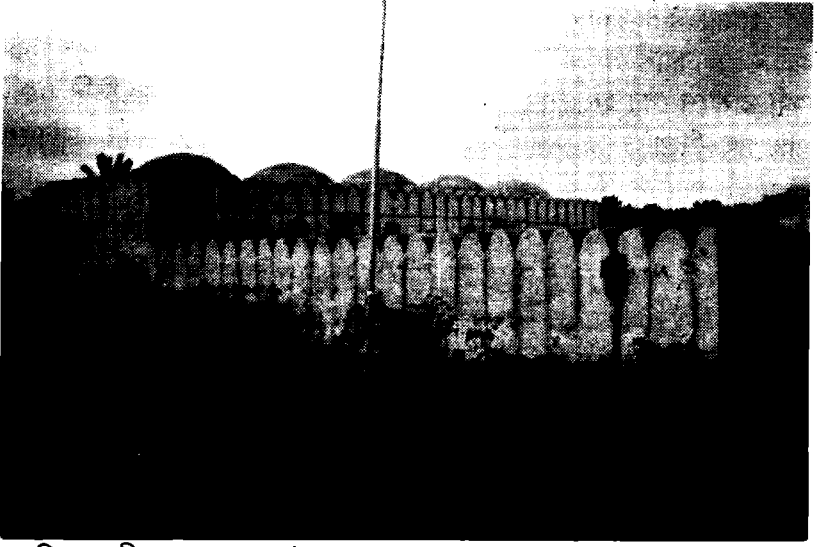
**মসজিদে ফাদীখ**

ঐ অবরোধের সময় মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হযরত আবু আইউব আনসারী সহ আরো কিছু সংখ্যক সাহাবী ফাদীখ নামক একটি বিশেষ মদ পান করা অবস্থায় তাদের কাছে মদ হারাম হওয়ার খবর পৌছে। তখন তাঁরা ঐ স্থানে মদের সকল পাত্র ঢেলে দেন। এই কারণে মসজিদটির উক্ত নামকরণ করা হয়েছে। এর আরেকটি নাম হচ্ছে, মসজিদে শামস। সম্ভবতঃ মসজিদটি উঁচু জায়গায় নির্মিত বলে তাতে সূর্যের আলো প্রথম এসে পড়ে। তাই তাকে মসজিদে শামস বলা হয়।

এই মসজিদটি মসজিদে কুবার পূর্বদিকে এবং আ'ওয়ালী পল্লীর উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। মসজিদে নবওয়ী থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে প্রায় তিন কিলোমিটার।

আল-মাতারী লিখেছেন, এই মসজিদটি মসজিদে কুবার অনুরূপ নমুনায় নির্মিত। এতে ১৬টি খুঁটি ছিল। কিন্তু পরে তা নষ্ট হয়ে যায় এবং মদীনার গভর্ণর উমার বিন আবদুল আযীযের আমলে তা পুনরায় সংস্কার করা হয়। মসজিদের দৈর্ঘ ১৯ মিটার ও প্রস্থ ৪ মিটার। এতে ৫টি গম্বুজ ও একটি মেহরাব আছে। বর্তমান ইমারতের নির্মাণ কৌশল প্রমাণ করে যে, এটি উসমানী আমলের তৈরি।

## ১৫. মসজিদে আস—সোক্ইয়া

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। 'বদর যুদ্ধে যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে হাররায় অবস্থিত সোক্ইয়া হয়ে যান ও সেখানে নামায পড়েন।' সোকইয়া হচ্ছে সেখানকার কূপের নাম। ইমাম আহমাদ হযরত আবু কাতাদাহ থেকে সহীহ সনদসূত্রে বর্ণনা করেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) সোকইয়া কূপের বাড়ীসমূহের কাছে হাররার মূল কেন্দ্রে সা'দ বিন আবি ওয়াককাসের জমিতে নামায পড়েন এবং দোয়া করেনঃ '(হে আল্লাহ!) নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আ) তোমার একনিষ্ঠ বন্ধু, বান্দাহ ও নবী। তিনি মক্কাবাসীদের জন্য দোয়া করেছিলেন। আমি মুহাম্মাদ, তোমার বান্দাহ ও রাসূল। আমি মক্কার জন্য ইবরাহীম (আ) এর দোয়ার অনুরূপ মদীনাবাসীদের জন্য দোয়া করছি। তুমি তাদের মাপযন্ত্র–সা ও মুদ এবং ফলের মধ্যে বরকত দাও। হে আল্লাহ, তুমি মদীনাকে আমাদের কাছে মক্কার মতই প্রিয় করে দাও এবং এখানকার মহামারী রোগ গাদীর খোমে (রাবেগের নিকট একটি জায়গার নাম) স্থানান্তর করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি ইবরাহীমের (আ) মুখে যেমন মক্কাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছ, আমিও তেমনি মদীনার দুই কাল প্রস্তরময় উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানকে সম্মানিত ঘোষণা করলাম।'
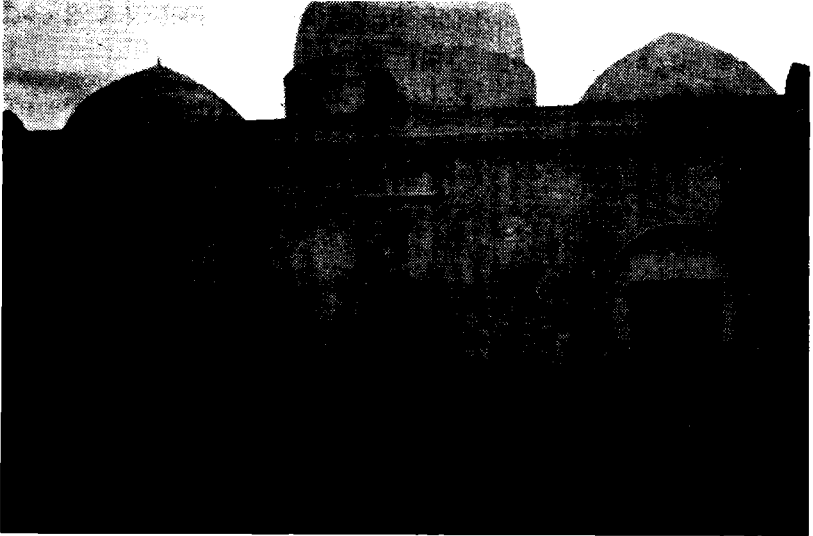
মসজিদে সোকইয়া

এখানেই হযরত উমার বিন খাত্তাব (রা) হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে দিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করিয়েছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) বলেছিলেনঃ 'হে আল্লাহ, গুনাহ ছাড়া কেউ অপমানিত হয়না এবং তাওবা ছাড়া কেউ ক্ষমা পায়না। আজ আমার জাতি রাসূলুল্লাহর (সা) আত্মীয় হিসেবে আমাকে তোমার কাছে পেশ করেছে, এইগুলো হচ্ছে আমাদের গুনাহর হাত; তাওবা সহকারে এসকল কপাল আজ তোমার দরবারে। আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর।' রাবী বলেন, এরপর ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হল, জমীন উর্বর হল এবং লোকেরা আরামের সাথে বাস করতে থাকল। এই ঘটনার পর থেকে হযরত আব্বাসকে সাকীউল হারামাইন' বলা হয়।

ঐতিহাসিক সামহুদী বলেন, মসজিদটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি সাথে কিছু খননকারী নেন ও তা খুঁড়ে বের করেন। সামহুদীর আমলেই মসজিদটিকে তার সাবেক ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করা হয়। তখন মসজিদটির আয়তন ছিল ৭ X ৭ গজ। মসজিদটি সোকইয়া কূপের কাছে অবস্থিত। বর্তমান জিদ্দা–মদীনা সড়ক দ্বারা মসজিদটি কূপ থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে। এটি সাবেক আমবারিয়া রেল ষ্টেশনের আঙ্গিনায় ষ্টেশনের দক্ষিণে অবস্থিত। ময়দানে আম্‌বারিয়া থেকে তা মাত্র ৪০ মিটার দূরে অবস্থিত। এই মসজিদের আরেক নাম হচ্ছে 'মাথা গম্বুজ মসজিদ। কেননা, তুর্কী সুলতান্‌গন কিছু সংখ্যক ডাকাতের মাথা কেটে তা মসজিদের ভেতর রেখে দিয়েছিলেন।

মানাখা থেকে আম্বারিয়া সড়ক হয়ে ময়দানে আম্বারিয়ায় পৌছলেই মসজিদটি পাওয়া যাবে। বর্তমানে মসজিদটি অনাবাদী এবং তাতে নামায পড়া হয়না।

## ১৬. মসজিদে জুল হোলায়ফাহ

এটিকে মসজিদে মীকাত এবং মসজিদে আবইয়ারে আলী বলে। জুলহোলায়ফার বর্তমান নাম হচ্ছে আবইয়ারে আলী; বীরে আলীও বলা হয়। এর আরেক নাম হচ্ছে মসজিদে শাজারাহ। শাজারাহ অর্থ গাছ। এখানে বাবলা জাতীয় গাছ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত গাছের ছায়ার নীচে বসেছিলেন। ইবনে যাবালাহ বলেছেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় হজ্জ ও উমরায় যাওয়ার পথে বাবলা জাতীয় গাছের ছায়ায় বর্তমান মসজিদের স্থানে বিশ্রাম নিতেন।'

মসজিদে জুল-হোলায়ফাহ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে শাজারাহর বর্তমান মধ্যবর্তী স্তম্ভের কাছে নামায পড়েন।' মসজিদ সম্প্রসারণের কারনে উক্ত স্তম্ভ বর্তমানে আর মাঝখানে নেই।

মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সা) জুলহোলায়ফায় দুই রাকাত নামায পড়েন। তারপর তাঁর উষ্ট্রী সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তালবিয়া পাঠ করেন। অর্থাৎ 'লাব্বাইকা------লা শারীকা লাকা বলেন।' এখান থেকে তিনি ইহরাম বাঁধেন।

মাতারী বলেছেন, ঐ বড় মসজিদটির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি মিনারা ছিল। মসজিদটি পরে নষ্ট হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা অনাবিষ্কৃত থাকে। ১৩৫৩ হিজরীতে উক্ত উপত্যকার উপর দিয়ে এক বড় বন্যা বয়ে যায়। মাটি থেকে প্রায় ২ মিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। এতে করে বালুর নীচে চাপা পড়া মসজিদটির উপর থেকে মাটি সরে যাওয়ায় পুনরায় আবিস্কৃত হয়।

সামহূদী বলেছেন, মিসরের যয়নুদ্দিন আল-ইসতেদার ৮৬১ হিঃ (১৪৬০ খৃঃ) তা সংস্কার করেন। এটা বর্গাকৃতির এবং এর আয়তন হচ্ছে ২৩·৪

বর্গমিটার। এর দক্ষিণে 'মসজিদে মা'রাস' নামক আরেকটি ছোট মসজিদ ছিল। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে শাজারার পথে বের হতেন এবং মারাসের পথে প্রবেশ করতেন। তিনি মক্কা থেকে মদীনায় ফিরার পথে জুলহোলায়ফায় নামায পড়তেন ও রাত্রি যাপন করতেন। সকালে তিনি মদীনার ভেতর প্রবেশ করতেন।

সৌদী বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয মসজিদটির সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন। বর্তমান মসজিদের আয়তন হচ্ছে ৬ হাজার ১৮৮ বর্গমিটার। এতে ৬৪ মিটার উঁচু ২টা মিনারা, ২৮ মিটার উঁচু ১টা গম্বুজ ও কয়েকটি টয়লেট রয়েছে। মসজিদের পাশ দিয়ে একটি পাকা সড়ক তৈরী হয়েছে যা মদীনা, মক্কা ও জিদ্দার সাথে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। এটি আকীক উপত্যকার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মসজিদে নবওয়ী থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে ৮ কিলোমিটার। মদীনা থেকে ইহরাম বাঁধার জন্য এটি মদীনাবাসীসহ ঐপথে আগত সবাইর জন্য মীকাত। এই মসজিদ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) ইহরাম বাঁধায় এবং তা মীকাত হিসেবে নির্ধারিত হওয়ায় এই মসজিদের মর্যাদা অনেক বেশী।

## ১৭. মসজিদে আবু যার

এই মসজিদের আরো কয়েকটা নাম আছে। সেগুলো হচ্ছে, মসজিদ তরীক সেফালাহ, মসজিদে বোহাইর ও মসজিদে সিজদাহ। আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দীর্ঘ সিজদায় দেখতে পেলেন। সিজদা দীর্ঘ হওয়ায় তিনি ভাবলেন, হয়তো রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করার পর তিনি নিজের ধারণা তাঁকে বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেনঃ জিবরীল (আ) আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর সালাম ও রহমত পাঠাবেন। ইবনে যাবালাহ এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

সামহুদী বলেছেনঃ সম্ভবত রাসূলুল্লাহর (সা) সিজদার স্থানের উপর মসজিদটি নির্মিত হয়েছে।

মসজিদটি বোহাইরী বাগান থেকে উত্তর পূর্বে অবস্থিত যা আবু যার সড়কের গোড়ার ক্রসিং থেকে মাত্র ১৫০ মিটার দূরে। সৌদী শাসনামলে মসজিদটির পুনঃ নির্মাণ করা হয় এবং মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণে দুটো ছোট
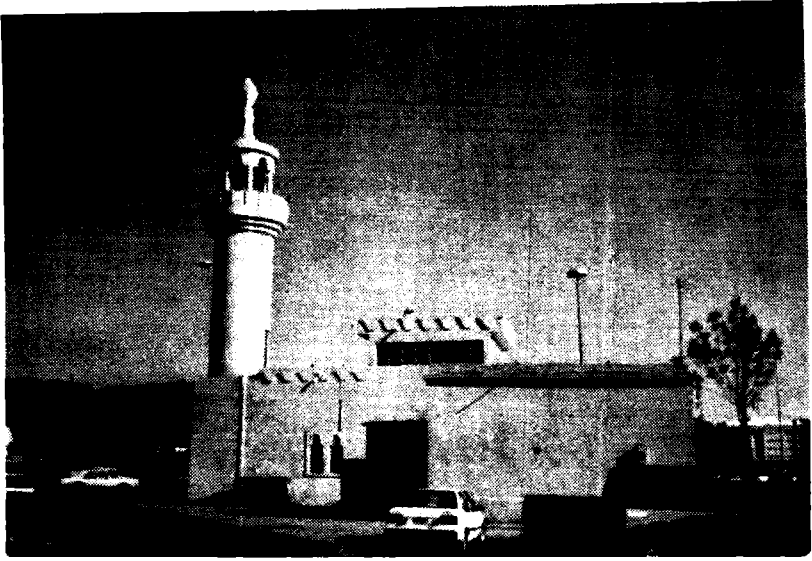
মসজিদে আবু যার

বাগান তৈরী করা হয়। মানাখা ও বাবুশ্শামী থেকে বিমান বন্দর কিংবা আবুযার সড়ক দিয়ে বিমান বন্দর যাওয়ার পথে মসজিদটি রাস্তায় পড়ে। জিবরীল (আ) এর সুসংবাদ ও রাসূলুল্লাহর (সা) দীর্ঘ সিজদার কারণে মসজিদটি মুসলমানদের অন্তরে বিরাট মর্যাদার অধিকারী।

## ১৮. মসজিদ আর রায়াহ বা মসজিদে জোবাব

জোবাব পাহাড়ের উপর রাসূলুল্লাহর (সা) পতাকা রাখার স্থানে এই মসজিদটি অবস্থিত। কোন দিকে যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি এই স্থানে ঝান্ডা দাঁড় করাতেন এবং লোকদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিতেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় তিনি জোবাব পাহাড়ে তাঁবু খাটিয়ে তাতে অবস্থান করেন ও নামায পড়েন।

মারওয়ান বিন হাকাম যখন জোবাব পাহাড়ে ফাঁসিকেন্দ্র বানিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালায়, তখন হযরত আয়েশাহ (রা) মারওয়ানের কাছে লোক পাঠিয়ে বলেন, তুমি অত্যন্ত দুর্ভাগা। যেই পাহাড়ের উপর রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়েছেন সেই পাহাড়কে তুমি ফাঁসি কেন্দ্র বানিয়েছ।
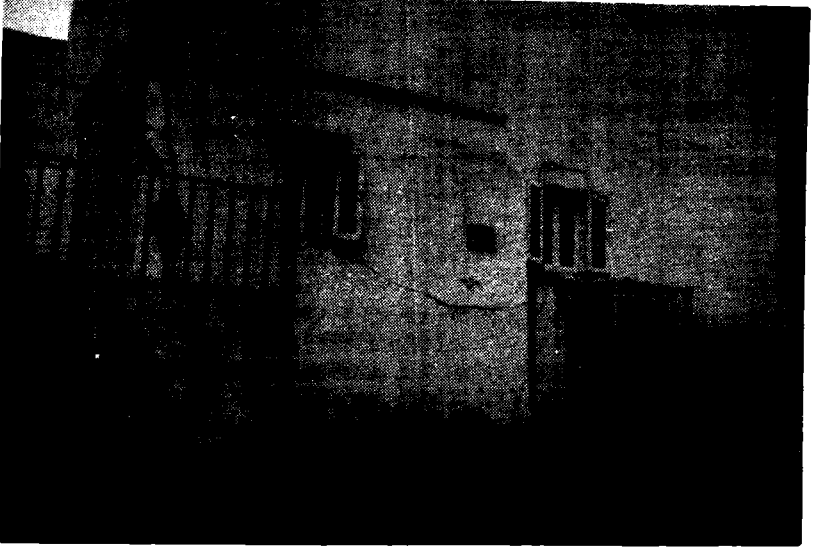
**মদীনার মসজিদ আর-রায়াহ**

তাবরানী তাঁর আল-মো'জাম আল-কবীর গ্রন্থে এক বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জোবাব পাহাড়ে নামায পড়েছেন। আবদুল কুদ্দুস আনসারী লিখেছেন, মসজিদটির দৈর্ঘ ৪ মিটার, প্রস্থ ৪ মিটার ও উচ্চতা ৬ মিটার। কিন্তু সংস্কারের পর আজকাল এর দৈর্ঘ প্রায় ৮ মিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে সাড়ে ৪ মিটার।[৬৮]

রাসূলুল্লাহ (সা) যে সকল মসজিদে নামায পড়েছেন, তার মধ্যে উপরোক্ত ১৮টা এখন পর্যন্ত মওজুদ আছে। তবে আরো ৪৬টি ঐতিহাসিক মসজিদের অধিকাংশগুলোতে তিনি নামায পড়েছেন। মসজিদে দেরার সহ কয়েকটিতে নামায পড়েননি। কিন্তু সে মসজিদগুলো বর্তমানে আর নেই। সেগুলোর বেশীরভাগের অবস্থান স্থল সম্পর্কে জানা যায়। কালের আবর্তনে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলোর সংরক্ষণ করা হয়নি।

এখন আমরা সংক্ষেপে ঐসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

---

৬৮· আছারুল মদীনা আল-মোনাওয়ারাহ।। আবদুল কুদ্দুস আনসারী।

**১. মসজিদে এজাবাহ ঃ**

এর আসল নাম হচ্ছে মসজিদে বনি মোআয়িয়াহ। এটি আওস গোত্রের শাখা। মসজিদটি মদীনার পূর্ব উপকণ্ঠে এবং বাকী গোরস্থানের উত্তরে অবস্থিত। এটি তুর্কীর উসমানী শাসনামলের স্থাপত্য শিল্পের সাক্ষ্য বহন করে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসের সার-সংক্ষেপ হল, রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদে আল্লাহর কাছে ৩টি বিষয়ে প্রার্থনা করেন। এর দু'টো কবুল হয় এবং একটি কবুল হয়নি।

যে দু'টো দোয়া কবুল হয়েছে, সেগুলো হলঃ ১· তাঁর উম্মাহকে পানি দিয়ে ডুবিয়ে না মারা। যেমনটি কাওমে নূহের সর্বগ্রাসী বন্যা ও সাগরে কাওমে ফিরআওনের ভরাডুবির মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল। ২· দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে না মারা।

যে দোয়াটি কবুল হয়নি তা হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে যেন পরস্পর যুদ্ধ সংঘটিত না হয়। 'এজাবাহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, দোয়া কবুল হওয়া। রাসূলুল্লাহর (সা) দোয়া কবুলের কারণে মসজিদটির এই নামকরণ করা হয়েছে।

**২. মসজিদে খন্দক ঃ**

খন্দকের ময়দানে ৭টা এতিহাসিক মসজিদের কথা উল্লেখ থাকলেও বর্তমানে মোট ৬টা মসজিদ আছে। এ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আরেকটা মসজিদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ময়দানের কোন জায়গায় মসজিদটি ছিল, বর্তমানে তা জানার কোন উপায় নেই।

**৩. মসজিদে বনি সায়েদাহ ঃ**

রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর মুসলমানগণ সাকীফাহ বনি সায়েদায় হযরত আবু বকর (রা) এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। এখানে একটি মসজিদ ছিল। ইবনে শেবাহ হযরত আব্বাস বিন সহল থেকে বর্ণনা করেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বনি সায়েদাহ মসজিদে নামায পড়েন।'

এই মসজিদটি সুলতানিয়া ত্রিভুজ নামক স্থানে মসজিদে নবওয়ী থেকে উত্তরে ও সোহায়মী সড়কের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।

**৪. মসজিদে বনি কোরাইজাহ ঃ**

এটি প্রখ্যাত মসজিদে ফাদীখের পূর্বে এবং পূর্ব হাররার কাছে অবস্থিত ছিল। মদীনার গভর্ণর উমার বিন আবদুল আযীয (রা) মসজিদটি নির্মাণ করেন। ইবন নাজ্জার উল্লেখ করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বনি কোরাইজার এক মহিলার ঘরে নামায পড়েন। পরে ঘরটি মসজিদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মসজিদটির দৈর্ঘ ৪৫ গজ ও প্রস্থ একই সমান ছিল।

**৫. মসজিদে মাশরাবা উম্মে ইবরাহীম ঃ**

এই মসজিদটি মসজিদে বনি কোরাইজাহর উত্তরে কাফ নামক স্থানে পূর্ব হাররার কাছে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এতে নামায পড়েছেন। মাশরাবা উম্মে ইবরাহীম রাসূলুল্লাহর (সা) দানকৃত একটি কক্ষের নাম। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মুল মুমেনীন মারিয়া (রা) কে ঐ স্থানে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং এই ঘরেই হযরত মারিয়ার (রা) গর্ভ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ছেলে ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন।

**৬. মসজিদে বাগলাহ ঃ**

এটি আউস গোত্রের বনি জাফর শাখার মসজিদ। এটি বাকী'র পূর্বে এবং পূর্ব হাররার প্রান্তে অবস্থিত। ঐ জায়গায় রাসূলুল্লাহর (সা) খচ্চর বাঁধা হয়েছিল এবং একটি পাথরে তার পায়ের ক্ষুরের চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। ইবনুয্ যোবায়ের উল্লেখ করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে বনি জাফরের পাথরের উপর বসেছিলেন। মসজিদটি বর্গাকৃতির ছিল। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, মুয়া'জ বিন জাবাল এবং আরো কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মসজিদে বনি জাফরে যান।[৬৯]

**৭. মসজিদে মোকাম্মাল ঃ**

আযযোবায়ের ওবায়েদ বিন রাওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নাকী'র মোকাম্মালে যান এবং নামায পড়েন। আমিও তাঁর সাথে নামায পড়েছি।

---

৬৯. ওমদাতুল আখবার ফি মদীনাতিল মোখতার।। শেখ আহমদ বিন আবদুল হামীদ আব্বাসী

**৮. মসজিদে ওহোদ ঃ**

এই মসজিদটি ওহোদ পাহাড়ের ঢালে কিবলার দিকে অবস্থিত। মসজিদের পেছনেই রয়েছে ওহোদ পাহাড়। কথিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ওহোদ যুদ্ধের দিন মসজিদের স্থানে জোহর ও আসরের নামায পড়েছেন।

**৯. মসজিদে জাবাল আইনাইন ঃ**

এটিকে মসজিদে জাবালুর রোমাহও বলা হয়। ওহোদ যুদ্ধের দিন এই পাহাড়ের উপর ৫০ জন মুসলিম তীরন্দাজকে নিয়োগ করা হয়েছিল। হযরত জাবের বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এখানে জোহরের নামায পড়েছেন।

**১০. মসজিদে বাকী ঃ**

এই মসজিদের অপর নাম মসজিদে উবাই বিন কা'ব। রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদে একাধিকবার নামায পড়েছেন। ইয়াহইয়া বিন নদর থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে উবাই বিন কা'বে নামায পড়েছেন। মসজিদটি মদীনার প্রতিরক্ষা দেয়ালের পেছনে 'হা' কূপের কাছে অবস্থিত ছিল। সেখানে বনি হোদায়লাহ গোত্রের বাস ছিল। ঐটিকে মসজিদে বনি হোদায়লাহ বা জোদায়লাহও বলা হয়। মসজিদটি বাকী থেকে বের হওয়ার সময় হাতের ডানে এবং আকীল ও উম্মুহাতিল মুমেনীনের কবরের পশ্চিমে বিদ্যমান ছিল।

**১১. মসজিদে বনি যোরাইক ঃ**

বনি যোরাইক খাযরাজ গোত্রের একটি শাখা। বর্ণিত আছে, উক্ত শাখা গোত্রের রাফে' বিন মালেক আয্যারকী মক্কায় আকাবার বাইয়াতে অংশগ্রহণ করেন। তখন পর্যন্ত মক্কায় যতটুকু কোরআন নাযিল হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ততটুকু কোরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি মদীনায় ফিরে এসে মসজিদে বনি যোরাইকে হিজরাতের পূর্বে তা পাঠ করেন। বনি যোরাইক মহল্লা মদীনার প্রতিরক্ষা দেয়ারের ভেতর ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে যাদুকারী লাবীদ বিন আসেম ইহুদী বনি যোরাইক গোত্রের অধিবাসী ছিল। আর কূপটির নাম ছিল জারওয়ান কূপ। জারওয়ান নামক স্থানে মসজিদটি অবস্থিত ছিল। এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত মসজিদে অজু করেছেন, নামায পড়েননি।

## ১২. মসজিদে জোহাইনাহ ঃ

ইবনে শেবাহ মুআ'জ বিন আবদুল্লাহ বিন আবি মরিয়ম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে জোহাইনায় নামায পড়েছেন।' ইয়াহইয়া বিন নদর আনসারী থেকেও বর্ণিত আছে, 'রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদে নামায পড়েছেন।' এটি সালা' পাহাড়ের পূর্বাংশে অবস্থিত। ঐ অংশকে আ'সআ'স পাহাড়ও বলা হয়। আয–যোবায়ের খারেজা বিন হারেস বিন রাফে বিন মোকাইস জোহানী থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, জোহাইনা গোত্রের বনি রাবআ'হ শাখার এক অসুস্থ সাথী আবু মরিয়মের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ঘরে তাশরীফ আনেন এবং আবু মরিয়মের ঘরে নামায পড়েন। তখন জোহাইনা গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক আবু মরিয়মকে বলল, আপনি যদি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আমাদের জন্য একটি মসজিদের স্থান চিহ্নিত করে দেয়ার আনুরোধ জানাতেন! রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আবু মরিয়ম, তোমার কি চাই? তিনি উত্তরে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি আমার সম্প্রদায়ের জন্য একটি মসজিদের স্থান চিহ্নিত করে দিতেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে জোহাইনার স্থানে যান। সেখানে কিছু তাঁবু ছিল। সে স্থানেই তিনি মসজিদের জায়গা চিহ্নিত করেন এবং সেখানেই মসজিদে জোহাইনা নির্মিত হয়।

## ১৩. মসজিদে বনি খোদরাহ ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে খোদরায় নামায পড়েছেন। খোদরাহ হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রা) আনসারীর বংশ। এই মসজিদটি বোস্‌সা কূপের অদূরে আরেকটি ছোট কূপের কাছে অবস্থিত ছিল। কথিত আছে, বোস্‌সা কূপের মালিক ছিলেন হযরত আবু সাঈদ খুদরীর দাদা।

## ১৪. মসজিদে গাস্‌সালিন ঃ

এটি বনি দীনার বিন নাজ্জার গোত্রের মসজিদ। ইবনে বাক্কার থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সা) গাস্‌সালিনে অবস্থিত বনি দীনার মসজিদে নামায পড়েছেন।' আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদে প্রায়ই নামায পড়তেন।' এই স্থানটি বাতহা উপত্যকার পেছনে অবস্থিত।

**১৫. মসজিদ আল—মানারাতাইন ঃ**

এই মসজিদটি বড় আকীকের রাস্তায়, মানারাতাইনে অবস্থিত ছিল। এই মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়েছেন।

**১৬. মসজিদে বনি হারেসাহ ঃ**

এই মসজিদটি ওহোদ পাহাড়ের কাছে আউস গোত্রের বনি হারেসাহ শাখার বসতির কাছে বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে নামায পড়েছেন।

**১৭. মসজিদে বনি আবদিল আশহাল ঃ**

এটাকে মসজিদে ওয়াকেমও বলা হয়। আবু দাউদ শরীফে হযরত কা'ব কিন আ'জরাহ থেকে বর্ণিত। 'নবী করিম (সা) মসজিদে বনি আবদিল আশহালে মাগরিবের নামায পড়েন।

**১৮. মসজিদে বনি আল—হোবলা ঃ**

এতে রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়েছেন। এটি বাতহা উপত্যকার পূর্বে অবস্থিত ছিল।

**১৯. মসজিদে বনি উমাইয়াহ ঃ**

এটি আ'ওয়ালী এলাকায় অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদে নামায পড়েছেন। হযরত উমার (রা) সেখান থেকে তাঁর প্রতিবেশী আনসারীর সাথে পালাক্রমে একদিন পর পর মসজিদে নবওয়ীতে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে হাজির হতেন।

**২০. মসজিদে নূর ঃ**

এটিকে মসজিদে ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ (সা)ও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এতে নামায পড়েছেন। আল–আস্‌দী বলেছেনঃ মসজিদে নূর দু'টো। একটি কুবার পার্শ্বে এবং অন্যটি মসজিদে নবওয়ীর কাছে। নূর অর্থ আলো। আ'ববাদ বিন বিশ্‌র সহ আরেকজন সাহাবী এক অন্ধকার রাত্রে ইশার নামায পড়ার জন্য মসজিদে নবওয়ীতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেন। ফলে, আল্লাহ উক্ত দু'জন সাহাবীকে নূর উপহার দেন। উভয় সাহাবী ঘরের দিকে রওনা দেন। একজনের হাতে ছিল লাঠি। তা অন্ধকারে মোমের মত আলো দান করে। অপরজনেরও নূর ভেসে উঠে এবং অন্ধকারে পথ চলতে কোন অসুবিধে

হয়নি। তাদের নিজ নিজ এলাকার দু'টো মসজিদ মসজিদে নূর হিসেবে পরিচিত।

### ২১. মসজিদে দারে সা'দ বিন খায়সামাহ ঃ

মসজিদে দারে সা'দ বিন খায়সামাহ কুবায় অবস্থিত ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়েছেন ও বসেছেন। সা'দ বিন খায়সামার ঘর মসজিদে কুবার সামনেছিল।

### ২২. মসজিদে তাওবাহঃ

এটি মসজিদে কুবার পশ্চিমে আসবাহ নামক স্থানে হোজাইম কূপের কাছে অবস্থিত ছিল। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে নামায পড়েছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনা আগমনের আগে এতে প্রথম মুসলিম মুহাজিরদের ইমামতি করেন আবু হোজাইফার গোলাম সালেম। তিনি সর্বাধিক ভাল কোরআন পড়া জানতেন।

### ২৩. মসজিদে বনি ওনাইফ ঃ

এটি কুবার পশ্চিমে ওনাইফ গোত্রের মসজিদ ছিল। ওনাইফ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বলেছেন, তাদের ঘরের কাছে হযরত তালহা বিন আল-বারার ঘরে তাঁর অসুখের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাঁকে দেখতে যান তখন এই মসজিদে নামায পড়েন।

### ২৪. মসজিদে শেখান ঃ

এটিকে মসজিদে আল-বাদায়ে'ও বলা হয়। শেখান হচ্ছে মদীনা ও ওহোদ পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। ওহোদ যুদ্ধের আগের রাত, রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে রাত্রি যাপন করেন। এখানেই তিনি যুদ্ধের জন্য সৈনিক বাছাই করেন ও কাউকে কাউকে ফেরত পাঠান। একাধিক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সেখানে আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামায পড়েন। কেউ কেউ বলেছেনঃ 'তিনি ওহোদের কাছে ফজরের নামায পড়েছেন। শেখান অর্থ দু'জন বৃদ্ধ। বর্ণিত আছে যে, একজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সেখানে কথা-বার্তা বলতেন। সেজন্য এর 'শেখান' নামকরণ করা হয়েছে।

**২৫. মসজিদে ফিফা আল—খায়ার ঃ**

ইবনে ইসহাক বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ওশায়রাহ যুদ্ধে যাওয়ার পথে বনি দীনার হয়ে ফিফা আল-খায়ারে বাতহার এক গাছের নীচে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি নামায পড়েন ও সাথীদের নিয়ে খানা খান। এটি আকীক উপত্যকার পশ্চিমে একটি সমতলভূমি। এই জায়গায় রাসূলুল্লাহর (সা) যাকাতের উট চরানো হত।

**২৬. জাসজাসা শেদাদ কূপের মধ্যবর্তী মসজিদ ঃ**

এই মসজিদটি আকীক উপত্যকার শেষ প্রান্তে নাকী' নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। ইবনে যাবালাহ উমার বিন কাসেম থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদে নামায পড়েছেন।

**২৭. মসজিদে ইতবান বিন মালেক ঃ**

ইতবান বিন মালেক খাযরাজ গোত্রের একজন প্রখ্যাত আনসার প্রতিনিধি ছিলেন। ইবনে যাবালাহ ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। 'ইতবান বিন মালেক বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বন্যার কারণে আমি আমার সম্প্রদায়ের মসজিদে যেতে পারিনা। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ঘরে নামায পড়েন। তিনি তাঁর ঘরে এশরাক/ চাশতের নামায পড়েন এবং তারা সবাই তাঁর পিছে দাঁড়িয়ে জামাতে উক্ত নামায আদায় করেন।

**২৮. মসজিদে বনি ওয়ায়েল ঃ**

মাতারী বলেছেন, এই মসজিদটি কুবায় মসজিদে শামসের পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদে নামায পড়েন।

**২৯. মসজিদে বনি খাতমাহ ঃ**

ইবনে শেবাহ হিশাম বিন ওরওয়াহ এবং আবদুল্লাহ বিন হারেস থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে বনি খাতমায় নামায পড়েছেন। মাতারীর মতে, আওয়ালীতে মসজিদে শামসের পূর্বে এই মসজিদটি অবস্থিত। এখানে অবস্থিত মসজিদে আজুজ নামক অন্য আরেকটি মসজিদেও তিনি নামায পড়েন।

### ৩০. মসজিদে বনি বায়াদাহ ঃ

ইবনে শেবাহ সাঈদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম (সা) তাদের মসজিদে নামায পড়েন। ইবনে যাবালাহ সা'দ থেকে বর্ণনা করেন। 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 'এই রাত্রে বনি সালেম ও বনি বায়াদাহর উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়েছে।' এটি মসজিদ কুবার পশ্চিমে মসজিদে তাওবাহ ও মসজিদে বনি সালেমের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

### ৩১. মসজিদে কারসাহ ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের বাড়ী যেতেন এবং তাদের মসজিদে নামায পড়তেন। অনুরূপভাবে তিনি মসজিদে কারসায় নামায পড়েন। এটি পূর্ব হাররার শেষ প্রান্তে উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

### ৩২. মসজিদে আল—খারবাহ ঃ

এটি সালামাহ গোত্রের বনি ওবায়েদ শাখার মসজিদ ছিল। ঐ গোত্রটি বনি ওবায়েদ পাহাড় ও বনি হারাম –এর পশ্চিমে বোজাইনা পাহাড়ের কাছে বাস করত। নবী করিম (সা) উক্ত মসজিদে বহুবার নামায পড়েছেন। তিনি সেখানে সোলাফাহ উম্মে বিশর বিন মা'রুরের কাছে যেতেন। এই মসজিদটি সালা' পাহাড়ে মসজিদে ফাতহের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল।

### ৩৩. মসজিদে বনি মাযেন বিন নাজ্জার ঃ

ইবনে যাবালাহ ইয়াকুব বিন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) মসজিদে বনি মাযেনের সীমানা এঁকে দেন। তবে তিনি তাতে নামায পড়েননি। তিনি বনি মাযেনের উম্মে বারাদাহর ঘরে নামায পড়েছেন। সামহুদী বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) ছেলে ইবরাহীমের দুধ মা ছিলেন উম্মে বারাদাহ। ইবরাহীম তাঁর ঘরেই মৃত্যু বরণ করেন এবং নবী (সা) তাঁর ঘরেই ইবরাহীমের মৃত্যুর সময় হাজির হন। বনি মাযেনের বাড়ী বনি যোরাইকের বাড়ীর কাছে ছিল।

### ৩৪. মসজিদে বাকী' আয্—যোবায়ের ঃ

এটি বনি গণমের পার্শ্বে এবং বনি যোরাইকের পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। ইবনে যাবালাহ আ'তা বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) মসজিদে বাকী'–আয্–যোবায়েরে চাশতের ৮ রাকাত নামায পড়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল' আপনি তো এর আগে এই নামায

পড়েননি? তখন তিনি উত্তর দেন যে, 'এটি ভয় ও আশার নামায, তোমরা এই নামায ছেড়ে দিওনা।'

### ৩৫. মসজিদে সাদাকাতুয যোবায়ের ঃ

ইবনে যাবালাহ ও ইবনে শেবাহ হিশাম বিন ওরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বনি হাম্মামের সাদকাতুয যোবায়েরে নামায পড়েন। এটি মাশরাবা উম্মে ইবরাহীমের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

### ৩৬. মসজিদে বনি হারেস ঃ

ইবনে যাবালাহ ও ইবনে শেবাহ হিশাম বিন ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এতে নামায পড়েছেন। এটি পূর্ব বাতহায় অবস্থিত ছিল।

### ৩৭. মসজিদে আস্—সানিয়াহ ঃ

এটি মসজিদে জাবালে ওহোদ সংলগ্ন। কথিত আছে, এখানেই রাসূলুল্লাহর (সা) দাঁত শহীদ হয়েছিল।

### ৩৮. মসজিদে বনি হারাম ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদে নামায পড়েছেন। এই মসজিদটি পশ্চিম সালা' পাহাড় এবং পূর্ব বাতহা উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। ঐ মসজিদ পার হয়েই কাহাফ বনি হারাম বা বনি হারাম গুহায় যেতে হত।

### ৩৯. মসজিদে দারুন নাবেগাহ ঃ

এটি মসজিদে জোহাইনার কাছে ও সোলাই পাহাড়ের পাশে অবস্থিত ছিল। এর অপর নাম হচ্ছে, শামী মসজিদে বনি দীনার। রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদে নামায পড়েছেন। ইবনে শেবাহ উল্লেখ করেছেন, বনি নাজ্জার গোত্রের দারুন নাবেগায় রাসূলুল্লাহর (সা) পিতা আবদুল্লাহর কবর রয়েছে।

### ৪০. মসজিদে বনি ওয়াকেফ ঃ

এটি আওয়ালীতে মসজিদে ফাদীখের সামনে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এতে নামায পড়েছেন। আউস গোত্রের ওয়াকেফ শাখা এখানে বাস করত। হেলাল বিন উমাইয়া এই গোত্রের লোক ছিলেন, যিনি তাবুক যুদ্ধে পিছিয়ে থাকা তিনজনের একজন, যাদের তাওবাহ আল্লাহ কবুল করেছেন।

**৪১. মসজিদে দেরার ঃ**

এটি কুবায় মুসলিম নামধারী মুনাফেক ইহুদীদের তৈরী একটি মসজিদ। মসজিদে কুবার বিরোধিতা করে ইহুদীরা এই মসজিদটি তৈরী করে। রাসূলুল্লাহ (সা) রোম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাবুকে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার সময় ঐ মসজিদ নির্মাতারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে তাদের মসজিদে নামায পড়ার আমন্ত্রন জানায় এবং বলে, আমরা অসুস্থ লোক, রাতের অন্ধকার, বৃষ্টি ও শীতের সময় নামায পড়ার উদ্দেশ্যে এই মসজিদটি তৈরী করেছি। তিনি বলেন এখন যুদ্ধের প্রস্তুতি হচ্ছে। আমি ফিরে এসে ঐ মসজিদে নামায পড়বো। কিন্তু তাবুক থেকে ফেরার পথে তিনি মসজিদ নির্মাতাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহর কাছ থেকে ওহী লাভ করেন। তখন তিনি মালেক বিন দাখসাম ও মাআ'ন বিন আদীকে তা ধ্বংস করার জন্য পাঠান। তাঁরা তা ধ্বংস করে দেন।

এছাড়াও নিম্নলিখিত মসজিদগুলোতেও রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়েছেনঃ

**৪২. মসজিদে আল–কাবীহ**

**৪৩. মসজিদে আল–মায়েদাহ**

**৪৪. মসজিদে বনি উমার বিন মাবজুল**

**৪৫. মসজিদে মোসাইয়েব ও**

**৪৬. মসজিদে রাতেজ।**

এখানে মোট ৬৪টি মসজিদের আলোচনা করা হল।

মক্কায় আসা–যাওয়া এবং বিভিন্ন যুদ্ধে যাওয়ার সময় নবী (সা) নিম্নোক্ত মসজিদগুলোতেনামাযপড়েছেন।

১· জুল হোলাইফার মসজিদে মীকাত।

২· মসজিদে মা'রাস। পূর্বোল্লেখিত মসজিদের কিছু সামনে তা অবস্থিত।

৩· মসজিদ ওয়াদী রাওহা। এই উপত্যকার অন্য নাম হচ্ছে, ওয়াদী বনি সালেম। মক্কায় যাওয়ার পথে হাতের ডানে এবং মদীনা আসার পথে হাতের বামে পড়ে। মসজিদের সামনে অনেক কবর ছিল। বর্তমানে সেগুলোর অস্তিত্ব নেই। মদীনা থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে ৩৬–৪০ মাইল।

৪· মসজিদে আ'রাক আজ-জাবিয়াহঃ রাওহা উপত্যকা থেকে ৯ মাইল দক্ষিণে এই মসজিদটি অবস্থিত ছিল। বদরে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে পরামর্শ করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) আ'রাক জাবিয়া হতে ফজরের নামায পড়েছেন।[৭০]

৫· মসজিদ আল-মোনসারেফঃ মক্কা যাওয়ার সময় হাতের বামে পাহাড়ের পাশে এবং রাওহা উপত্যকার শেষ সীমানায় বিদ্যমান ছিল। আল-আসাদী বলেছেনঃ রাওহা উপত্যকা থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে তিন মাইল।

৬· রাবেগের দু'টো মসজিদঃ রাবেগ থেকে তিন মাইল দূরে হাতের বামে হেজাউল আইনে একটি মসজিদ এবং ৪ মাইল দূরে গাদীর খোমে আরেকটি মসজিদ অবস্থিত। দুই মসজিদেই রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়েছেন। তবে শেষোক্ত মসজিদে তিনি এক গাছের নীচে জোহরের নামায পড়েন।

৭· মসজিদে খোলাইসঃ আল-আসাদী বলেছেন, খোলাইসে একটি মসজিদে রাসূল আছে, যেখানে তিনি নামায পড়েছেন।

৮· মসজিদে বদরঃ বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) তাঁবুর স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। সেটিই মসজিদে বদর নামে পরিচিত। মসজিদের কাছেই একটি কূপ আছে।

৯· ইয়াম্বু মসজিদঃ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াম্বুতে অবস্থিত উক্ত মসজিদে নামায পড়েছেন।

---

৭০· ওমদাতুল আখবার ফি মদীনাতিল মোখতার।। শেখ আহমদ বিন আবদুল হামীদ আব্বাসী।

এর আসল নাম হচ্ছে বাকী' আল গারকাদ। গারকাদ শব্দের অর্থ- কাঁটাযুক্ত গাছ। এই জায়গায় কাঁটার গাছ ছিল। পরে তা কেটে ফেলা হয়েছে এবং জায়গার সাবেক নামই বহাল রয়েছে। এটি মদীনার কবরস্থান। এর অপর নাম হচ্ছে কাপতাহ। এর অর্থ হচ্ছে হেফাজত করা। গোরস্থান যেহেতু মুর্দাদের হেফাজতের জায়গা, তাই এটাকে কাপতাহ বলে।
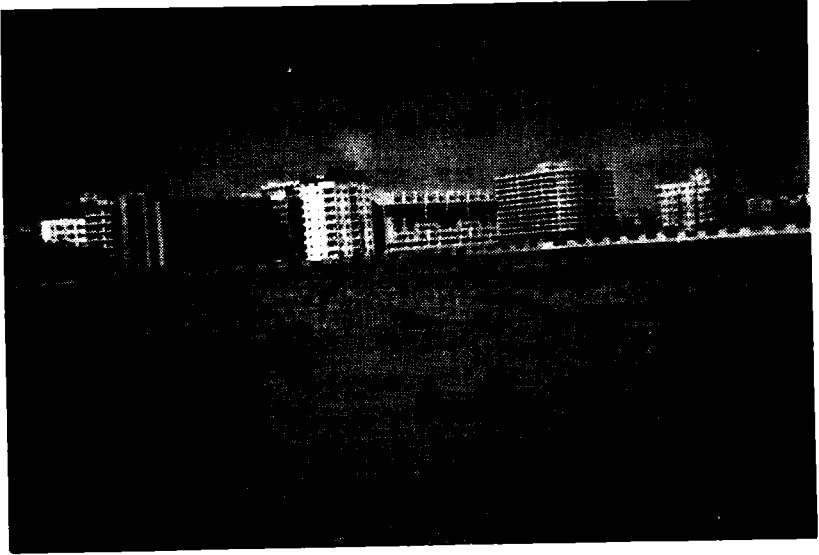
বাকী' গোরস্থান

## ফজীলত

এই গোরস্থানের ফজীলত অনেক। মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি আমার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘটনা বর্ণনা করবোনা? যে রাতে আমার সাথে তাঁর থাকার পালা, সে রাতের ঘটনা। তিনি চাদর খুলে রাখলেন। পায়ের কাছে জুতাও খুলে রাখলেন। লুঙ্গীর এক অংশ বিছিয়ে তাতে শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর তিনি ভাবলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তখন তিনি ধীরে ধীরে চাদর নেন, আস্তে আস্তে জুতা পরেন, দরজা খোলেন

এবং তা বন্ধ করেন। আমি জামা ও ইযার পরে ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে তাঁর পিছু পিছু রওনা দিই। তিনি বাকী গোরস্থানে যান এবং সেখানে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেন। তিনি তিনবার আল্লাহর কাছে হাত তোলেন। তারপর ফিরে আসেন। আমিও ফিরে আসি। তিনি খুব দ্রুত আসেন, আমিও দ্রুত আসি। তিনি ঘরে আসেন, আমিও ঘরে আসি। আমি তাঁর আগে পৌঁছি এবং শুয়ে পড়ি। তিনি ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করেন, কি হে আয়েশা! তোমার দীর্ঘ ও ক্লান্ত শ্বাস-প্রশ্বাস কেন? আয়েশা জবাবে বলেন, কই, কিছুনা। তখন তিনি বলেন, হয় তুমি আমাকে বলবে, অথবা সর্বজ্ঞ আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দেবেন। আয়েশা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাবা আপনার জন্য কোরবান হউক। তারপর আমি তাঁকে বললাম। তিনি প্রশ্ন করেন, তুমি কি সেই অন্ধকার যা আমি আমার সামনে দেখেছি? আমি বললাম, হাঁ। আমার অন্তরে তখন একটি কম্পন অনুভব করি যা আমাকে ব্যথা দিয়েছে। তারপর তিনি বলেনঃ তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর জুলুম করেছে? আয়েশা বলেন, ' মানুষ যতই গোপন করুক, আল্লাহ তা জানেন। তিনি বলেন, হাঁ। তুমি যখন দেখেছ তখন জিবরীল (আ) আমাকে ডেকেছেন। তিনি তোমার কাছ থেকে গোপন ছিলেন। আমি জবাব দিই এবং তাও তোমার কাছে গোপন রাখি। তিনি তোমার ঘরে প্রবেশ করতে চাননি। কেননা, তখন তুমি শোয়ার পোশাকে ছিলে। আমি ভেবেছি, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই তোমাকে জাগানো পসন্দ করিনি। আমি আশংকা করেছিলাম যে, তোমার কাছে তা অদ্ভুত মনে হবে। যাক, জিবরীল বলেন, (হে নবী!) আপনার রব আপনাকে বাকী' গোরস্থানে গিয়ে সেখানকার মৃত ব্যক্তিদের গুণাহ মাফ চাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারপর আয়েশা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাদের জন্য কিভাবে দোয়া করবো? তিনি বলেন, তুমি বলবে,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ يَرْحَمُ اللّٰهُ

الْمُسْتَقْدِمِيْنَ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ

অর্থঃ হে কবরবাসী মুমিন মুসলমানগণ, আপনাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক। আল্লাহ আগের ও পরের সকল মুর্দাদের উপর রহম করুন।

ইনশাআল্লাহ, আমরাও আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো।

মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যে রাতে আমার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) পালা আসত, তখনই তিনি শেষ রাত্রে বাকী গোরস্থানে চলে যেতেন এবং বলতেন, 'হে কবরবাসী মুমিনগণ, তোমাদের প্রতিশ্রুত জিনিস আগামী কাল, পেয়ে যাবে। আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবো। হে আল্লাহ, বাকী' আল-গারকাদের অধিবাসীদের মাফ করুন।'

হযরত ইবনে আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনাবাসীদের গোরস্থান অতিক্রম করেন এবং তাদের কবরের দিকে মুখ করে দোয়া করেনঃ 'হে কবরবাসীরা, তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক। আল্লাহ আমাদেরকেএবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের আগে পৌছে গেছ। আমরা তোমাদের পরে আসছি। (তিরমিযী)

উম্মে কায়েস বিনতে মোহসেন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নিয়ে বাকী কবরস্থানে পৌছে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি এই কবরস্থানটি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ এখান থেকে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল সত্তর হাজার লোককে উঠাবেন যারা বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। বাকী' গোরস্থান আকাশবাসীদেরকে আলো দান করবে যেমন করে সূর্য দুনিয়াবাসীদেরকে আলো দানকরে।

আয্যোবায়ের হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 'আল্লাহ কাপতাহ নামক এই গোরস্থান থেকে এক লাখ লোককে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল করে উঠাবেন যারা নিজেরা ঝাড়-ফুঁক করেনি বা কারুর কাছে তা চায়নি।' এখানে ঝাড়-ফাঁক বলতে ইসলাম বিরোধী মন্ত্র বা শব্দ দিয়ে ঝাঁক-ফুঁক করা বুঝানো হয়েছে। কোরআনের আয়াত কিংবা কোন দোয়া পড়ে ঝাড়-ফুঁক করার কথা হাদীসে উল্লেখ আছে।

## অবস্থান ও সম্প্রসারণ

বাকী' আল-গারকাদ গোরস্থান মদীনা শহরের পূর্বাংশে এবং সম্প্রসারিত বৃহত্তর মসজিদে নবওয়ীর পূর্বদিকে অবস্থিত। গোরস্থানের দক্ষিণে রয়েছে লাশ গোসল ভবন (শারগুরা) এবং পুলিশ কেন্দ্র। গোরস্থানের পশ্চিমে ও মসজিদে

নবওয়ীর মাঝে রয়েছে আবুযার মসজিদ অভিমুখী রাস্তা যা অন্যদিকে আ'ওয়ালী সড়কের সাথে গিয়ে মিশেছে।

বনি উমাইয়া শাসনামলে সর্বপ্রথম বাকী' গোরস্থানের সম্প্রসারণ করা হয়। 'খোলাসাতুল ওয়াফা' বইতে উল্লেখ আছে, হযরত উসমান (রা) কে যখন শহীদ করা হয়, তখন লোকেরা তাঁকে হুজরাহ শরীফে দাফন করতে চেয়েছিল। মৃত্যুর আগেই তিনি হযরত আয়েশার (রা) কাছ থেকে হুজরাহ শরীফে নিজের কবরের অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু মিসরীয়রা বাধা দিয়ে বলল, হুজরায় দাফন করলে আমরা তাঁর জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করবোনা।

যোহরী বলেন, যুবায়ের বিন মোতয়ে'ম, হাকীম বিন হে'যাম ও আবদুল্লাহ বিন আয্ -যোবায়ের অন্যান্যদের সাথে হযরত উসমানের লাশ নিয়ে বাকী' কবর স্থানে পৌছেন। কিন্তু ইবনে কাহরাহ সেখানে তাঁকে দাফন করতে বাধা দেন। তার অপর নাম হচ্ছে, ইবনে নাজদাহ আস্-সায়েদী। তখন তারা হোস কাওকাব নামক একটি বাগানে তাঁর লাশ নিয়ে যান এবং সেখানে দাফন করেন। হাকীম বিন হে'যামের বর্ণনা অনুযায়ী বনু উমাইয়াহ শাসনামলে হোস-কাওকাবকে বাকী-আল-গারকাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তাবাকাতে ইবনে সা'দে মালেক বিন আবি আ'মের থেকে বর্ণিত। তখন থেকে লোকেরা নিজেদের মৃত ব্যক্তিদের লাশ হোস কাওকাবে দাফন করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে।

এরপরও কয়েকবার বাকী' আল-গারকাদের সংস্কার সম্প্রসারণ করা হয়। এ পর্যায়ে এর দৈর্ঘ ১৫০ মিটার এবং প্রস্থ ১০০ মিটারে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে তা আরো বাড়ানো হয়। ফলে এর আয়তন দাঁড়ায় ৪৮ হাজার ৮১২ বর্গমিটার।

বাকী' আল গারকাদের উত্তরাংশে রয়েছে বাকী' আল আ'ম্মাত। বাকী আল আম্মাতের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে দু'টো কবর আছে। একটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু সফিয়াহ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সফিয়ার বোন আ'তেকাহর কবর। বাকী আল আম্মাত অর্থ হচ্ছে বাকী গোরস্থানে ফুফুদের কবর। নবীর (সা) ফুফুদের কবরের কারণেই এর এই নামকরণ করা হয়েছে। লোকেরা বাকী আল আম্মাতে লাশ দাফন না করে বাকী আল গারকাদেই লাশ দাফন করত। বাকী আল-আম্মাতের আয়তন হচ্ছে ৩৪৯৩ বর্গ মিটার। সৌদী সরকার বাকী আল

আম্মাতকে বাকী আল গারকাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। পূর্বে বাকী আল আম্মাত এবং বাকী আল গারকাদের মাঝে পূর্ব হাররাহ গামী একটা রাস্তা ছিল। এর আয়তন ছিল ৮২৪ বর্গমিটার। ১৩৭৩ হিঃ (১৯৫৩ খৃঃ) উক্তর রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে তাও বাকী আল গারকাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়।

এছাড়াও বাকী গোরস্থানের উত্তরে একটি ত্রিভূজ আকৃতির ভূখন্ড ছিল। এর আয়তন ছিল ১৬১২ বর্গমিটার। এর তিনদিক অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে ছিল বাকী আল গারকাদ গোরস্থান। ১৩৮৫ হিঃ (১৯৬৫ খৃঃ) তাও বাকী আল-গারকাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়।

এই নিয়ে সৌদী সরকারের আমলে মোট ৫,৯২৯ বর্গমিটার এলাকা বাকী আল-গারকাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে বাকী আল গারকাদের মোট আয়তন দাঁড়ায় ৫৪ হাজার ৭৪১ বর্গমিটার। বর্তমানে পূর্বদিকে তা সম্প্রসারণের চিন্তা-ভাবনাচলছে।

বৃষ্টির দিনে গোরস্থানে চলাফেরার অসুবিধে দূর করার লক্ষ্যে দেড় মিটার চওড়া অনেকগুলো পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তাগুরোর মোট দৈর্ঘ ৯৫০ মিটার। গোরস্থানের মোট ৪টি গেইট আছে। ২টি পশ্চিম দিকে এবং ২টি উত্তরদিকে।

## বাকী আল গারকাদে যাদেরকে দাফন করা হয়েছে

রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের আগে ও পরে এই গোরস্থানে বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের সদস্যদেরকে দাফন করা হয়েছে।

কাদী আ'য়াদ তাঁর মাদারেক গ্রন্থে মালেক থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহর (সা) ১০ হাজার সাহাবীর কবর বাকী আল গারকাদে রয়েছে। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম অন্যান্য শহর ও দেশে মৃত্যু বরণ করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) আনসার সাহাবীদের মধ্যে আসআ'দ বিন যারারাহ (রা) কে সর্বপ্রথম বাকী আল গারকাদ কবরস্থানে দাফন করা হয়। আর মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম দাফন করা হয় হযরত উসমান বিন মাজউ'ন (রা) কে।

বাকী গোরস্থানে কারো কবরের সঠিক অবস্থান জানা নেই। তবে কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক যা উল্লেখ করেছেন এবং লোকদের নিকট বিশেষ যে সকল

কবর প্রসিদ্ধ রয়েছে, আমরা এখন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।[৭১] এই আলোচনায় গোরস্থানের দক্ষিণ–পশ্চিম দিক থেকে প্রবেশের সময় কবরের ক্রমধারা অনুসরণ করা হয়েছে।[৭২]

### আকীল বিন আবি তালেব ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের কবর ঃ

দক্ষিণ–পশ্চিম গেইট থেকে ৪০ মিটার দূরে ভেতরে সরু পাকা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে এই কবরগুলো সামনে পড়বে। ১· আকীল বিন আবি তালেব, ২· সুফিয়ান বিন আল–হারেস বিন আবি তালেব, ৩· আবদুল্লাহ বিন জা'ফর আত–তাইয়ার (রা)।

### রাসূলুল্লাহ (সা) এর স্ত্রীদের কবর ঃ

আকীল বিন আবি তালেবের কবর থেকে একই রাস্তায় হাতের বামে অর্থাৎ আকীলের দক্ষিণে রয়েছেঃ ১ঃ হযরত আয়েশা (রা) ২· সাওদাহ বিনতে যামআ'হ ৩· হাফসাহ বিনতে উমার ৪· যয়নাব বিনতে খোযাইমাহ ৫· উম্মে সালামাহ বিনতে আবি' উমাইয়াহ ৬· জোয়াইরিয়াহ বিনতে আল হারেস ৭· উম্মে হাবীবাহ রামলাহ বিনতে আবি সুফিয়ান ও ৮· সাফিয়াহ বিনতে হুয়াইহ বিন আখতাবের (রা) কবর।

তবে রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী খাদীজাহ বিনতে খোয়াইলাদকে মক্কার মোআল্লাহ গোরস্থান এবঙ মায়মুনাহ বিনতে হারেসকে মক্কার সারেফ উপত্যকায় দাফন করা হয়।

### রাসূলুল্লাহ (সা) মেয়ে সন্তানদের কবর ঃ

রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের কবর থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ১০ মিটার দূরে রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা ১· উম্মে কুলসুম ২· রুকাইয়া ও ৩· যয়নাবের (রা) কবররয়েছে।

### রাসূলুল্লাহর (সা) আত্মীয় স্বজনের কবর ঃ

রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যাদের কবর থেকে দক্ষিণ–পূর্বদিকে ২৫ মিটার দূরে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের কবর রয়েছেঃ

---

৭১· ফুসুল মিন তারীখ–আল–মদীনা।। আলী হাফেজ।

৭২· ফুসুল মিন তারীখ আলমদীনা।। আলী হাফেজ

১· রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব।

২· হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব।

৩· ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ (সা) (কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিকদের মতে)

৪· মুহাম্মাদ বিন বাকের বিন যয়নুল আবেদীন।

৫· যয়নুল আবেদীন বিন হোসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব।

৬· জাফর সাদেক বিন মুহাম্মাদ বাকের।

৭· হুসাইন বিন আলী বিন আবি তালিবের মাথা। সামহুদী ওয়াফা আল-ওয়াফা বইতে উল্লেখ করেছেন, ইবনে সা'দের মতে, ইয়াযিদ বিন মুআওয়িয়াহ মদীনার গভর্ণর উমার বিন সা'দ বিন আল-আ'সের কাছে হোসাইনের মাথা পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে হুসাইনের মাথা হযরত ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদের কবরের কাছে দাফন করে।

৮· আলী বিন আবি তালিব। সামহুদী ওয়াফা আল-ওয়াফায় লিখেছেন যে, যোবাইর বিন বাক্কার শোরাইক বিন আবদুল্লাহ, তিনি আবি রাওক থেকে বর্ণনা করেন, হাসান বিন আলী নিজ পিতার লাশ বাকী কবরস্থানে দাফন করেছেন।

**আনাস বিন মালেকের কবর ঃ**

বাকী গোরস্থানের গেইটের ৫০ মিটার পূর্বে ও আকীল বিন আবি তালিবের কবর থেকে পূর্ব-উত্তর দিকে দু'টো কবর আছে। ১টি হচ্ছে ইমাম মালেক বিন আনাস এবং ২য়টি হচ্ছে ইমাম মালেকের পন্ডিত শিক্ষক উমারের দাস নাফে'র কবর। নাফে' ছিলেন কারী শ্রেষ্ঠ।

**উসমান বিন মাজউনের কবর ঃ**

ইমাম মালেক বিন আনাসের কবর থেকে ২০ মিটার দূরে বামের সরু পাকা রাস্তার উপর দাঁড়ালে হাতের ডানে এই কবরগুলো পাওয়া যাবেঃ

১· উসমান বিন মাজউ'ন (রা)। ২· ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ (সা)। ইব্রাহীমের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হল, ইবরাহীমের কবর কোথায় হবে? তিনি উত্তরে বলেন, আমাদের অগ্রগামী উসমান বিন মাজউনের কবরের পার্শ্বে। ৩· আবদুর রহমান বিন আউফ, ৪· সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস। ৫· সাদ বিন যারারাহ ৬· খোনাইস বিন হোজাফাহ আস-সাহমী। ৭· ফাতিমা

বিনতে আসাদ। ঐতিহাসিকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক মত হচ্ছে, তিনি ছিলেন হযরত আলীর (রা) মা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কবর খোঁড়ার নির্দেশ দেন এবং নিজেও তাতে অংশ নেন। তারপর তিনি কবরে শুয়ে পড়েন এবং কোরআনের আয়াত পড়েন ও দোয়া করেন। তিনি বলেন কবরের চাপ থেকে ফাতিমা বিনতে আসাদ ছাড়া আর কেউ মুক্তি পাবেনা।

**পূর্ব হাররার শহীদানের কবর ঃ**

উসমান বিন মাজউনের কবর থেকে ৭৫ মিটার দূরে, বাম দিকের রাস্তার উপর দাঁড়ালে, ইয়াযীদ বিন মুআ'ওয়িয়াহর আমলে মদীনা প্রতিরক্ষার কারণে ইয়াযীদ বাহিনীর হাতে পূর্ব হাররার শহীদানের কবর পড়ে।

**৩য় খলীফাহ হযরত উসমানের (রা) কবর ঃ**

বাকী'র শেষ প্রান্তে পূর্ব হাররার শহীদানের কবর থেকে ১৩৫ মিটার দূরে হযরত উসমানের কবর। ডান দিকের রাস্তা দিয়ে সেই কবরে যেতে হয়।

**সাদ বিন মুআজ ও ফাতিমাহ বিনতে আসাদের কবর ঃ**

হযরত উসমানের কবরের উত্তরে এবং বাকীর সর্বশেষ উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে ৫০ মিটার দূরে এই দু'টো কবর অবস্থিত। অন্য ঐতিহাসিকদের মতে, ফাতিমাহর কবর উসমান বিন মাজউনের কবরের নিকট বিদ্যমান।

**রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু সফিয়ার কবর ঃ**

বাকী গোরস্থানের উত্তর-পশ্চিম গেইট থেকে ১৫ মিটার দূরে দুটো কবর আছে। ১টি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু সফিয়াহ বিনতে আবদুল মুত্তালিবের কবর। এটি প্রথমে বাকী গোরস্থান থেকে পৃথক ছিল। বর্তমানে তা বাকী কবরস্থানের অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আতেকাহ বিনতে আবদল মুত্তালিবের কবর। আতেকাহর ইসলাম গ্রহন ও হিজরাতের ব্যাপারে মতভেদ আছে।

# বাকী গোরস্থানের কবর পরিচিতির ম্যাপ

১· ফাতিমা (রা) ও আত্মীয় স্বজন

২· রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা সন্তানগণ

৩· রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীগণ

৪· আকীল বিন আবিতালিব, সুফিয়ান ও জাফর তাইয়ার

৫· মালেক বিন আনাস

৬· কারী শ্রেষ্ঠ নাফে

৭· ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ও উসমান বিন মাজউন

৮· পূর্ব হাররার শহীদান

৯· উসমান (রা)

১০· ফাতিমা বিনতে উসাইদ ও সাদ বিন মুআজ

১১· আবু সাঈদ আল–খুদরী

১২· রাসূলুল্লাহ (সা) এর ফুফু সফিয়াহ
১৩· কবর খননকারীদের কক্ষ
১৪· মসজিদে উবাই বিন কাব
১৫· ইসমাঈল এর কবর
১৬· বাকী গোরস্থানের গেইট

## বাকী গোরস্থানের বাইরে কিছু সাহাবা ও আহলে বাইতের কবর

### ইসমাইল বিন জা'ফর সাদেক ঃ

তাঁর কবর হচ্ছে হাররাতুল আগওয়াতের দক্ষিণ-পূর্বাংশে। এটি বাকী গোরস্থান থেকে আবুযার সড়ক ও মসজিদে নবওয়ী মুখী একটি রাস্তা দ্বারা বিভক্ত। বাকী গোরস্থান থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে মাত্র ১৫ মিটার এবং এটুকু হচ্ছে রাস্তার প্রশস্ততা। কবরটির ৪ দিকে ৩ মিটার উঁচু দেয়াল রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে, ঐ জায়গাটুকু যয়নুল আবেদীন বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবু তালিবের সম্পত্তি।

### হযরত আবু সাঈদ আল—খুদরীর কবর ঃ

তাঁর কবর হচ্ছে বাকী গোরস্থানের উত্তর-পূর্বদিকে বাইরে পূর্ব হাররাহ গামী রাস্তার পার্শ্বে। তিনি নিজ জীবদ্দশায় ঐ স্থানেই নিজের কবরের স্থান পসন্দ করেগিয়েছিলেন।

### রাসূলুল্লাহর (সা) পিতার কবর ঃ

আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব ২৫ বছর বয়সে মদীনায় মারা যান। তখন তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিব জীবিত ছিলেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) তখনও জন্মগ্রহণ করেননি। বাপের মৃত্যুর পরই রাসূলুল্লাহ (সা) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর কবর যোকাক আত্-তোয়ালে অবস্থিত। আবদুল্লাহ খুবই সুন্দর ও সুশ্রী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও রাসূলুল্লাহর (সা) মায়ের নাম ছিল আমেনাহ বিনতে ওহাব।

**নফসে যাকিয়্যাহর কবর ঃ**

মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন হাসান বিন আলী বিন আবিতালিব, নফসে যাকিয়্যাহ নামে পরিচিত। তাঁর কবর হচ্ছে, সালা' পাহাড়ের পূর্বে এবং আইনে যারকার উত্তরে যা সানিয়াতুল ওয়াদা থেকে আসার সময় হাতের ডানে রাস্তার পার্শ্বে এবং দাউদিয়া বাগানের পশ্চিমে অবস্থিত। আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মনসুর তাঁর বাপ ও আত্মীয়-স্বজনকে কারাদন্ড দিয়েছিল। ফলে, মদীনার বহু লোক তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। খলীফা মনসুর ৪ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে তাঁকে সহ তাঁর ৩শরও বেশী অনুসারীকে হত্যা করে। তিনি তাঁর এই ক্ষুদ্রবাহিনী নিয়ে বীরের মত লড়াই করে শহীদ হন। ঐতিহাসিক মাতারীর মতে তাঁকে উক্ত স্থানে দাফন করা হয়। কিন্তু ইবনুল জাওযী তাঁর 'রিয়াদুল আফহাম' বইতে লিখেছেন, তাঁর বোন ও কন্যা ফাতিমা তাঁকে বাকী গোরস্থানে দাফন করেন।

**মালেক বিন সেনানের কবর ঃ**

তিনি হচ্ছেন হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রা) পিতা। তাঁর কবর হচ্ছে মানাখার পূর্বে, হোস আল-মারযুকীর পশ্চিমে এবং যোকাক আল-ফাতিমার দক্ষিণে। তিনি ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং সেখান থেকে তাঁকে এখানে এনে দাফন করা হয়।

ওহোদ যুদ্ধ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঐ যুদ্ধ মাত্র ১টি স্থানে সংঘটিত হয়নি। বরং তা পাঁচ স্থানে সংঘটিত হয়েছে। ময়দানগুলো হচ্ছেঃ ১' আর রোমাহ পাহাড়ের পশ্চিমে কানাহ উপত্যকায় দুই বাহিনীর মধ্যে প্রথম যুদ্ধ শুরু হয়। এই রণাংগনে হামযা (রা) শহীদ হন।

২য়টি হচ্ছে, ১ম ময়দানে মুশরিক বাহিনীর শিবিরে মালে গনীমত সংগ্রহে ব্যস্ত মুসলিম বাহিনীর উপর আর রোমাহ পাহাড়ের পূর্ব দিক থেকে খালেদ বিন ওয়ালিদের আক্রমণ। এই আক্রমণের ফলে মুসলিম বাহিনী বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

ওহোদ পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ গিরিপথ

৩য়টি হচ্ছে, ওহোদ পাহাড়ের গিরিমুখে অবস্থিত মুসলিম বাহিনীর শিবির। সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) অবস্থান করে মুসলিম বাহিনী পরিচালনা করেন।

৪র্থটি হচ্ছে, মুসলিম বাহিনী নিজ শিবির থেকে পাহাড়ের চূড়ায় মোতাসেম তথা আশ্রয় শিবিরে উঠার পথে কুরাইশ বাহিনী তাদের উপর সর্বশক্তি দিয়ে সাঁড়াশী আক্রমণ পরিচালনা করে।

৫মটি হচ্ছে, ওহোদ পাহাড়ের উপর মুসলিম আশ্রয় শিবিরে কুরাইশ বাহিনীর আক্রমণ। পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে মুসলমানগণ নিরাপদ ছিলেন।

শুধুমাত্র দক্ষিণ দিক থেকে খালেদ ও ইকরামা আক্রমণ পরিচালনা করে। পরে শত্রু বাহিনী পরাজিত হয়।

**ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে ওহোদ যুদ্ধের আনুমানিক নকশা ঃ**
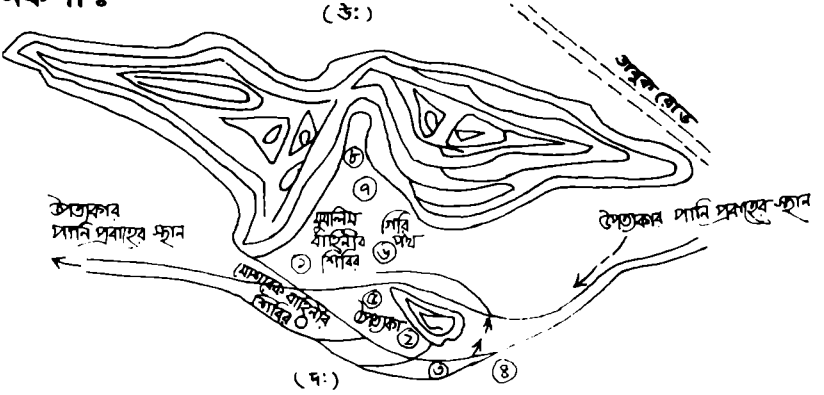
১· দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের প্রথম রণাঙ্গন।

২· আইনাইন পাহাড় থেকে তীরন্দাজদের মালে গনীমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অবতরণপথ।

৩· আইনাইন পাহাড়ের অবশিষ্ট তীরন্দাজদেরকে হত্যার জন্য খালেদ ও ইকরামার আক্রমণের পথ।

৪· পেছন থেকে মুসলিম বাহিনীর উপর খালেদের আক্রমণ।

৫· ২য় রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়

৬· ৩য় রণাঙ্গনে গিরিপথের মুখে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ।

৭· ৪র্থ রণাঙ্গনে পাহাড়ের উপর মুসলিম বাহিনী প্রত্যাহার করার সময় আক্রমণ।

৮· ৫ম রণাঙ্গনে পাহাড়ের উপর মুসলিম আশ্রয় শিবিরে আক্রমণ।

পরের দিন রোববার ৩/১০/৩ হিঃ মোতাবেক ২৪শে মার্চ, ৬২৫ খৃঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে কুরাইশ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। তিনি মদীনা থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌছার পর খবর পান যে, কুরাইশ বাহিনী পুনরায় মদীনায় ফিরে আসছে এবং মুসলমানদেরকে খতম করার চেষ্টা চালাবে। রাসূলুল্লাহ (সা)

কুরাইশ বাহিনীর মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং সেখানে তিনদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। পরে তিনি জানতে পারলেন যে তারা পুনরায় মদীনা আক্রমনের মিথ্যা গুজব রটিয়ে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন ও পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করতে চেয়েছিল। অথচ তারা দ্রুত মক্কার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহেবায়ে কেরামকে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

**হযরত হামযার (রা) কবর ঃ**

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ চাচা হামযাহকে ওহোদ পাহাড়ের দক্ষিণে, আর-রোমাহ পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিমে এবং কানাহ উপত্যকার উত্তর পাশে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়ে দাফন করেন। সাথে তাঁর ভাগিনা আবদুল্লাহ বিন জাহাশকেও দাফন করেন।

সৌদী সরকার কবরস্থানে একটি দেয়াল নির্মাণ করে এবং যেয়ারতের সময় উপরে উঠার জন্য সিঁড়ি তৈরী করে। দেয়ালে ফাঁক রাখা হয়েছে। দক্ষিণে একটি লোহার গেইট আছে। কানাহ উপত্যকাকে 'ওয়াদী সাইয়েদুশ শুহাদা' কিংবা 'ওয়াদী সাইয়েদেনা হামযাহ' ও বলা হয়।

**অন্যান্য শহীদানের কবর ঃ**

ওহোদ যুদ্ধের ৭০ জন শহীদের অধিকাংশকে হযরত হামযাহর কবরের উত্তরে দাফন করা হয়। তাদের কবরের চার দিকে দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। একাধিক শহীদকে একই কবরে দাফন করা হয়েছে এবং অনেকের জন্য দাফনের পর্যাপ্ত কাপড়ও পাওয়া যায়নি। তাই পরনের কাপড় সহ তাদেরকে দাফন করা হয়েছে।

শহীদানে ওহোদের কবরস্থান

## অহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ

আহযাব অর্থ সম্মিলিত বাহিনী। এই যুদ্ধে মক্কার মোশরেক কুরাইশ, মদীনার ইহুদী ও পাশ্ববর্তী এলাকার অন্যান্য বেদুইন পৌত্তলিকগণ সম্মিলিত ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিল তাই একে 'আহযাব যুদ্ধ' বলে। 'খন্দক' অর্থ পরিখা। মুসলমানরা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের ময়দানে দীর্ঘ পরিখা খনন করেন। তাই এ যুদ্ধকে পরিখার যুদ্ধও বলা হয়। হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শক্রমে ৬দিন কঠোর পরিশ্রমের পর নবী (সা) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে উক্ত পরিখা খনন করেন।

সম্মিলিত অমুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। তাদের সাথে ছিল প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র। একমাত্র কুরাইশ গোত্রেরই ছিল ৪ হাজার সৈন্য, ৩শ ঘোড়া ও ১৫০০ উট। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, সম্মিলিত কাফের বাহিনীর সংখ্যা হচ্ছে ১২ হাজার।[৭৩] ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে গোটা আরবের কাফের, মোশরেক ও ইহুদী বাহিনী মদীনার উপর আক্রমণ করে বসে। উত্তর দিকে থেকে বহিষ্কৃত বনি নাদীর ও বনি কাইনুকার ইহুদীরা, পূর্বদিক হতে বানি গাতফানের বিভিন্ন শাখা সমূহ, দক্ষিণ দিক থেকে কুরাইশ গোত্র এবং মদীনার ভেতর থেকে বনি কোরাইজাহ ও মুনাফেক বাহিনী এই সম্মিলিত আক্রমণের ধারা রচনা করে।

অন্যদিকে, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিল ৩ হাজার সৈন্য। তাদের সমরাস্ত্রও তেমন একটা ছিলনা। তাই তিনি সালা' পাহাড়কে পেছনে ও ওহোদকে সামনে রেখে সাহাবীদেরকে নিয়ে দীর্ঘ পরিখা খনন করেন। মদীনার দক্ষিণ দিকে বাগান ও গাছপালা, পূর্বদিকে পাহাড়–পর্বত এবং দক্ষিণ–পশ্চিম দিকও অনুরূপ পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় কেবলমাত্র মদীনার উত্তর দিক তথা ওহোদের পূর্ব ও পশ্চিম কোণ থেকেই শত্রুদের বহিরাক্রমণের আশংকা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ দিকে পরিখা খনন করে মদীনাকে সুরক্ষিত করেন।

---

৭৩· তাফহীমুল কোরআন–সূরা আহযাব।। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।

পরিখাঃ মুসলমানদের সাথে পরামর্শক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার উত্তর দিকে পরিখা খনন করেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক দলে ১০ জন সাহাবী ছিলেন। প্রত্যেক দলের জন্য পরিখার এলাকা নির্ধারিত ছিল। মুহাজিরগণ রাতেজ থেকে জোবাব পাহাড় পর্যন্ত খনন কাজের সূচনা করেন। জোবাব পাহাড়েই পরবর্তীতে মসজিদ আর-রায়াহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐ অংশে রাসূলুল্লাহর (সা) তাঁবুও ছিল। অপরদিকে, আনসারগণ জোবাব থেকে বনি ওবায়েদ পাহাড় পর্যন্ত খনন কাজ শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও পরিখা খননে অংশ নেন। তাঁর শরীর ধূলা-মলিন হয়ে যায়। এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী একটি কঠিন পাথরের সম্মুখীন হন। তাঁরা তা ভাংতে ও সেখানে পরিখা খনন করতে অক্ষম হন। তাঁরা হযরত সালমান ফারসীকে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পাঠান ও সমস্যার সমাধানের অপেক্ষা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জোবাব পাহাড়ের তাঁবু থেকে সালমান ফারসীর সাথে নীচে নেমে আসেন। তিনি পাথর ভাঙ্গার কুড়াল হাতে নেন এবং পাথরটির উপর তিনবার আঘাত করেন। এর ফলে পাথরটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। প্রত্যেক আঘাতেই আলো চমকায়। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আলোর ঝলকানিতে তিনি পারস্য, রোমান ও সানার রাজপ্রাসাদ দেখতে পেয়েছেন। জিবরীল (আ) তাঁকে জানিয়েছেন, মুসলমানগণ একদিন সেইগুলো জয় করবে। ৬ দিন কিংবা এর চাইতেও সামান্য কিছু বেশী সময়ের মধ্যে পরিখা খনন শেষ হল এবং তা সম্মিলিত কাফের বাহিনীর মদীনায় পৌছার আগেই সমাপ্ত হয়েছিল।

পরিখার দৈর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতা সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়না। ধারণা করা যায় যে, পরিখাটি এমনভাবে খনন করা হয়েছিল যে, শত্রুবাহিনীর অশ্বারোহী ও পদাতিক ইউনিট যেন তা অতিক্রম করতে না পারে। তবে বাসমায়েল লিখেছেন, পরিখার দৈর্ঘ ৩·৭৫ কিলোমিটার, প্রস্থতা ৬·৭৪ মিটার এবং গভীরতা ছিল ৫·২৫ মিটার।[৭৪]

শত্রুবাহিনী মোজতামা-আল-আসইয়াল নামক জায়গায় (বর্তমানে বিরকাহ) অবস্থান গ্রহণ করে। গাতফান গোত্র ওহোদ পাহাড়ের পশ্চিমে

---

৭৪· গাযওয়াতুল আহযাব।। মুহাম্মাদ আহমদ বাসমায়েল-১৯৬৫ খৃঃ

অবস্থান নেয়। উভয় অংশের মধ্যে সামান্য দূরত্ব ছিল। প্রথমে তীর ও পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে যুদ্ধের সূচনা হয়। পরে তলোয়ারের যুদ্ধ শুরু হয়। শত্রুবাহিনী পরিখার একটি সংকীর্ণ স্থান তালাশ করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তা পেয়ে যায়। ঐ স্থান দিয়ে আ'মর বিন আবদুদ আল–আমেরী, ইকরামাহ বিন আবিজাহল, দেরার বিন খাত্তাব, হোবায়রাহ বিন আবি ওহাব ও নওফল বিন আবদুল্লাহ পরিখা অতিক্রম করে। আলী বিন আবু তালিব সহ আরো কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম তাদের প্রতিরোধ করেন। আলী (রা) আমরকে এবং যোবায়ের বিন আওয়াম নওফলকে হত্যা করে। অন্যরা সবাই পালিয়ে যায়। শত্রু–বাহিনী অবরোধ সৃষ্টি করে রাখে। কিন্তু তারা শীতের ঠান্ডা, ক্ষুধা ও ভয়–ভীতির সম্মুখীন হয়।

বনি কোরায়জাহর বিশ্বাসঘাতকতাঃ ইহুদী বনি কোরায়জাহ গোত্র মুসলমানদের সাথে মিত্রতা ও মদীনার প্রতিরক্ষা চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং মুসলমানদেরকে উক্ত চুক্তি ভঙ্গের কথা জানিয়ে দেয়।

আহযাব যুদ্ধে ৮জন আনসার মুসলিম শহীদ হন। অপরদিকে, শত্রুপক্ষে ৪ জন কুরাইশ মারা যায়।

সীরাত ইবনে হিশামে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে, ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে (৬২৭ খৃঃ) আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সামহুদী অফা–আল–অফা–বই থেকে মূসা বিন আকাবার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন, বনি কোরায়জাহর যুদ্ধ ৫মে হিজরীর বুধবারে সংঘটিত হয়। তাহলে এর আগেই আহযাব যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়া জরুরী। ইবনে সাদ তাবাকাতে কোবরায় উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মিলিত বাহিনীর প্রত্যাহারের পর ৫ম হিজরীর ৭ই জুলকাদা মদীনায় ফিরে আসেন।

অবরোধের সময় সীমা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, ২৪ দিন, কারুর মতে ২৫ দিনেরও বেশী এবং অন্য এক বর্ণনায় ১৫ দিনের কথা উল্লেখ আছে।

## বর্তমান যুগে পরিখার অবস্থান নির্ণয়

বর্তমান যুগে পরিখার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। তাই এর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন। এব্যাপারে আলী হাফেজ বলেছেন, ঐতিহাসিক তথ্য সমূহের আলোকে এবং সামহুদীও যা সমর্থন করেছেন তার ভিত্তিতে আমি যেটাকে অগ্রাধিকার দেই, সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্ব হাররার শেষ প্রান্তের আজমাতুশ শেখান থেকে পরিখা খননের নির্দেশ দেন। সেখানে বনি হারেসার বসবাস ছিল। সেখান থেকে তা বনি ওবায়েদ পাহাড় পর্যন্ত খনন করা হয় যা মসজিদে আল-ফাতহ এর পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম হাররার প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেখানে বনি সালামাহ গোত্র বাস করত।

## রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাত থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত মদীনার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরাতের পর মদীনায় ১০ বছর জীবিত ছিলেন। ইমাম নওয়ী বলেছেন, এ ব্যাপারে সবাই একমত। তাঁর মদীনার ১০ বছরের জিন্দেগীতে বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।[৭৫]

### হিজরী প্রথম সন

তিনি মসজিদে কুবা ও মসজিদে নবওয়ী তৈরী করেন। এর পর নিজ বাসস্থান নির্মাণ করেন। মসজিদ নবওয়ী নির্মাণের সময় হযরত আসআদ বিন যুরারাহ ইন্তিকাল করেন। তাঁকেই সর্বপ্রথম বাকী গোরস্থানে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের আগেই আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাত ধরে সর্বপ্রথম বাইআত গ্রহণকারী আনসারী সাহাবী বারা বিন মা'রুর আসলামী ইন্তিকাল করেন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কবরে জানাযার নামায পড়েন। আনসারগণ তাঁর নৈকট্য লাভ করার জন্য বিভিন্ন উপহার সামগ্রী নিয়ে আসেন। উম্মে সোলাইমের সামর্থহীনতার কারণে তিনি আফসুস করেন এবং নিজ সন্তান আনাসকে রাসূলুল্লাহর খাদেম হিসেবে পেশ করেন। তখন রাসূলুল্লাহর কোন খাদেম ছিলনা। পিতৃহীন আনাসের অভিভাবক আবু তালহা তাকে হাতে ধরে তাঁর খেদমতে পেশ করেন এবং তিনি তা কবুল করেন। মদীনায় আসার ১মাস পর সোহাইলীর মতে প্রায় ১ বছর পর মুকীমের নামায বৃদ্ধি করা হয়। মাগরিব ব্যতীত প্রথমে ২ রাকাত করে নামায ফরজ হয়েছিল। তারপর ৪ রাকাত করা হয় এবং মুসাফিরের জন্য পূর্বের ২ রাকাতই বহাল থাকে। সাহাবায়ে কেরামের প্রায় সকলের জ্বর হয়। তিনি দোয়া করেন যেন তা জোহফায় স্থানান্তরিত করা হয়। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাদের অর্থনীতিতে মুহাজিরদেরকে শরীক করেন। আসমা বিনতে আবু বকর হিজরাতের ১ম সালের শাওয়াল মাসে কুবায় অবদুল্লাহ বিন যোবায়েরকে প্রসব করেন। হিজরাতের পর মুহাজিরদের মধ্যে আবদুল্লাহই হচ্ছেন ১ম ভূমিষ্ঠ সন্তান। তাঁর মুখে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর থুথু প্রবেশ করে। জুমআর নামায ফরজ হয়। কুবা থেকে মদীনার

---

৭৫· আফ–আল–অফা ১ম খন্ড।। শেখ নূরুদ্দিন সামহূদী।

পথে বনি সালেম পল্লীতে তিনি সর্বপ্রথম জুমআর নামায পড়েন ও খুতবাহ দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম ৬০ জন মুহাজিরকে রাবেগের দিকে পাঠান এবং নিজ চাচাত ভাই ওবায়দাহ বিন হারেস বিন আবদুল মুত্তালিবের হাতে ঝান্ডা দেন। আবু সুফিয়ান কিংবা ইকরামাহ বিন আবু জাহলের নেতৃত্বে একটি কুরাইশ কাফেলা ঐ পথে চলছিল। রাবেগের অপর নাম হচ্ছে ওয়াদ্দান।

৩০জন সাহাবীর একটি প্রতিনিধিদলকে আপন চাচা হামযার নেতৃত্বে ৩শ সদস্য বিশিষ্ট কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার দিকে পাঠান। কাফেলাটি আবু জাহলের নেতৃত্বে পরিচালিত ছিল।

হযরত আয়েশাকে নিজ ঘরে স্ত্রী হিসেবে বরণ করেন। হিজরাতের তিনবছর আগে মক্কায় ৭ বছর বয়স্কা আয়েশার সাথে তার বিয়ে হয়। আয়েশার বিয়ের পরে সাওদাহ বিনতে যামআ'র সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

সা'দ বিন আবি ওয়াককাসের নেতৃত্বে বাণিজ্য কাফেলার দিকে একটি দল পাঠান। ইহুদী সর্দার ও পন্ডিত আবদুল্লাহ বিন সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিজের ইসলামের কথা প্রকাশ করার আগে ইহুদীদেরকে ডেকে তার সম্পর্কে মতামত জানার জন্য রাসূলুল্লাহর প্রতি আহবান জানান। তিনি ইহুদীদেরকে ডেকে আবদুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারা তাকে নিজেদের সরদার ও পন্ডিত বলে স্বীকার করে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। পরে আবদুল্লাহ ভেতর থেকে বেরিয়ে বলেন, আমি মুসলমান হয়েছি। তোমরাও মুসলমান হও। এবার তারা তাকে মিথ্যুক বলে গালি দেয়।

## হিজরী দ্বিতীয় সন

১০ই মুহররম রাসূলুল্লাহ (সা) আশুরার রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমরা ইহুদীদের চাইতে মূসার (আ) বেশী হকদার। এই সালে হযরত ফাতিমাকে আলীর সাথে বিয়ে দেন। তখন ফাতিমার বয়স মতভেদ অনুযায়ী ১৫ কিংবা ৯ অথবা ১৮ বছর। এই বছরই রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই আবওয়া অভিযানে যান। রাবেগ থেকে আবওয়া মদীনার দিকে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি ওয়াদ্দান থেকে মদীনার দিকে মাত্র ৬ মাইল দূরে। দুশমনের হুমকী না থাকায় তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। তারপর আবার ২শ সাহাবী সহকারে রাদওয়ায় শত্রু বাহিনীর হুমকী মুকাবিলার জন্য রওনা করেন। এখানেও কোন

যুদ্ধ হয়নি। এটিকে বোয়াত অভিযান বলা হয়। এটি রাদওয়ার পার্শ্বেই অবস্থিত। কোরয বিন জাবের ফেহরী মদীনার উপকণ্ঠে লুট-পাট করায় তিনি মুহাজিরদেরকে নিয়ে তার পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু বদর পর্যন্ত পৌঁছে তাকে না পেয়ে ফিরে আসেন। এটাকে 'প্রথম বদরের অভিযানও' বলা হয়। তিনি আবদুল্লাহ বিন জাহাশের নেতৃত্বে নাখলায় ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাহিনী পাঠান। উদ্দেশ্য হচ্ছে মুশরেকদের তৎপরতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

এই সালেই কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তন হয়। ইতিপূর্বে ১৭ মাস ব্যাপী মুসলমানগণ বাইতুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। শাবান মাসে রমজানের রোযা ফরজ হয় এবং রমজানে মুসলমানরা সর্বপ্রথম রোজা রাখেন। রমজানের ১৭ তারিখ ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সালে ঈদুল ফিতরের মাত্র ২দিন আগে, রাসূলুল্লাহ (সা) সদকায়ে ফিতরাহ দানের নির্দেশ দিয়ে বক্তৃতা করেন। একই সালে যাকাতও ফরজ হয়। এই বছরের শাওয়াল মাসে তিনি বনি কাইনুকার সাথে লড়াই করেন। এটি বদর যুদ্ধের একমাস পরে সংঘটিত হয়। জুলকা'দা মাসে অনুষ্ঠিত হয় সাওয়িক যুদ্ধ। বদরযুদ্ধের সময় হযরত উসমানের স্ত্রী ও রাসূলুল্লাহর কন্যা রুকাইয়া ইন্তিকাল করেন। ফলে, এই যুদ্ধে হযরত উসমান (রা) অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এই বছর প্রখ্যাত সাহাবী উসমান বিন মাজউন ইন্তিকাল করেন। একই বছর উমাইর বিন আদীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে কবিতা রচনাকারিনী ইয়াযিদ আল-খোতামীর স্ত্রীকে হত্যা করে। এরপর বনি খোতামা পরিবারের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। অন্যদিকে, তিনি সালেম বিন উমাইরের নেতৃত্বে একটি ছোট বাহিনী পাঠিয়ে আবু গাফল নামক একজন ইহুদীকে হত্যা করান। আবু গাফল একজন বৃদ্ধ লোক ছিল এবং লোকদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত। একই বছর তিনি দুটো বকরী কোরবানী দেন।

## হিজরী তৃতীয় সন

মুহাম্মাদ বিন মুসলিমাহ নামক সাহাবী কাব বিন আশরাফকে হত্যা করেন। কাব ছিল কবি। কাব্যের মাধ্যমে সে বদর যুদ্ধের পর মক্কার কুরাইশ সহ অন্যদেরকে উত্তেজিত করে এবং মুসলমানদের নিন্দা করে বেড়ায়। তাই তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। এই সালে 'আলকাদার' নামক অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা) অংশ নেন এবং দুশমনদেরকে না পেয়ে ফিরে আসেন। একে কারকারা অভিযান

বলা হয়। একই সালে আন্‌মার যুদ্ধ হয়। দাসুর নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সা) গাছের নীচে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। তার হাতে ছিল তলোয়ার। সে বলে, হে মুহাম্মাদ, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বলেন, আল্লাহ। এবার তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যায়। তিনি তলোয়ার হাতে নিয়ে বলেন, এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে? সে বলে, কেউনা। পরে তিনি তাকে ছেড়ে দেন। তখন বনি গাতফান রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা ঘোষণা করে ও মুসলমানদেরকে দেখে পালিয়ে যায়। এই বছর 'জি–আমর' যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এটাকে 'গাওরস যুদ্ধ'ও বলা হয়। এরপর কারদাহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একই বছর শাওয়াল মাসে ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে রাসূলুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী হামরাউল আসাদ পর্যন্ত যান এবং সেখানে মুশরিক আবু আযযাহ আল–জোমাহীকে হত্যা করেন। বদর যুদ্ধে কোন বিনিময় ছাড়া মুক্তিপ্রাপ্ত উক্ত দুশমন কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদেরকে উস্কানী অব্যাহত রেখেছিল। এই সালে মদ হারাম করা হয়। একই বছর নবী (সা) হযরত উমারের (রা) মেয়ে হাফসাকে বিয়ে করেন। এই বছরই উসমান (রা) রাসূলুল্লাহর কন্যা উম্মে কুলসূমকে বিয়ে করেন। একই বছর হযরত ফাতিমার ঘরে হাসান বিন আলী জন্মগ্রহণ করেন।

## হিজরী চতুর্থ সন

মুহররম মাসে বিরে মাউনার যুদ্ধ হয়। রাল, জাকোয়ান, আসিয়াহ ও বনু লেহইয়ান গোত্র ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে এসে রাসূলুল্লাহকে (সা) বলে যে, তাদের গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে চায়। তাই তিনি ৭০ জন সাহাবীকে সেখানে পাঠান। বিরে মাউনায় পৌঁছার পর তারা তাদেরকে হত্যা করে। মাত্র ২ জন সাহাবী বেঁচে ছিলেন। এরপর আর–রাজীই যুদ্ধ হয়। হোজাইল গোত্রের সাথে ঐ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর ইহুদী বনি নাদীর গোত্র রাসূলুল্লাহকে (সা ঘরের পার্শ্বে বসিয়ে ছাদের উপর থেকে বড় পাথর ফেলে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই বছর হযরত ফাতিমার ঘরে হুসাইন বিন আলী জন্মগ্রহণ করেন। ৩য় প্রতিশ্রুত বদরযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে মুসলিম বাহিনী বদরের মাঠে যান। ওহোদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান এই যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দেয়ায় মুসলিম বাহিনী তা গ্রহণ করেন। এই বছর রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতুল

খাওফ অর্থাৎ যুদ্ধকালীন নামায পড়েছেন। যয়নাব বিনতে খোযাইমাহ ইন্তিকাল করেন। এই বছর রাসূলুল্লাহ (সা) যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করেন। একই বছর তিনি উম্মে সালামাহ হিন্দকে বিয়ে করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি রামলাহ বিনতে আবি উমাইয়াকে বিয়ে করেন, উম্মে সালামাহকে নয়। এই বছর জাতুর রিকা যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। একই বছর পর্দার হুকুম নাযিল হয়।

## হিজরী পঞ্চম সন

রাসূলুল্লাহ (সা) সালমান নামক দাসকে মুক্ত করে দেন। এই বছরই দুমাতুল জানদাল অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। তারা সেখান থেকে যুদ্ধ ছাড়াই ফিরে আসেন। শত্রুবাহিনী অনুপস্থিত ছিল। এই বছর উম্মে সা'দ বিন উবাদাহ (রা) ইন্তিকাল করেন। ঐ বছর জুমাদা আস্–সানী মাসে চন্দ্রগ্রহণ লাগে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যগ্রহণ তথা খাসুফের নামাযের অনুরূপ কাসুফ নামায পড়েন। এই বছর খন্দকের যুদ্ধ হয় এবং এরপর বনি কুরাইজার বিরুদ্ধে অবরোধ করা হয়। বনি কুরাইজার যুদ্ধবন্দিনী রায়হানা বিনতে ইয়াযীদকে তিনি বিয়ে করেন। কেউ বলেছেন, তিনি তাঁকে দাসী হিসেবে রাখেন। তিনি আরাফাতের কাছে অবস্থিত ওরানায় সুফিয়ান বিন খালেদ হোজালী এবং লেহইয়ানীর প্রতি ওবায়দুল্লাহ বিন আনিসের নেতৃত্বে বাহিনী পাঠান।

## হিজরী ষষ্ঠ সন

এই বছর সামামাহ বিন আসালকে আটক করে নবীর (সা) কাছে হাজির করা হয়। এই বছর জিহারের হুকুম নাযিল হয়। জিহার হচ্ছে, নিজ মায়ের সাথে কিংবা তার কোন অঙ্গের সাথে নিজের স্ত্রীর অঙ্গের তুলনা করা। এই বছর মুশরিকরা মুহাম্মাদ বিন মুসলিমার নেতৃত্বাধীন ১০ সদস্য বিশিষ্ট মুসলিম বাহিনীকে হত্যা করে। তারপর হযরত আলীর নেতৃত্বে ফাদাক অভিমুখে ১শ সদস্য বিশিষ্ট মুসলিম বাহিনীর অভিযান চালানো হয়। পরে দুমাতুল জানদাল অভিমুখে আবদুর রহমান বিন আওফের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর অভিযান পরিচালিত হয়। এই বছর খরা দেখা দেয়ায় তিনি তাঁর মোসাল্লায় দাঁড়িয়ে দোয়া করায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এরপর যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠানো হয়। তারপর ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার ঘটনা ঘটে ও সন্ধি চুক্তি হয়।

এখানেই বাইআতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়। এই বছর ওয়াইনাহ বিন হেসন আল-ফাজারী রাসূলুল্লাহর (সা) উট লুট করে নিয়ে যায়। পরে তা উদ্ধার করা হয়। তাকে মদীনা ও খাইবারের মাঝে জিকারাদ নামক স্থানে আক্রমণ করা হয়। উটগুলো জঙ্গলের পার্শ্বে বিচরণ করা অবস্থায় লুণ্ঠিত হয়। এই জন্য এই যুদ্ধকে 'জিকারাদ যুদ্ধ'ও বলা হয়। তার পর ৮জন ওরানী ব্যক্তির ঘটনা ঘটে। তারা মুসলমান হয়ে মদীনায় আসে এবং বলে মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল নয়। তাই তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নবী (সা) তাদেরকে যাকাতের উট কিংবা নিজ উটের কাছে পাঠিয়ে দেন। তারা উটের দুধ ও পেশাব পান করে সুস্থ হয়ে উঠে। সুস্থ হওয়ার পর তারা উটগুলো নিয়ে ভেগে যায়। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সন্ধানে কোরয বিন খালেদ ফেহরীকে পাঠান। তিনি তাদেরকে তাঁর কাছে হাজির করেন। পরে তিনি তাদের হাত-পা কাটা এবং চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বনি মুস্তালিক যুদ্ধে যান। ফেরার পথে তিনি মুরাইসী হয়ে আসেন। এখানেই হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে দুর্ণামের ঘটনা ঘটে এবং সেখানে তায়াম্মুমের নির্দেশ দেয়া হয়। বনিল মুস্তালিক যুদ্ধে জয়লাভ করার পর তিনি শত্রু গোত্রের সরদার হারেস বিন আবিদেরাবের কন্যা জোয়াইরিয়াকে বিয়ে করেন। এই বছর হজ্জ ফরজ হয়।

## হিজরী সপ্তম সন

সিরিয়ায় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতের বিষয়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশ প্রতিনিধিদলের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই সালে তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখেন। এই বছর খাইবার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সেখানকার ইহুদী সরদার হুয়াই বিন আখতাবের মেয়ে সুফিয়াকে গনীমতের মাল হিসেবে লাভ করার পর তাঁকে স্বাধীন করে বিয়ে করেন। একই বছর মিসরের শাসক মুকাওকাস মারিয়া কিবতিয়াকে রাসূলুল্লাহর জন্য উপহার পাঠান। তাঁর দুলদুল খচ্চরটিও উপহার হিসেবে আসে। হযরত আবু হুরাইরা ইসলাম গ্রহণ করেন। এই সালে নবী (সা) ওয়াদী আল-কোরা ঘেরাও করেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সকালে ফজরের নামাযের সময় ঘুম থেকে জাগতে পারেননি। সেখানে কাজা নামাযের বিধান দেয়া হয়। এই বছরই ইহুদীরা লাবিদ বিন আসেমের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে যাদু করে। এই সালে উম্মে হাবীবা বিনতে আবি সুফিয়ানের সাথে রাসূলুল্লাহর

(সা) বিয়ে হয়। তারপর কাজা উমরাহ্ আদায়ের উদ্দেশ্যে নবী (সা) মক্কায় আসেন এবং মায়মুনাহ বিনতে হারেসকে বিয়ে করেন। এই সালে তিনি উমার (রা) কে তোরবা এবং আবু বকর সিদ্দিক (রা) কে বনি কেলাব গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠান। একই বছর জাফর বিন আবিতালিব ইথিওপিয়া থেকে আবু মূসা সহকারে মদীনা আসেন। এই বছরই চিঠিতে সীল লাগানোর জন্য একটি আংটি বানান। গৃহপালিত গাধা ও মোতআ বিয়ে (অস্থায়ী বিয়ে) হারাম করা হয়।

## হিজরী অষ্টম সন

এই বছর মুতার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় এবং মক্কা বিজয় হয়। পরে হোনাইন যুদ্ধ ও তায়েফ আক্রমণ করা হয়। নবী (সা) মক্কায় ওতাব বিন ওসাইদকে গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এই বছর মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ছেলে ইবরাহীম জন্ম লাভ করেন। তিনি দুটো দুম্বা দিয়ে ৭ম দিনে আকীকা দেন। একই সালে নবীর (সা) কন্যা যয়নাবের মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর বড় সন্তান ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিল আবুল আস বিন রাবী। নবুওয়াতের পূর্বেই বিয়ে হয়েছিল। পরে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসলে তিনি যয়নাবকে তার স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেন। এই বছর খালেদ বিন ওয়ালিদ, উসমান বিন তালহা এবং আমর বিন আস মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মসজিদে মিম্বার লাগান, এর উপর দাঁড়িয়ে খুতবাহ দেন ও খেজুর বৃক্ষের কান্না সংঘটিত হয়।

## হিজরী নবম সন

নবী (সা) ১ মাস যাবত নিজ স্ত্রীদেরকে বয়কট করেন। বিভিন্ন প্রতিনিধিদল দলে দলে মদীনায় আসতে থাকে। হযরত আবু বকরকে আমীরে হজ্জ বানিয়ে মক্কা পাঠানো হয়। পরে সূরা তাওবা নাযিল হওয়ায় কাফেরদের সাথে মুসলমানদের সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণার জন্য হযরত আলীকে (রা) পিছে পিছে মক্কা পাঠান। রজব মাসে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক তাবুক অভিযান। এটা নবীর (সা) শেষ অভিযান। এই বছর মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই মারা যায়। উম্মে কুলসুম বিনতে রাসূলুল্লাহ এবং ইথিওপিয়ার নাজাসীও মারা যান।

## হিজরী দশম সন

বছরের শুরুতে তাই গোত্রের পক্ষ থেকে আদি বিন হাতেম একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে আসেন। তারপর বনি হানিফা, গাসসান ও নাজরান প্রতিনিধিদল আসে। তারপর জিবরীল (আ) এসে লোকদেরকে দীন শিক্ষা দেন। তিনি বিদায় হজ্জে যান এবং ফিরে আসার পর সফর মাসের ২০ তারিখে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই বছর তাঁর ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যু হয়। তিনি নিজে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের সাল ছিল ১১ই হিজরী। তাঁকে হযরত আব্বাস ও ফজল বিন আব্বাস গোসল দেন এবং তিনটি কাপড়ের মাধ্যমে কাফন দেন। তাঁকে বুধবারে দাফন করা হয়। এক বর্ণনায় মঙ্গলবারে এবং আরেক মত অনুযায়ী সোমবারেই দাফন করা হয়। সবাই পৃথক পৃথক ভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) জানাযা পড়েন। তাঁকে তাঁর মৃত্যুর স্থানে অর্থাৎ হযরত আয়েশার কক্ষে দাফন করা হয়।

# পরবর্তীকালের মদীনা

## খেলাফতে রাশেদার আমলে মদীনা

রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর ১১ হিজরীতে মসজিদে নবওয়ীর অদূরে সাকীফাহ বনি সায়েদাতে হযরত আবু বকরের হাতে লোকেরা বাইআত গ্রহণ করার পর তিনি খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি মোরতাদ বা দীনত্যাগী ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এরপর তিনি ইরাক ও সিরিয়ায় ইসলামী বাহিনী পাঠান। সকল যুদ্ধে সেই বাহিনী জয়লাভ করে।

আবু বকরের (রা) ইন্তিকালের পর ১৩ হিজরীতে হযরত উমার (রা) খলীফাহ নির্বাচিত হন। তাঁর আমলে সমস্ত জাযীরাতুল আরব বিজিত হয় এবং রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের এক তৃতীয়াংশের উপরও মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন। মুসলিম বাহিনী মিসরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন এবং মদীনায় অনবরত বিজয়ের সুখবর আসতে থাকে।

হিজরী ২৪ সাল মোতাবেক ৬৪৪ খৃঃ হযরত উসমান (রা) খলীফাহ নির্বাচিত হন। তাঁর আমলেও অনেক বিজয় সূচিত হয়। হিজরী ৩৬ সালে তিনি মসজিদে নবওয়ী সংলগ্ন নিজ ঘরে শহীদ হন।

৩৫ হিজরী মোতাবেক ৬৫৬ খৃঃ হযরত আলী খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন। কিন্তু ৪০ হিজরীতে তিনি কুফায় শহীদ হন। তাঁর খেলাফতকালে সর্বপ্রথম মদীনা থেকে কুফায় ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। তাঁর ইন্তিকালের পর কুফাবাসীরা তাঁর ছেলে হাসানের হাতে বাইআত গ্রহণ করে।

খেলাফতে রাশেদার ৩০ বছরের শাসনে মদীনা তার দ্বীনি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও আন্তর্জাতিক ভূমিকা যথার্থভাবে পালন করে। ফলে, মদীনাহ বিশ্বের প্রধান কেন্দ্র ও আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সমসাময়িক রোম ও পারস্য পরাশক্তিরদ্বয়ের পরাজয়ের পর মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র বিশ্বের ১ম ও প্রধান শক্তিতে তথা একমাত্র পরাশক্তিতে পরিণত হয়। খেলাফতে রাশেদার যুগকে ইসলামী ইতিহাসের সোনালী যুগ বলা হয়।

## উমাইয়া আমলে মদীনা

৪১ হিজরীর রবিউল সানী মাসে মুআয়িয়াহ বিন আবি সুফিয়ান দামেষ্কে উমাইয়া শাসনের সূচনা করেন এবং কুফা থেকে মুসলিম রাজধানী সিরিয়ায় স্থানান্তর করেন। ফলে, ক্রমান্বয়ে মদীনার রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকলেও এর দ্বীনি ও নৈতিক গুরুত্ব যথার্থই বহাল থাকে।

উমাইয়া শাসক মুআয়িয়াহর আমলে মদীনার গভর্ণর মারওয়ান বিন আল-হাকাম মদীনার পানি সংকট দূর করার জন্য আইনে যারকা (যারকা খাল ) প্রবাহিত করেন। এর ফলে মদীনাবাসীরা যথেষ্ট উপকৃত হন। এমনিতেই মদীনাবাসীরা কূপের পানি পান করতে অভ্যস্ত ছিল। এই খাল প্রবাহের কারণে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

পরবর্তীতে হুসাইন বিন আলী (রা) ইয়াযিদ বিন মুআয়িয়ার হাতে বাইআত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের সহ মক্কায় যান এবং সেখান থেকে ইরাক যান। সেখানে কুফাবাসীরা তাকে খলীফাহ নিযুক্ত করেন। ৬১ হিজরীতে কারবালার ময়দানে তিনি ইয়াজিদের বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণকরেন।

৬৩ হিঃ মোতাবেক, ৬৮৪ খৃঃ পূর্ব হাররাহ বা হাররা ওয়াকেমে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার আমলে জঘন্য হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। এই এলাকায় মদীনাবাসীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও পরে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়। তার

হাতে ১৪শ আনসার, ১৩শ কুরাইশ মুহাজির এবং সাড়ে তিন হাজার গোলাম নিহত হয়। এই দুর্গ জয় করার পর তার বাহিনী মদীনা শহরে প্রবেশ করে ব্যাপক লুট–পাট চালায়।

## আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের আমলে মদীনা

মদীনার যুদ্ধ শেষে মুসলিম বিন আকাবাহ মক্কায় গিয়ে আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের আল আওয়ামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মক্কা অবরোধ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়াযিদের মৃত্যুর খবর আসার পর মুসলিম বিন আকাবাহ মক্কা অবরোধ প্রত্যাহার করে। ইতিমধ্যে ৪০ দিনের জন্য মুআয়িয়া বিন ইয়াযিদ খলীফা নিযুক্ত হন। তারপর তিনি মারা যান। ফলে আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের হাত একটু শক্তিশালী হয়। তাঁর কাছে কুফা, বসরা, খোরাসান, মিসর ও সিরিয়াবাসীরা বাইআত গ্রহণ করে। তিনি নিজ ছোট ভাই ওবায়েদুল্লাহ বিন যোবায়েরকে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তখন খারেজীদের উদ্ভব হয় এবং হুসাইন বিন আলীর মৃত্যুর প্রতিশোধের দাবী উঠে। ৬৪ হিজরীতে দামেস্কে আবদুল মালেক বিন মারওয়ান খলীফা নিযুক্ত হন।

আবদুল মালেক বিন মারওয়ান ৬৫ হিজরীতে হোবাইস বিন দালজার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী মদীনা পাঠান। এই বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল মদীনাকে উদ্ধার করে পুনরায় উমাইয়া শাসনের অধীন নিয়ে আসা। অনুরূপভাবে তিনি ইরাক পুনরুদ্ধারের জন্যও আরেকটি বাহিনী পাঠান। হোবাইস মদীনাহ শহরে পৌছলে মদীনার গভর্ণর জাবের বিন আসওয়াদ বিন আওফ (আবদুর রহমান বিন আওফের ভাই) পলায়ন করে। ফলে, উমাইয়া বাহিনী শহর দখল করে। এদিকে, আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের মদীনা পুনরুদ্ধারের জন্য বসরা থেকে এক বিরাট বাহিনী পাঠান। এরপর তিনি আব্বাস বিন সহলের নেতৃত্বে অতিরিক্ত আরেকটি বাহিনী মদীনায় পাঠান। হোবাইস বিন দালজা ৪ দিনের দূরত্বে রাবজা নামক স্থানে এক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে হোবাইস নিহত ও বহু উমাইয়া সেনা বন্দী হয়। অবশিষ্টরা সিরিয়ায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আবদুল মালেক বিন মারওয়ান ২য় বার মদীনা দখলের জন্য নিজ চাচাত ভাই আবদুল মালেক বিন হারেস বিন হাকামকে পাঠান। তখন আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের কুফার শাসক আল–মোখতারের সাহায্য কামনা করেন। মোখতার হুসাইন বিন আলীর হত্যার প্রতিশোধের দাবীতে ইতিমধ্যে কুফায় নিজ শাসন

পাকাপোক্ত করে নেয়। মোখতার আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের সমর্থনে উমাইয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে মদীনায় একটি বাহিনী পাঠায়। আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের মোখতারের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে মদীনা রক্ষার জন্য আব্বাস বিন সহলের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠান। তিনি আর-রাকীম নামক স্থানে শিবির স্থাপনকারী মোখতারের বাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। মোখতার বাহিনীর প্রধানকে হত্যা করেন এবং তার বাহিনীর বহু সৈন্যকে বন্দী করেন। অবশিষ্টরা কুফায় পালিয়ে যায়। হিজরী ৬৬ সাল মোতাবেক (৬৮৭ খৃঃ) মদীনা দখলের ২য় উমাইয়া প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং মদীনা আব্বাস বিন সহলের পুরো নিয়ন্ত্রনে থাকে।

আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের মদীনায় আবদুর রহমান আসআসকে গভর্ণর নিযুক্তকরেন।

## উমাইয়া শাসনে পুনরায় মদীনা

আবদুল মালেক বিন মারওয়ান মদীনা দখলের চিন্তা ত্যাগ করেননি। হিজরী ৭২ সাল মোতাবেক ৬৯২ খৃঃ তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসূফের নেতৃত্বে এক বিরাট সেনাবাহিনী মক্কায় পাঠান। তখন আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের মক্কায় ছিলেন। হাজ্জাজের বাহিনী মদীনা আক্রমণ না করে সরাসরি মক্কা অবরোধ করে। তিনি ইবনে যোবায়েরকে শহীদ করে শূলীতে চড়ান। এতে করে মক্কায় ইসলামের পবিত্র খলীফা আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের খেলাফতের সমাপ্তি ঘটে। ইতিমধ্যে তদানীন্তন মদীনার গভর্ণর তালহা বিন আবদুল্লাহ বিন আওফ আবদুল মালেকের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর মা আসমা বিনতে আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে নিজ হাতে গোসল দেন ও সুগন্ধি লাগান। পরে তাঁকে মদীনা নিয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহর(সা) স্ত্রী সফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতাবের ঘরে দাফন করেন। ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেক মসজিদে নবওয়ী সম্প্রসারণ করার সময় সেই ঘরটি কবর সহ মসজিদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। ৮৮-৯১ হিজরী সালে ওয়ালিদ মসজিদে নবওয়ী সম্প্রসারণ করেন।

## আব্বাসী শাসনামলে মদীনা

উমাইয়া শাসনের পতনের পর ১৩২ হিজরীসনে আব্বাসী শাসনের সূচনা হয়। মদীনায় এক মারাত্মক রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা বিরাজ করে যা ইয়াযিদ বিন মুআয়িয়াহর আমলে পূর্ব হাররার হত্যাকান্ড এবং আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের শাহাদাতের ঘটনার চাইতে কোন অংশে কম ছিলনা। মদীনা থেকে উমাইয়াদের মূলোৎপাটনের আগ পর্যন্ত ঐ অস্থিরতা বিদ্যমান থাকে। আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের ভয়ে তাদের সকল প্রভাব প্রতিপত্তি মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। আব্বাসী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা সাফফাহ ১৬৩ হিজরীতে (৭৫২ খৃঃ) নিজ চাচাত ভাই দাউদকে দিয়ে মদীনার অবশিষ্ট সকল উমাইয়াকে হত্যা করান।

হযরত আলীর বংশধররা আব্বাসী শাসকদের হাতে বাইআত গ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা নিজেদেকে অন্যদের চাইতে খেলাফতের অধিকতর যোগ্য মনে করে। তাই নফসে যাকিয়্যাহ নামে পরিচিত মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন আলী ও তাঁর ভাই ইবরাহীম মদীনা থেকে অন্যত্র সরে যান এবং ক্ষমতা লাভের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। হজ্জের সময় হজ্জ শেষে তাঁরা মদীনায় আত্মগোপন করেন। বহু চেষ্টা–তদবীর, তল্লাশী–গোয়েন্দাগিরি এবং আর্থিক পুরস্কারের আশ্বাস সত্ত্বেও আব্বাসী শাসক এই ২জনকে আটক করতে পারেনি। জনগণের অন্তরে তাঁদের যে গভীর ভালবাসা ছিল সে কারণে কেউ তাঁদের সম্পর্কে খবর দিতে নারাজ ছিল। ব্যর্থ আব্বাসী শাসক শেষ পর্যন্ত তাদের পিতা আবদুল্লাহকে তিন বছর যাবত কারাগারে বন্দী রাখে। তাতেও তাঁদের কোন হদীস বের করতে না পারায় তারা হযরত হাসান বিন আলীর সকল বংশধরকে কারাগারে নিক্ষেপ করে এবং হাতে পায়ে কড়া লাগিয়ে ইরাকের কারাগারে স্থানান্তর করে। শেষ পর্যন্ত কারাগারে তাদের বয়স্ক লোকেরা মারা যায়।

নফসে যাকিয়্যাহ নিজ বংশধরের প্রতি আব্বাসীয়দের অমানবিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আব্বাসী শাসক আবু জাফর মনসুরের বিরুদ্ধে মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মদীনার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প কিছু লোক বাদ দিয়ে মদীনার অন্যান্য সকল লোক তাঁর হাতে বাইআত হয়। ১৪৫ হিজরী সালে তিনি মদীনার নির্ভরযোগ্য লোকদের হাতে পুলিশ, বিচার ও

প্রশাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

আব্বাসী শাসক মনসূর ঈসা বিন মূসার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী মদীনায় পাঠান এবং তারা মদীনার কয়েক মাইল দূরে শিবির স্থাপন করে। নফসে যাকিয়্যাহ মদীনার অভ্যন্তরে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন এবং রাসূলুল্লাহর অনুসরণে খন্দকের ময়দানে পরিখা খনন করেন। কিন্তু মনসূরের বিশাল বাহিনী উক্ত পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় ও উভয়পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। নফসে যাকিয়্যাহর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে তিনি নিজে ঘোড়া থেকে নেমে সরাসরি যুদ্ধ শুরু করেন। তাঁর সাথে নিবেদিত প্রাণ কিছু সাথীও যুদ্ধ করেন। ১৪৫ হিজরী রমজান মাসে উক্ত যুদ্ধে তিনি মানাখার আহজার–আয–যাইতে প্রাণ হারাণ। এই স্থানটি মালেক বিন সেনানের শাহাদাতের স্থানের নিকটে অবস্থিত ছিল। তিনি মূসার বাহিনীর বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করার পর নিজে শহীদ হন। তাঁর ভাই ইবরাহীম বসরায় বিদ্রোহ করেন এবং সেখানে মনসূর বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে প্রাণহারান।

কথিত আছে নফসে যাকিয়্যাহকে জাবালে সালা'র পূর্বে এবং আইনে যারকার উত্তরে দাফন করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে বাকী গোরস্থানে দাফন করা হয়।

মদীনায় এবারকার আব্বাসী শাসন অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয় এবং আব্বাসী শাসনের পতনের আগ পর্যন্ত তা বহাল থাকে। আব্বাসী খলীফা মাহদীর আমলে ১৬১–১৬৫ হিজরীতে মসজিদে নবওয়ীর সম্প্রসারণ করা হয়।

আব্বাসী আমলের পতনের আগে ৩৩৫ হিঃ মোতাবেক ৯৪৮ খৃঃ বাগদাদে নামে মাত্র কেন্দ্রীয় শাসন বিদ্যমান থাকে। বিভিন্ন প্রদেশগুলোর গভর্ণরগণ নিজেরাই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠে। তখন মদীনা হুসাইনের (রা) উত্তম উত্তরসূরীদের দ্বারা শাসিত হয়। সেই সময় থেকে মদীনায় তুরস্কের উসমানী খেলাফতের আগ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো হচ্ছেঃ

## মদীনা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর দুই সাথীর লাশ মোবারক সরানোর একটি শিয়া ষড়যন্ত্র ঃ

ইবনে নাজ্জার 'তারীখে বাগদাদে' লিখেছেন, কিছু কাফের মিসরের শাসক

ওবায়দীকে এমর্মে পরামর্শ দেয়, তিনি যেন মদীনা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর দুই সাথী আবু বকর এবং উমারের (রা) লাশ মিসরে নিয়ে আসেন। এতে করে লোকেরা মদীনার পরিবর্তে মিসর সফরে আসবে।[৭৬] ৩৬৫ হিজরী সালে মিসরের উবায়দীদের শাসনের সূচনা হয়। তারা নিজেদেরকে শিয়া এবং হযরত আলীর বংশধর হিসেবে দাবী করে। তাদেরকে ফাতেমী সম্প্রদায় বলেও অভিহিত করা হয়। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক তাদেরকে হযরত আলীর বংশধর হিসেবে স্বীকার করেননা, বরং তাদেরকে ইহুদী কিংবা অগ্নিপূজারী বলে আখ্যায়িত করেন।

৬ষ্ঠ ওবায়দী খলীফাহ আল-হাকেম বেআমরিল্লাহ মিসরে একটি মসজিদ এবং সাথে তিনটি কবরও তৈরী করেন। তারপর তিনি আবুল ফতুহ নামক একজন সেনাপতির নেতৃত্বে এক বাহিনী মদীনায় পাঠান। মদীনা বাসীরা তার এই হীন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পেরে তার উপর আক্রমণ করে বসে এবং তাকে ও তার বাহিনীকে হত্যা করার উদ্যোগ নেয়। আবুল ফতুহ এই অস্বাভাবিক অবস্থায় বেসামাল বোধ করে এবং হীন পরিকল্পনা ত্যাগ করে মিসর চলে যায়।

৩৮৬ থেকে ৪১১ হিজরীর মাঝে মসজিদে নবওয়ীতে সংঘটিত একটি ঘটনা। মসজিদের খাদেম শামসুদ্দিন সাওয়াব লামাতী বর্ণনা করেনঃ সিরিয়ার হালব এলাকার কিছু শিয়া মদীনায় আসে এবং মদীনার তদানীন্তন শিয়া গভর্ণরকে বিরাট অংক ঘুষদানের মাধ্যমে হুজরাহ মোবারকের দরজা খুলে রাসূলুল্লাহর (সা) দুই সাথী হযরত আবু বকর এবং উমারের (রা) লাশ সিরিয়ায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাজী করে। কেননা, তারা শিয়ামতের আতিশয্যে হযরত আবু বকর ও উমারকে মোটেই সহ্য করতে পারেনা। তাই রাসূলুল্লাহর (সা) কাছ থেকে তারা তাঁর এই প্রিয় দুই সাথীর লাশ সরানোর ব্যাপারে উঠে পড়ে লেগে যায়। তাদের মতে হযরত আলী (রা) ছাড়া বাকী তিন খলীফা যালিম। খাদেম বলেন, আমার একজন বন্ধু গভর্ণরের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। তিনি বিষয়টা জেনে আমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। আমি অত্যন্ত উদ্বেগ ও পেরেশানীর মধ্যে সময় অতিবাহিত করতে থাকি। কেননা, প্রকাশ্যে এই ষড়যন্ত্র

---

৭৬-অফা-আল-অফা।।নূরুদ্দিনসামহুদী।

প্রতিহত করার মত কোন শক্তি সামর্থ আমার ছিলনা। গভর্ণর আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং রাত্রে হুজরাহ শরীফের দরজা খুলে দিতে বললেন। গভর্ণর বললেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন রাখবে এবং শিয়াদের কাজে বাধা দিতে পারবেনা। খাদেম ফিরে আসেন এবং কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে যান।

ইশার নামাযের পর মুসল্লীরা চলে যায়। তখন গভর্ণরের বাসার দিক থেকে ৪০ জন হলবীয় শিয়া হাতে কোদাল, শাবল ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে বাবুস সালামের দিক থেকে মসজিদে আসে। তারা মিম্বারের কাছে পৌছার আগেই মাটিতে তাদের পা আটকে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে মাটি তাদেরকে গ্রাস করতে শুরু করল এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে সমগ্র সাজ–সরঞ্জাম সহ তারা মাটির নীচে তলিয়ে গেল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষড়যন্ত্রকারীরা ফিরে না আসায় গভর্ণর খাদেমকে ডেকে পাঠান এবং তাদের অবস্থা জেনে ভড়কে যান।[৭৭] আল্লাহ এইভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের দূরভিসন্ধি নস্যাত করেন।

আল্লামা তাবারী বলেছেন, ঘটনার বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য বলে ঘটনাটিও নির্ভরযোগ্য।

## রাসূলুল্লাহর (সা) কবর থেকে তাঁর লাশ মোবারক চুরির খৃষ্টান ষড়যন্ত্র ঃ

দুর্বল আব্বাসী শাসনামলের শেষ দিকে খৃষ্টানরা কয়েকটি মুসলিম এলাকায় আক্রমণ চালায়। মুসলমানদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তাদের ধারণা জন্মে যে, মুসলমানদের বিজয় ও শক্তি–সামর্থের প্রধান উৎস হচ্ছে তাদের নবীর কবর। যদিও এটা তাদের ভুল ধারণা। কেননা, মুসলমানরা কোন কবর ও লাশকে নিজেদের শক্তির উৎস মনে করেনা। তাদের শক্তির উৎস হচ্ছেন আল্লাহ। তারা তাদের এইভূল ধারণার ভিত্তিতে কবর মুবারক থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) লাশ চুরির এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে।

তারা এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করে স্পেনের ২জন খৃষ্টানের উপর যারা মরক্কোর মুসলিম বেশে মদীনায় প্রবেশ করে। ৫৫৭ হিঃ মোতাবেক

---

৭৭·অফা–আফ–অফা।।নূরুদ্দীনসামহুদী।

১১৬৪ খৃষ্টাব্দে তারা হুজরাহ মোবারকের দক্ষিণ পাশে মসজিদের বাইরে আলে উমার ঘরে অবস্থান গ্রহণ করে। এই ঘরটি 'দিয়ারুল ওশরাহ' নামেও পরিচিত ছিল। অবশ্য আজকাল আর ঐ ঘরের কোন অস্তিত্ব নেই। মসজিদ সম্প্রসারণের কারণে তা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। আসনওয়ীর মতে তারা হুজরাহ শরীফের নিকট নিকট একটি রেবাতে অবতরণ করে।

তারা লোকদের সাথে সুসম্পর্ক, নেক কাজ, নামায ও বাকী গোরস্থান যেয়ারতের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। বাহ্যিকভাবে তারা খুবই নেককার লোক। অথচ গোপনে তারা নিজেদের কক্ষে কবর মোবারকের দিকে একটি সুড়ঙ্গ খোদাই করতে থাকে। অল্প অল্প করে মাটি বাইরে নিক্ষেপ করে। কোন সময় তাদের রেবাতে একটি কূপে এবং কোন সময় চামড়ার ব্যাগের মুখ ভর্তি করে বাকী গোরস্থান যেয়ারতের নামে সেখানে মাটি নিক্ষেপ করে। দীর্ঘদিন যাবত এভাবে কাজ করে তারা প্রায় কবর মোবারকের কাছে পৌছে যায়।

সিরিয়ার সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ যংকী তখন মদীনা শাসন করতেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সোনালী চুল বিশিষ্ট দুইজন লোকের দিকে ইশারা দিয়ে বলেন, হে মাহমুদ, আমাকে এই দুই দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা কর। তিনি ঘুম থেকে জেগে ঘাবড়ে গেলেন। অজু করে নামায পড়ে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন। আবারও একই স্বপ্ন। এইভাবে তিনবার স্বপ্ন দেখেন। ৩য়বার ঘুম থেকে জেগে তিনি প্রধানমন্ত্রী জামালুদ্দিন মোসেলীকে ডাকেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও দীনদার মন্ত্রী। তিনি তাঁর কাছে স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বলেন। তিনি আর দেরী না করে অবিলম্বে মদীনা রওনা করার এবং স্বপ্নের বিষয় গোপন রাখার পরামর্শ দেন। সুলতান ও মন্ত্রীর ২০ সদস্য বিশিষ্ট এক কাফিলা বহু অর্থ-সম্পদসহ মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা করে। মাতারীর মতে কাফিলায় ১ হাজার উট ও ঘোড়া ছিল। সিরিয়া থেকে একটানা ১৬ দিন সফরের পর তারা মদীনায় পৌছলেন। তিনি মসজিদে পৌছে রাওদাহ মোবারকে নামায পড়েন এবং নবীর (সা) কবর যেয়ারত করেন। তারপর বসে চিন্তা করতে থাকেন কি করা যায়। মন্ত্রী জামালুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি ঐ লোক দুইটাকে দেখলে চিনতে পারবেন? সুলতান বলেন, 'হাঁ'। তারপর মন্ত্রী সকল মদীনাবাসীকে মসজিদে নবওয়ীতে ডাকলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, সুলতান

মদীনাবাসীদের জন্য বহু অর্থ-সম্পদ এনেছেন। প্রতেকেই যেন আসে এবং তাঁর উপহার নিয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুলতান তার প্রত্যাশিত উক্ত দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন না।

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের আর কেউ কি অবশিষ্ট আছে যারা উপহার নিতে আসেনি? তারা বললেন, হাঁ, দুইজন মরক্কোবাসী বুজর্গব্যক্তি আছেন, যারা কারুর কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করেননা। বাদশাহ তাদের ২জনকে হাজির করার নির্দেশ দেন। তারা উপস্থিত হল। সুলতান তাদেরকে দেখে চিনতে পারলেন যে তারাই সেই দুই দুর্বৃত্ত যাদের প্রতি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা) ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সুলতান জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোন দেশের লোক? তারা বলে, 'আমরা মরক্কোর অধিবাসী, আমরা হজ্জ করতে এসেছি।' তিনি তাদেরকে সত্য কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু তারা একই উত্তর দেয়। তিনি তাদেরকে নিজ লোকের কাছে রেখে তাদের থাকার ঘরে যান। তাঁর সাথে কিছু সংখ্যক মদীনাবাসীও ঐ ঘরে যায়। তাঁরা ঘরে বিপুল অর্থ-সম্পদ, ২টা কোরআন শরীফ এবং তাকের উপর কিছু কিতাব দেখতে পান। এছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেননা। তিনি ঘরে বারবার ঘুরতে থাকেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পাচ্ছিলেননা। আল্লাহ তাঁর অন্তর খুলে দেন। তিনি তাদের বিছানা তুলে দেখেন, নীচে একটি কাঠের তখতা। কাঠটি তুলে দেখেন, এর নীচে রয়েছে কবর অভিমুখী এক সুড়ঙ্গ যা মসজিদের দেয়াল ভেদ করে ভেতরে চলে গেছে। এতে সুলতান সহ মদীনাবাসীরা হয়রান হয়ে যান। মদীনাবাসীরা যাদেরকে অত্যন্ত নেক লোক মনে করত এই হচ্ছে তাদের কান্ড! সুলতান নূরুদ্দিন তাদেরকে ভীষণ মার দেন, শেষ পর্যন্ত তারা তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে। তারা বলে আমরা মূলতঃ খৃষ্টান। আমাদেরকে খৃষ্টান সম্রাটগণ বিরাট অর্থের মুকাবিলায় এই কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন, আমরা যেন মুসলমানদের নবীর লাশ আমাদের দেশে নিয়ে যাই। তাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ার পর হুজরাহ নবওয়ীর পূর্ব পাশে তাদের গর্দান দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

তারপর নূরুদ্দিন মাহমুদ যংকী হুজরাহ শরীফের চারদিকে গভীর গর্ত খনন করার নির্দেশ দেন যেন তা এত নীচ পর্যন্ত পৌছে যেখানে পানির স্তর বিদ্যমান। তিনি বিপুল পরিমাণ শিশা গলিয়ে গর্তে মজবুত ভিত্তি তৈরী করেন এবং ভূমির

উপরিভাগ পর্যন্ত পাকা করেন।

এই লোমহর্ষক ঘটনা যারা বর্ণনা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জামালুদ্দিন আসনওয়ী ও জামালুদ্দিন মাতারী। তাদের বরাত দিয়ে আল্লামা নূরুদ্দিন সামহুদী তাঁর অফা–আল–অফা বইতে এবং বারযানজী তাঁর নিজ বইতে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

## হেজাযে অগ্ন্যুৎপাত

৬৫৪ হি মোতাবেক ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মদীনার হাররাহ শারকিয়ায় এক বিরাট অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। হাদীসে এই অগ্ন্যুৎপাতের ভবিষ্যদ্বাণী করে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'হেজাযে অগ্ন্যুৎপাতের আগে কিয়ামত সংঘটিত হবেনা।' বুখারী শরীফে আরো অতিরিক্ত এসেছে। 'হেজাযের আগুন উটের ঘাড় আলোকিত করবে।' রাফে বিন বিশর আস–সালামী নিজ বাপ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)এরশাদ করেছেন, 'সহসাই হোবস থেকে আগুন বের হবে এবং উটের গতিতে অগ্রসর হতে থাকবে। দিনে গতিশীল থাকবে এবং রাত্রে থেমে যাবে।' হোবস হচ্ছে মদীনার হাররাহ বনি সোলাইম এবং সোআইরিকিয়ার মধ্যবর্তী স্থানের নাম। হাররাহ বনি সোলাইম নাকী নামক স্থানের ঢালুতে এবং নাকী আকীক উপত্যকার উঁচু স্থানে অবস্থিত।

আগ্নেয়গিরির এই অগ্ন্যুৎপাতের আগে ভূমিকম্প হয়েছিল এবং এক দিনে ১৮বার ভূকম্পন অনুভব করা হয়েছে। এর ফলে মসজিদে নবওয়ীর মিম্বার কেঁপে উঠে এবং মসজিদের ছাদের প্রচন্ড আওয়ায শুনা যায়। কাসতালানী বলেছেন, একদিন শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ ঐ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে এবং আগ্নেয়গিরির উৎস স্থান থেকে উত্থিত ধোঁয়া আকাশ ছেয়ে ফেলে। মদীনার কাছে এসে ঐ আগুন নিভে যায়। সাগরের ঢেউয়ের মত আগুনের অগ্রসরতার প্রচন্ড আওয়ায শুনা গেছে। কোরতবী প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন, মদীনা থেকে ৫ দিনের দূরত্ব পর্যন্ত ঐ আগুন দেখা গেছে। কেউ কেউ বলেছেন, মক্কা থেকেও ঐ আগুন দেখা গেছে।

ঐ আগুন তিনমাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মাঝে মাঝে তা থেমে যেত। তিন মাস পর পূর্ণ থেমে যায়। আগুন পূর্ব হাররার মধ্য দিয়ে জাবালে ওয়াইরাহর

কাছে পৌছে এবং ওহোদ পাহাড়ের পূর্ব দিকে কানাহ উপত্যকা বরাবর হাররা আরীদে গিয়ে শেষ হয়। কাসতালানী বলেছেন, আগুন হারামে মদীনার উত্তরে জাবালে ওহোদের পূর্বে অবস্থিত ওয়াইরাহ পাহাড় পর্যন্ত পৌছে এবং সেখান থেকে হামযাহ উপত্যকার শেষ প্রান্তে অবস্থিত শাজাহ বা কানাহ উপত্যকায় এসে শেষ হয়। অর্থাৎ হারাম সীমান্তে এসে তা শেষ হয়। ফলে, আল্লাহ ঐ আগুন থেকে হারামে মদীনাকে রক্ষা করেছেন।

## মসজিদে নবওয়ীতে অগ্নিকান্ড

৬৫৪ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে (১২৫৮খৃঃ) হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত হেজাযের অগ্ন্যুৎপাত সংঘটিত হয়। একই সালের ১লা রমজান মসজিদে নবওয়ীতে আগুন লাগে। মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ষ্টোর থেকে ক্যান্ডেল আনার সময় খাদেম ভুলে নিজ হাতের বাতি ক্যান্ডেলের বাক্সের উপর রাখায় তাতে আগুন ধরে যায়। তিনি তা নিভাতে ব্যর্থ হওয়ায় আগুনের লেলিহান শিখা ষ্টোরের মাদুর ও অন্যান্য সামগ্রীতে লেগে বিকট রূপ ধারণ করে এবং ছাদে আগুন ধরে যায়। তারপর তা কিবলার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। লোকেরা সবাই আগুন নিভাতে ব্যর্থ হয়। এমনকি তদানীন্তন মদীনার গভর্ণরও আসেন এবং চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ফলে মসজিদের পুরো ছাদে আগুন লেগে যায়। মসজিদের মিম্বার, দরজা, বাক্স, কিতাব, কোরআন মজীদ, হুজরাহ শরীফের গেলাফ সব কিছু জ্বলে যায়। উমাইয়া খলীফাহ ওয়ালিদ ও আব্বাসী খলীফা মাহদীর নির্মিত মসজিদ ভবনের কোন কারুকার্য অবশিষ্ট থাকেনি। এমন কি একটি পূর্ণ কাঠও অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র ৫৭৬ হিজরীতে নাসের লি-দীনিল্লাহ কর্তৃক মসজিদের আঙ্গিনার মাঝখানে নির্মিত একটি গম্বুজ রক্ষা পায়। ঐ গম্বুজের ভেতর মসজিদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেমন, উসমান (রা) এর লিখিত কোরআন ও ৩০০ হিজরীতে নির্মিত কিছু ঐতিহাসিক বড় বাক্স রাখা হয়েছিল।

৮৮৬ হিজরী রমজান মাস মোতাবেক ১৪৮৪ খৃঃ মসজিদে নবওয়ীতে ২য়বার অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। প্রধান মুয়াযযিন শামসুদ্দিন বিন খাতীব পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত মিনারার কাছে আযান দিচ্ছিলেন। তখন আকাশে বিদ্যুত গর্জে ও বজ্রপাত হয়। বজ্রটি মসজিদের প্রধান-মিনারার উপর খচিত নবচাঁদে

এসে পড়ে এবং এর একটি ফুলকা পড়ে মসজিদের পূর্বাংশে। মুআযযিন বজ্রের শিকার হয়ে মারা যান এবং বজ্রপাতের কারণে মসজিদের ছাদে আগুন লাগে। লোকেরা মসজিদে নবওয়ীতে জড় হয় এবং আগুন নিভানোর জন্য বিশেষ বাহিনী চেষ্টা করে। কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা উত্তর ও পশ্চিমে দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। ফলে তা আয়ত্বের বাইরে চলে যায় এবং অগ্নি নির্বাপকবাহিনী রশি দিয়ে মসজিদের উত্তরের ছাদ থেকে নেমে আসে। ১০ ব্যক্তি নিহত ও বেশ কিছু লোক আহত হয়। আগুন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং মসজিদের পুরো ছাদ, ষ্টোর, কিতাব ও কোরআন শরীফ সহ অন্যান্য বহু জিনিস পুড়ে যায়। মসজিদের আঙ্গিনার মাঝামাঝি গম্বুজ থেকে কিছু জিনিস উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে মিম্বার, মেহরাব, দরজা ও প্রধান মিনারা জ্বলে যায়। গোটা মসজিদকে আগুনের সাগরের মত মনে হয়েছে। এমনকি মসজিদের পার্শ্ববর্তী ঘর সমূহের উপরও আগুনের ফুলকা পড়েছে। কিন্তু তাতে কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। লোকেরা ভয়ে ঘর-বাড়ী ছেয়ে পালিয়ে যায়। হুজরাহ মোবারকের ছাদের কাছ পর্যন্ত আগুন পৌছায় গম্বুজের শিশা গলে যায় এবং কাঠ পুড়ে যায়। সকাল বেলায় লোকেরা গম্বুজের আগুন নিভাতে সক্ষম হয়। উপরের শিশা গলে যাওয়ায় বহু পিলার ভেঙ্গে পড়ে।

২য় অগ্নিকান্ডের পর মিসরের শাসক কায়েতবায় মসজিদ নির্মাণ করেন। এ পর্যন্ত মসজিদে নবওয়ীতে আর কোন অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়নি।

## তুর্কীর উসমানী শাসনামলে মদীনা

৯২২ হিঃ মোতাবেক, ১৫১৯ খৃঃ মদীনায় উসমানী শাসনের সূচনা হয়। মক্কার গভর্ণর শরীফ ও মদীনার গভর্ণর শরীফ বারাকাত ৯২২ হিজরী সালে মিসরের উপর বিজয়ী তুর্কী সুলতান সলিম উসমানীর কাছে দুই হারাম শরীফের চাবি পাঠিয়ে দেন। শরীফ বারাকাত নিজ ছেলের মাধ্যমে চাবি পাঠান। এতে সুলতান সলিম খুশী হন এবং শরীফ বারাকাতকে মক্কা ও মদীনার গভর্ণর হিসেবে বহাল রাখেন। আর তাঁর ছেলেকে পিতার সহযোগী হিসেবে নিয়োগ করেন। উসমানী সুলতানগণ মদীনার প্রশাসনকে ৪ ভাগে ভাগ করেন। সেগুলো হচ্ছে,

১· ইসলামী বিচার বিভাগ ২· আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বিভাগ ৩· সামরিক বিভাগ। এই বিভাগের কাজ হল বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করা। এই বিভাগের প্রধানকে 'মোহাফেজ' বলা হত। ৪· শেখুল হারাম–আন–নবওয়ী। এই বিভাগটাই ছিল সর্বোচ্চা ক্ষমতার অধিকারী। তাই অন্যান্য বিভাগগুলো এই বিভাগের অধীন ছিল।

আদালতের বিচারপতি (কাদী)কে অবশ্যই তুর্কী হওয়া জরুরী ছিল এবং তাঁর কার্যকাল ছিল ১ বছর। পরের বছর নূতন বিচারপতি নিয়োগ করা হত। শেখুল হারাম পদে নিযুক্তির জন্য বিচারপতি হিসেবে অভিজ্ঞতা এবং ইস্তাম্বুলের মাশীখাতুল ইলরামে কাজের অভিজ্ঞতা সহ তুর্কী হওয়া জরুরী ছিল।

প্রত্যেক শুক্রবার শেখুল হারামের নিজ গৃহে প্রশাসনিক পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হত। উক্ত পরিষদ মদীনার মোহাফেজ, পুলিশ কর্মকর্তা, পৌরসভার চেয়ারম্যান, ৪ মাজহাবের মুফতী ও মদীনার নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ নিয়ে গঠিত হত। তারা মদীনার সমস্যা সমূহের সমাধানের বিষয়ে শলা–পরামর্শ করতেন। উসমানী সুলতানগণ মদীনাবাসীদের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন। ফলে পুনরায় স্থানীয় পর্যায়ে সাহিত্য ও জ্ঞান–গবেষণার চর্চা শুরু হয়। এই আমলেই মদীনার চার দিকে প্রতিরক্ষা দেয়াল তৈরী হয়। সুলতান আবদুল মজীদ উসমানীর আমলে (১২৬৫ হিঃ–১২৭৭ হিঃ) মসজিদে নবওয়ী নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়।

তুর্কীর উসমানী শাসনামলে দামেস্ক থেকে মদীনা পর্যন্ত রেল লাইন বসানো হয়। ফলে, মদীনার সাথে দামেস্ক হয়ে ইস্তাম্বুলের যোগাযোগ সুবিধে সহজতর হয়। এর ফলে ট্রেনে করে হাজীরা সহজে দামেস্ক, জর্দান, ফিলিস্তিন, ইরাক, তুর্কী ও ইউরোপ থেকে মদীনা হয়ে মক্কায় যাতায়াত শুরু করে। ১৩২৬ হিজরীতে রেল লাইন প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ৯ বছর যাবত তা অব্যাহত থাকে এবং মসজিদে নবওয়ীর অদূরে পশ্চিমে আম্বারিয়া রেল ষ্টেশন ভবনটি এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। রেল লাইনটি মদীনা থেকে দামেস্ক পর্যন্ত ১৩০৩ কিলোমিটার এবং মদীনা থেকে জর্দান পর্যন্ত ৮৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ছিল। রেল লাইন প্রতিষ্ঠার ফলে মদীনায় আমদানী–রফতানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু ১৩৩৫ হিজরীতে অনারব তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে আরব বিপ্লবের সময় ঐ রেল লাইনের বিরাট অংশ উড়িয়ে দেয়া হয় যাতে করে তুর্কী থেকে ট্রেনে

কোন সামরিক সরবরাহ না পৌছতে পারে।

তূর্কী শাসনামলে ১৩২৮ হিজরীতে মদীনার সামরিক কমান্ডার আলী রেদা পাশা রেকাবী 'হাসবাহ' শব্দের পরিবর্তন করে 'বালাদিয়া' নামকরণ করেন। উভয় শব্দের একই অর্থ। এর অর্থ হচ্ছে পৌরসভা। কিনতু 'হাসবাহ' শব্দটি হরত উমারের (রা) সময় থেকে প্রায় ১৩শ বছর চালু ছিল।

তূর্কী আমলের শেষদিকে তূর্কী শাসনের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদী বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। মদীনা ছিল আরব অঞ্চলে তূর্কী স্বার্থরক্ষার প্রধান সামরিক কেন্দ্র। তখন এতদঞ্চলের তূর্কী সামরিক গভর্ণর ছিলেন উমার ফখরী পাশা।

তূর্কী সরকার অবনতিশীল অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করতে পেরে ফখরী পাশাকে মদীনার প্রতিরক্ষার জন্য কিছু সৈন্য রেখে অবশিষ্ট বাহিনীকে সিরিয়ায় প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু উমার ফখরী পাশা সেই নির্দেশ অমান্য করে মদীনায় থেকে যায় এবং মসজিদে নবওয়ীতে অবস্থান নেয়। একদিন ফখরী পাশা ঘুমালে তার উর্ধতন সামরিক অফিসারগণ বিদ্রোহ করে এবং তাকে আটক করে। ১৩৩৭ হিজরীর জুমাদাহ উলা মাস মোতাবেক ১৯১৮ খৃঃ তাঁকে মক্কার বিদ্রোহী আরব শাসক শরীফ হোসাইন বিন আলীর কাছে সমর্পণ করে।

## মদীনায় আশরাফ বা হাশেমী শাসনের পুনরুত্থান

১৩৩৪ হিঃ মেতাবেক ১৯১৫ খৃঃ মক্কার শরীফ হোসাইন বিন আলী 'জমিয়তুল ইত্তেহাদ ওয়াত-তারাককী' গঠন করে তূর্কীদের বিরুদ্ধে আরব বিপ্লব ঘোষণা করেন। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য ছিল আরব ভূমির স্বাধীনতা এবং আরব ভূমির তূর্কীকরণ প্রচেষ্টার প্রতিরোধ করা। তূর্কী শাসকদের পরিকল্পনা ছিল জাযীরাতুল আরব ভূখন্ড থেকে আরবদেরকে তূর্কী এবং তূর্কীদেরকে আরব ভূখন্ডে পুনর্বাসন করা। আরব বিপ্লব তূর্কীদেরকে হেজায, সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ফিলিস্তিনে বেকায়দায় ফেলে এবং আরব ভূমি থেকে তূর্কীর উসমানী শাসনের অবসান কামনা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবরা বৃটেনের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং বিজয় লাভ করার পর নিজেদের স্বাধীনতার শর্ত আরোপ করে। বৃটেন তাতে

রাজী হয়। তখন আরবদের শক্তি–সামর্থের অভাবে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে বিজয় ও স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব ছিলনা। ১ম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী ও জার্মানীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর মিত্রবাহিনী আরবদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তাদেরকে স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করে। বরং তারা তুর্কী উসমানী সাম্রাজ্যকে ইউরোপের উপনিবেশ হিসেবে নিজেদের মধ্যে ভাগ–বাটোয়ারা করে নেয়। ফলে, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তিন, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত হয়। মিসর আগ থেকেই বৃটিশ উপনিবেশ ছিল। লিবিয়া, তিউনিশিয়া ও আলজিরিয়া নূতন করে ইতালী ও ফরাসী উপনিবেশে পরিণত হয়। কিন্তু মক্কা ও মদীনায় আশরাফ বা হাশেমী শাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

এই সময় মদীনা থেকে তুর্কী শাসন কর্তৃক উচ্ছেদকৃত মদীনাবাসীরা পুনরায় নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে আসেন। সরকার প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য মাসিক সাহায্য ভাতা চালু করে। দারিদ্র ও দুর্বলতা সত্ত্বেও তারা মদীনায় নূতন জিন্দেগী শুরু করে। তুর্কী শাসনের শেষ দিকে মদীনার জনসংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। কিন্তু পরে মাত্র ১৫ হাজার অধিবাসী ফিরে আসে।

শরীফ হুসাইনের ছেলে আলী জিদ্দায় বাদশাহ ঘোষিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মদীনা শাসন করেন। তাঁর আমলে মদীনার ডেপুটি আমীর নিয়োগ করা হয় আহমাদ বিন মানসুরকে। হোসাইন বংশের শরীফ শাহহাত পুরো হাশেমী বা আশরাফ শাসনামলে মদীনার শাসনভার পরিচালনা করেন।

## সৌদী শাসনামলে মদীনা

মদীনায় আশরাফ শাসন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কেননা, নাজদের বাদশাহ আবদুল আযীয আল সউদ ও হেজাযের বাদশাহ হুসাইন বিন আলীর মধ্যে খারমাহ ও তারবাহ নামক দুটো গ্রাম নিয়ে সীমান্ত বিরোধ দেখা দেয়। বাদশাহ হোসাইন বিন আলীর পক্ষ থেকে ঐ দুই গ্রামের নিযুক্ত শাসক খালেদ বিন লুআই স্বেচ্ছায় বাদশাহ আবদুল আযীযের সাথে নাজদে যোগ দেয়। ফলে তা হেজাযের শাসক হুসাইন বিন আলীর সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দুই বাদশাহর মধ্যে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে কোন সমাধান না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত হেজাযের বাদশাহ হুসাইন বিন আলী নজদবাসীদের হজ্জ আদায়ের উপর

নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই নিষেধাজ্ঞাই বাদশাহ আবদুল আযীযকে হেজায আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত ১৩৪৩ হিজরীর ১৪ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৯২৪ খৃঃ বাদশাহ আবদুল আযীযের হাতে মক্কার পতন এবং ১৩৪৪ হিজরীর ৪ঠা জুমাদাস সানী মোতাবেক ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জিদ্দার পতন হয়।

বাদশাহ আবদুল আযীযের বাহিনীর অধিনায়ক আদ-দোআইশ মদীনার দক্ষিণ দিক থেকে এবং আন-নাশমীর নেতৃত্বাধীন অপর বাহিনী শহরের উত্তর দিক থেকে মদীনা অবরোধ করেন। অবরোধ কঠিন হওয়ায় তা সহ্য করতে না পেরে মদীনাবাসীরা তাদের মধ্য থেকে দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদলকে বাদশাহ আবদুল আযীযের সাথে আলোচনার জন্য রিয়াদ পাঠান। তাঁরা বাদশাহ আবদুল আযীযের কাছে মদীনাবাসীদের আত্মসমর্পণের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁর একজন ছেলেকে মদীনায় পাঠানোর অনুরোধ জানান। তখন বাদশাহ আবদুল আযীয নিজ ছেলে মুহাম্মাদকে পাঠান এবং তাকে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি মদীনায় পৌছার পর তদানীন্তন মদীনার গভর্ণর শরীফ আহমদ বিন মানসুর শাহহাত তাঁর কাছে মদীনার শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৩৪৪ হিজরীতে ১৯শে জুমাদাল উলা মুতাবিক ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মদীনা সৌদী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। মদীনায় শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসার পর গভর্ণর মুহাম্মাদ বিন আবদুল আযীয রিয়াদ ফিরে যান এবং তার অধীন ডেপুটি গভর্ণর ইবরাহীম সাবহানের হাতে মদীনার শাসনভার অর্পন করেন। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সৌদী শাসনামলে মদীনার ব্যাপক উন্নতি হয়। এই আমলে মসজিদে নবওয়ীর সর্ববৃহৎ সম্প্রসারণ করা হয়।

# আধুনিক যুগের মদীনা

আবহমান কাল থেকেই মদীনা একটি কৃষি প্রধান এলাকা। মধ্যযুগে সেখানে পর্যাপ্ত ফল-মূল, গম-যব, সবজী-তরকারী, উদ্ভিদ, ঘাস ও খেজুরের চাষ হত। মদীনার খেজুর উৎকৃষ্ট। আধুনিককালে জনবসতির কারণে কৃষি এলাকার পরিমাণ কমে এসেছে। পূর্বে আরো বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষি কাজ হত। আগে আকীক উপত্যকার সর্বত্র কৃষি কাজ করা হত। আজকাল সেখানে জনবসতি। বর্তমানে সীমিত এলাকায় খেজুরের চাষ হয়। শীতকালীন বৃষ্টিপাতের ফলে যে স্রোতধারা সৃষ্টি হয়, এতে মাটির নীচের পানির স্তর বৃদ্ধি পায়। মদীনায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বেশী দূরে নয়। নিয়মিত পরিষ্কার ও পানি উত্তোলন অব্যাহত রাখা সত্বেও সাধারণতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ৮·৩৫ মিটারের নীচে নামেনা।[৭৮] তবে কোন কোন জায়গায় পানির স্তর ২০-৩৫ মিটার পর্যন্ত বিদ্যমান। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধির জন্য বৃষ্টির পানি আটকে রাখার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে বিমানবন্দর সড়কের পার্শ্বে ১· আল-আকুল বাঁধ ২· মসজিদে কুবা থেকে ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে বাতহা উপত্যকার বাঁধ ও ৩· মদীনা থেকে দক্ষিণে ৩ কিলোমিটার দূরে আকীক উপত্যকায় ওরওয়াহ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।

মদীনার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও কৃষি কাজের প্রয়োজনে ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ জানার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই মদীনার ১৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে জরীপ চালিয়ে দেখা যায় যে, মদীনা ও খাইবারের ভূগর্ভে প্রচুর পানি মওজুদ রয়েছে। মদীনার ভূগর্ভের ৭১০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ৬কোটি ঘনমিটার পানির মওজুদ আবিষ্কৃত হয়। ভূগর্ভস্থ পানিই পান করার জন্যউত্তম।

মদীনায় বর্তমানে দৈনিক ১লাখ ৭০ হাজার ঘনমিটার পানি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ৪০% কূপ থেকে এবং ৬০% লোহিত সাগরের লবনমুক্ত পানি থেকে সরবরাহ করা হয়। মদীনায় বর্তমানে ২৩টি কূপ চালু আছে।

---

৭৮· আল মদীনাতুল মোনাওয়ারাহ।। ডঃ উমার ফারুক সাইয়েদ রজব।

## আইনে যারকা

মদীনায় আমীর মুআওয়িআহর (রা) গভর্ণর মারওয়ান বিন হাকাম আইনে যারকা প্রবাহিত করেন। যারকা অর্থ নীল। মারওয়ানের চোখ নীলাভ ছিল। তাই উক্ত নালার নামকরণ করা হয়েছে 'আইনে যারকা' বা 'নীল নালা'। তিনি ৫১ হিঃ (৬৭৩খৃঃ) উক্ত নালা তৈরী করেন। বিরে আযরাক (আযরাক কূপ) থেকে এই নালায় পানি সরবরাহ করা হয়। কুবা মসজিদের পশ্চিমে জাফরিয়া এলাকায় বিরে আযরাক অবস্থিত। পরে কুবা মসজিদের নিকট আরো ৯টি কূপ খনন করে উক্ত নালায় পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়। ৫৬০ হিজরীতে এই নালা মসজিদে নবওয়ী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয় এবং মানাখা সহ বাবুস সালাম এলাকায় পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। মদীনার মুসলিম শাসকগণ বিভিন্ন সময় আইনে যারকার পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করেছেন এবং তাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছেন। ১৯৮০ খৃ (১৩৯৮ হিঃ) ইয়াম্বু থেকে লবনমুক্ত পানি সরবরাহের আগ পর্যন্ত আইনে যারকা গত ১৩শ শতাব্দী যাবত মদীনায় পানি সরবরাহের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হত।

সৌদী সরকার আইনে যারকার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় এবং ১৯২৬ খৃঃ (১৩৪৪ হি) 'আইনে যারকা সংস্থা' কায়েম করে আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এর সাথে কুবা ও সালা' পাহাড়ে দুটো পানি সংরক্ষণ ট্যাংক নির্মাণকরে।

১৯৭৮ খৃঃ (১৩৯৮ হিঃ) সরকার মদীনার জন্য পানি ও সুয়েরেজ বিভাগ গঠন করে এবং এর সাথে আইনে যারকার প্রশাসনকে যুক্ত করে দেয়।

## লবনমুক্ত পানি সরবরাহ প্রকল্প

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও কৃষিকাজে সেচের কারণে মদীনা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে গেছে। আইনে যারকার পানি ঘরে ঘরে পাইপ ও টেপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধির কারণে আইনে যারকার সরবরাহ যথেষ্ট নয়। তাই ৭-৪-১৩৯৮ হিঃ (১৯৮০ খৃঃ) সৌদী Saline Water Conversion Corporation মদীনায় লবনমুক্ত পানি সরবরাহের প্রথম পর্যায়ে পানি সরবরাহ শুরু করে। এই প্রকল্পটি লোহিত সাগরের তীরে ইয়াম্বু

সামুদ্রিক বন্দর থেকে ৪১ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। মদীনা পর্যন্ত ১৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইন বসানো হয়েছে এবং পাইপের প্রশস্ততা হচ্ছে ২২ ইঞ্চি। এই পাইপ লাইন সারাওয়াত পাহাড়, বদর আল-সাফরা উপত্যকা, আল-মিসাইজিদ, আল-ফিরাইস, আল-মুফরিহাত হয়ে কুবা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এটি কুবার ১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ৯০ হাজার ঘনমিটার পানি ধারণকারী ট্যাংকে এসে জমা হয় এবং সেখান থেকে শহরে সরবরাহ করা হয়। এই পানির টাওয়ারটি দেখতে খুবই সুন্দর। তাতে একটি রেস্তোরা ও একটি হলরুম আছে। এই প্রকল্পটির উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে, দৈনিক ৬০·৮ মিলিয়ন গ্যালন। এর মধ্যে ২৫ মিলিয়ন গ্যালন মদীনায় এবং ৫ মিলিয়ন গ্যালন ইয়াম্বুতে সরবরাহ করা হচ্ছে। ঐ কেন্দ্রে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুতও উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে ২০০ মেগাওয়াট মদীনায় এবং ৫০ মেগাওয়াট ইয়াম্বুতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

## বিদ্যুত

১৩২৬ হিঃ (১৯০৬ খৃঃ) তুর্কী শাসনামলে মদীনায় রেল লাইন প্রতিষ্ঠাকালে প্রথম বিদ্যুত চালু হয়। উসমানী শাসক মসজিদে নবওয়ীর উত্তরে দারুদ দেয়াফায় এক জেনারেটর বসান এবং তার মাধ্যমে মসজিদে নবওয়ীতে বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তারপর মসজিদ সম্প্রসারণের সময় তা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং ১৩৭৫ হিঃ (১৯৫৫ খৃ) মসজিদে নবওয়ী থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে আবইয়ারে আলীতে এক শক্তিকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। ১৯৫৭ সালে মদীনা বিদ্যুত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা মসজিদে নবওয়ী সহ মদীনার সর্বত্র বিদ্যুত সরবরাহের দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

## মদীনায় ইলম ও ফিকাহ শাস্ত্রের সেবা

ইসলামের জন্য জ্ঞান প্রয়োজন। আর সেই জ্ঞানের সাধনা ছাড়া ইসলামের প্রচার-প্রসার কোনটাই সম্ভব নয়। অন্যকথায়, ইসলামের অস্তিত্ব জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রথম থেকেই ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য মদীনায় জ্ঞান চর্চা শুরু হয়। মসজিদে নবওয়ী হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন স্বয়ং নবী করিম (সা) তারপর তাতে অগণিত

ছাত্র-শিক্ষকের সমাবেশ ঘটেছে এবং বহু শিক্ষার্থী সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করেবেরিয়েছেন।

নবুওয়াতের বিদ্যালয় থেকে বহু পুরুষ ও মহিলা সাহাবী শিক্ষা লাভ করে বেরিয়েছেন। মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরাতের আগে মুসআব বিন উমাইর (রা) কে কোরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য মদীনায় পাঠান। তারপর আবু বকর সিদ্দিক, উমার বিন খাত্তাব, উসমান বিন আফফান, আলী বিন আবি তালেব, মুআজ বিন জাবাল, যায়েদ বিন সাবেত, আবদুল্লাহ বিন সালাম, আবু হুরায়রাহ, আবু যার গিফারী, আয়েশাহ বিনতে আবু বকর, হাফসাহ বিনতে উমার (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রা) আলেম ও ফিকাহবিদ হিসেবে বিবেচিত হন।

এর পরবর্তী দলে যাঁরা আছেন, তারা হচ্ছেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন উমার, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ প্রমুখ। এর পরবর্তী দলের উলামা ও ফিকাহবিদরা হচ্ছেন উরওয়া বিন যোবায়ের, কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর, আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসাইন, আমের বিন আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের, সাঈদ বিন মোসাইয়েব, মুহাম্মাদ বিন শেহাব যোহরী, মুহাম্মাদ বিন মুনকাদের, জাফর সাদেক, মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন মুগীরাহ, ইমাম মালেক বিন আনাস, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া লাইসী, ইমাম শাফেঈ প্রমুখ। এছাড়াও আরো বহু সংখ্যক উলামা এবং ফিকাহবিদ রয়েছেন যাঁরা মদীনায় ইলম চর্চা করেছেন। অনেকে, মদীনা থেকে ইলমের খেদমতে বাইরে গিয়ে ইন্তিকাল করেছেন।

মদীনা থেকে শুধু আলিম ও ফিকাহবিদই বের হননি। বরং অগণিত বিচারক, বক্তা, রাজনীতিক, সংস্কারক, সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা, সাহিত্যিক, লেখক ও গ্রন্থকারও বেরিয়েছেন। দীর্ঘ ১৪শ বছর ব্যাপী ফজর থেকে ইশা পর্যন্ত মসজিদে নবওয়ীতে জ্ঞান চর্চা অব্যাহত আছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়।

## শিক্ষা সুবিধে

বর্তমানে, সৌদী শাসনামলে মদীনার শিক্ষা সুবিধে নিম্নরূপঃ

**১. স্কুলঃ**

ছেলেদের স্কুলঃ প্রাথমিক স্কুল ২০৮, মাধ্যমিক স্কুল ৬৩, সেকেন্ডারী স্কুল ২০ এবং মাধ্যমিক স্কুল ট্রেনিং কলেজ ১।

মেয়েদের স্কুলঃ প্রাথমিক স্কুল ১৭৯, মাধ্যমিক স্কুল ৬১, সেকেন্ডারী স্কুল ২৮, শিক্ষিকা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ১ এবং নার্সারী স্কুল ৩টি।

**২. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা। এটি আকীক উপত্যকার পশ্চিম সীমান্তে আল-জামাওয়াত পাহাড়ের উত্তর-পূর্বে শাহী প্রাসাদের দক্ষিণে এবং মসজিদে নবওয়ী থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি ২৫/৩/১৩৮০ হি (মোতাবেক ১৯৬০ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে উদ্দেশ্য হলঃ ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষা শিক্ষা দান করা যাতে করে শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার সাথে ইসলামকে পেশ করতে পারেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানীয় ছাত্র ছাড়াও বিদেশী ছাত্ররা লেখাপড়া করেন এবং তাদেরকে বৃত্তি দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি বিভাগ আছে। সেগুলো হচ্ছেঃ ১· কোরআন ও ইসলামী শিক্ষা ২· হাদীস ও ইসলামী শিক্ষা ৩· আরবী ভাষা ৪· দাওয়াহ ও উসূলে দীন এবং ৫· শারীআহ বিভাগ। তাছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১টি মাধ্যমিক ইনষ্টিটিউট, ১টি সেকেন্ডারী ইনষ্টিটিউট, মদীনার দারুল হাদীস, মক্কার দারুল হাদীস ও একটি আরবী ভাষা ইনষ্টিটিউট আছে।

## হাদীস ও সীরাতুন্নবী সেন্টার

সৌদী সরকার ১৪০৭ হিঃ মোতাবেক, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মদীনায় 'মারকায খিদমাতুস সুন্নাহ ওয়াস সিরাতুন নাবাওইয়াহ' অর্থাৎ 'হাদীস ও সীরাতুন্নবী সেন্টার' কায়েম করে। এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল, ইসলামের সেবা করা। বিশেষ করে হাদীস ও রাসূলুল্লাহর (সা) জীবন-চরিতের খিদমতের উদ্দেশ্যে হাদীস ও হাদীসের বর্ণনাকারীদের বিশ্বকোষ তৈরী এবং এগুলোর বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিরোধী সমালোচনার জবাব দান করে ইসলামের সেবা আঞ্জাম দেওয়া।

একই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর পান্ডুলিপি, বই-পুস্তক ও দলীল-দস্তাবেজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করছে। এর মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্র ও রাবী শাস্ত্রের বিশ্বকোষ তৈরী করা হবে এবং সীরাতুন্নবীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদক্ষেপ নেয়া হবে। এছাড়াও কেন্দ্রটি হাদীস ও সীরাতুন্নবীর উপর লেখা বিভিন্ন বই সম্পাদন ও সংশোধন করছে এবং এগুলোর উপর সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেন্দ্রটি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় হাদীসের অনুবাদ, হাদীসের উপর গবেষণা এবং দেশের ভেতর ও বাইরের সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের সাথে একই বিষয়ে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করছে।

কেন্দ্রের মূল লক্ষ্যে পৌছার উদ্দেশ্যে প্রতিটি গবেষকের জন্য এর ভেতর পৃথক পৃথক লাইব্রেরী কায়েম করা হয়েছে। লাইব্রেরীগুলো প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই পুস্তকে সমৃদ্ধ। এতে হাদীস ও সীরাতুন্নবীর পান্ডুলিপির জন্য একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে।

### ১. লাইব্রেরীঃ

মসজিদে নবওয়ীর লাইব্রেরীঃ লাইব্রেরী হচ্ছে জ্ঞানের উৎস। ইসলাম জ্ঞান শিক্ষাকে ফরজ করেছে। মসজিদে নবওয়ীর যেয়ারতকারী ও মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সৌদী সরকার ১৯৩৯ খৃঃ (১৩৫৯ হিঃ) এই লাইব্রেরীটি কায়েম করেন। এতে মোট বই এর সংখ্যা ৫ হাজারেরও অধিক এবং তাতে প্রায় ৬শ পান্ডুলিপি রয়েছে। লাইব্রেরীতে মহিলাদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। গত ২২/১২/১৯৯০ খৃঃ বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয লাইব্রেরীর নূতন ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। লাইব্রেরীর এক পার্শ্বে হুজরায়ে নবওয়ীর মওজুদ বিভিন্ন জিনিসের একটি যাদুঘর নির্মাণ করা হয়। যাতে করে ঐ সকল ঐতিহাসিক ও বরকতপূর্ণ জিনিসের সুষ্ঠু হেফাজত করা সম্ভব হয়।

### ২. শেখুল ইসলাম আরিফ হেকমত লাইব্রেরীঃ

এটি মসজিদে নবওয়ীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, ১৮৪৮খৃঃ (১২৭০ হিঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে মোট ২০০৮ টি বই আছে এবং পান্ডুলিপির সংখ্যা হচ্ছে ৪৭১৮। শেখুল ইসলাম আরিফ হেকমত লাইব্রেরীর জন্য একটি ট্রাষ্ট গঠন করেন এবং মদীনা ও ইস্তাম্বুলের আদলতে তা রেজিষ্ট্রি করেন।

### ৩. বাদশাহ আবদুল আযীয লাইব্রেরীঃ

মানাখায় এটি ৬ তলা বিশিষ্ট একটি বড় লাইব্রেরী। এর আয়তন হচ্ছে ২৩০৯ বর্গমিটার। দুইটা ঝর্ণাসহ সামনে একটি বাগান আছে। উসমানী সুলতান মাহমুদ ১৮৫০ খৃঃ (১২৭২ হিঃ) মসজিদে নবওয়ীর পশ্চিমে মাহমুদিয়াহ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। এতে মোট ৩০৭২টি বই ও ৪৭১৮টি পান্ডুলিপি ছিল। পরে তা সহ আরো ১৫টি ব্যক্তিগত লাইব্রেরী বাদশাহ আবদুল আযীয লাইব্রেরীর অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হয়।

### ৪. মদীনা পাবলিক লাইব্রেরীঃ

সৌদী সরকার ১৯৬৬ খৃঃ (১৩৮০ হি) মসজিদে নবওয়ীর দক্ষিণে মদীনা পাবলিক লাইব্রেরী কায়েম করেন। এটি শারীয়াহ কোর্ট সংলগ্ন। এতে মোট ১৪,৭৪৮টি বই ও পান্ডুলিপি আছে। এতে ১৩টি ব্যক্তিগত লাইব্রেরীও অন্তর্ভূক্ত করাহয়েছে।

মসজিদে নবওয়ী হচ্ছে সর্বাধিক প্রাচীন জ্ঞানের আধার। রাসূলুল্লাহ (সা) এতে যে জ্ঞানদানের সূচনা করেন, তা আজ পর্যন্তও বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলেম ও বক্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন। এছাড়াও হজ্জ মওসুমে বিভিন্ন ভাষাভাষি অনুবাদক ও বক্তার মাধ্যমে মসজিদে বক্তৃতা ও ইসলামী জ্ঞানদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

## বাদশাহ ফাহাদ কোরআন কমপ্লেক্স

কোরআন হচ্ছে মুসলমানদের শাসনতন্ত্র। আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর উপর নাযিলকৃত এই কিতাবটি গোটা মানবতার মুক্তিসনদ। তাই আল্লাহ এই কিতাবকে যে কোন বিকৃতি থেকে রক্ষার ওয়াদা করে বলেছেনঃ 'আমরাই এই কিতাব নাযিল করেছি এবং আমরাই তার হেফাজত করবো।' (সূরা আল-হিজর-৬) তাই দুশমনদের পক্ষথেকে এই কোরআনকে বিকৃত করে ছাপানো সত্বেও কোথাও তা টিকেনি। বরং গোটা বিশ্বের সর্বত্র একমাত্র সহীহ ও বিশুদ্ধ কোরআনই সম্পূর্ণ অবিকৃত রয়ে গেছে।

কোরআনের খেদমত এবং এর পাশাপাশি দুশমনের ষড়যন্ত্র থেকে কোরআনকে সংরক্ষন করার উদ্দেশ্যে সৌদী বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল
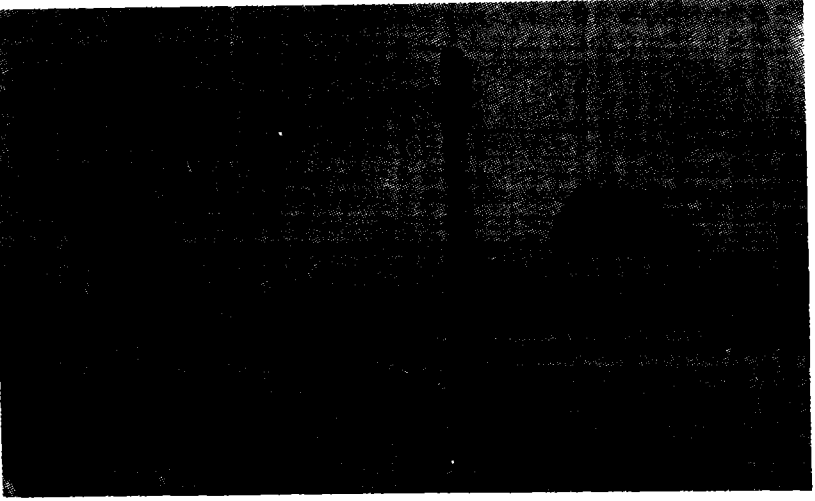
বাদশাহ ফাহাদ কোরআন কমপ্লেক্স

আযীয ১৯৮৫ খৃঃ বাদশাহ ফাহাদ কোরআন কমপ্লেক্স তৈরী করেন। কোরআন শরীফ ছাপার ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ছাপাখানা। এই ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত কোরআনকে 'মাসহাফুল মদীনাহ আল-মোনাওয়ারা' নামকরণ করা হয়। এটি তাবুক সড়কে ২লাখ ৩০ হাজার বর্গ মিটার জমির উপর নির্মাণ করা হয়।

এই কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হচ্ছেঃ

১· প্রতি বছর এখান থেকে ৮০ লাখ কপি কোরআন প্রকাশ করা। এর মধ্যে ১লাখ কপি রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় কোরআনের অর্থ ও তাফসীর। এগুলো বিশ্বব্যাপী বিনামূল্যে বিলি করা হয়।

২· বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় কোরআনের অর্থ ও তাফসীর প্রকাশ।

৩· কোরআন ও কোরআনের তাফসীর রেকর্ড করে ক্যাসেট ও ভিডিও ক্যাসেট প্রকাশ ও বিলি করা।

৪· কোরআন ও এর তাফসীর প্রকাশে গুরুত্ব প্রদান।

৫· এই কমপ্লেক্সকে কোরআনের সূক্ষ্ম ও ব্যাপক গবেষণার কেন্দ্রে পরিণত করা এবং এই উদ্দেশ্যে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা।

# মদীনা যেয়ারতকারীদের জন্য বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সেবা

## স্থানীয়প্রশাসন

মদীনার একজন গভর্ণর আছেন। তিনি ঐ অঞ্চলের সকল সরকারী বিভাগের তৎপরতা তদারক করেন। গভর্ণর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ঐ অঞ্চলের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকর্তা।

## হজ্জ কমিটি

হাজীরা মক্কায় হজ্জ করতে আসেন ও মদীনায় যান এবং মসজিদে নবওয়ী যেয়ারত করেন। যদিও তা হজ্জের কোন অংশ নয়, তথাপি অধিকাংশ হাজীর পক্ষে ২য়বার মদীনায় আসার সুযোগ নাও হতে পারে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হাজী হজ্জ উপলক্ষে মদীনা যেয়ারতে যান।

মদীনায় হাজীদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে একটি হজ্জ কমিটি আছে। মদীনার গভর্ণর উক্ত কমিটির সভাপতি। ঐ কমিটির অধীন আরো কতগুলো সাব-কমিটি আছে। যেমনঃ ১. সমন্বয় কমিটি ২. বাসস্থানের উপযোগিতা ও ভাড়া নির্ধারণ কমিটি ইত্যাদি। সমন্বয় কমিটি সকল বিভাগের তৎপরতা সমন্বয় করে।

## দাউদিয়া সেন্টার

১৪০৭ হিঃ মোতাবেক ১৯৮৬ সালে এই কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়। মূলতঃ এটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কমপ্লেক্স। হজ্জের সাথে জড়িত সকল সরকারী ও বেসরকারী বিভাগের শাখা অফিস এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এতে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পৌরসভা, যোগাযোগ, বিদ্যুত, পানি সরবরাহ, পাসপোর্ট, হজ্জ ও ওয়াকফ, ট্রাফিক, বেসামরিক প্রতিরক্ষা, আদিল্লা সংস্থা, বয় স্কাউট এবং বিভিন্ন ব্যাংকের শাখাসমূহ রয়েছে। প্রতিবছর ১০ই জিলকা'দাহ থেকে এতে কাজ শুরু হয় এবং হজ্জ মওসূমের শেষ নাগাদ কাজ অব্যাহত থাকে। এই সেন্টারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কয়েকটি কমিটি গঠন

করা হয়। সেগুলো হচ্ছেঃ ১· অভিযোগ গ্রহণ কমিটি ২· মসজিদে নবওয়ীর চার পাশ সহ হাজীদের অবস্থান স্থলে বিভিন্ন মসজিদ এবং যিয়ারতের স্থানসমূহে পানি, বিদ্যুত ও পরিচ্ছন্নতা সেবা ঠিকমত চলছে কিনা সেগুলো তদারকীর জন্য এই কমিটি কাজ করে। ৩· হাজীদের থাকার ঘর তদারককারী কমিটি। তারা হাজীদের কাছ থেকে অভিযোগ শুনে তা দূর করার চেষ্টা করে। ৪· মসজিদের আঙ্গিনা, ফুটপাথ, মাঠ ও পার্কে বিছানা পেতে হাজীদের থাকা বন্ধ করার জন্য এই কমিটি কাজ করে। কেননা, হাজীদের ঘরে বাস করা উচিত এবং ঘরভাড়াও হাজীদের আয়ত্বের বাইরে নয়। ৫· গাড়ী তদারককারী কমিটি হাজীদের নিয়ে গাড়ী মদীনা থেকে রওনা দেয়ার আগে তা পরীক্ষা করে দেখে থাকে।

সকল বিভাগের সুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষ্য অর্জনে দাউদিয়া সেন্টার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

## মদীনা আদিল্লা সংস্থা

হজ্জ উপলক্ষে হাজীরা সাধারণত মদীনা যেয়ারতে যান। হাজীদের সেবার উদ্দেশ্যে একান্তভাবে আদিল্লা সংস্থা গঠন করা হয়েছে। আদিল্লার একবচন হচ্ছে দলীল। দলীল শব্দের অর্থ হল পথ প্রদর্শক। এই সংস্থা মদীনায় হাজীদের সেবা যত্ন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দিয়ে থাকে। এটা মক্কার তওয়াফ সংস্থার অনুরূপ দায়-দায়িত্ব পালন করে।

এই সংস্থা হাজীদের স্বাগত জানায়, থাকার ঘর ও যেয়ারত সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে, আরামের সাথে থাকা সহ সকল বিষয়ে তদারক করে, মসজিদে নবওয়ী যিয়ারতের সময় লোক দিয়ে সাহায্য করে, মক্কা ও জিদ্দাগামী হাজীদের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত গাড়ী হাজির করে, নিয়মিত খোঁজ-খবর নেয়, নিখোঁজ হাজী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলকে অবহিত করে, অসুস্থ হাজীকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। মৃত হাজীদের ব্যাপারে মক্কা ও মদীনার হজ্জ প্রশাসনকে অবগত করে, পাসপোর্ট রেখে একটি পরিচয়পত্র দেয়, মক্কা ও জিদ্দাগামী হাজীদের গাড়ী সংস্থার কাছে তালিকা পেশ করে এবং হাজীদের প্রতি তাদের অভিভাবক হিসেবে সেবা দান কর।[৭৯]

## হজ্জ মন্ত্রণালয়ের সেবা

হজ্জ মন্ত্রণালয় হাজীদের সেবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তৎপরতা চালায়। মন্ত্রণালয় সমন্বয় বিভাগের সাথে এক সাথে কাজ করে এবং হাজীদের যাবতীয় সুযোগ–সুবিধে নিশ্চিত করে। একই লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় দাউদিয়া সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক মসজিদগুলোর সংস্কার ও পুনঃ নির্মাণ করে থাকে।

হজ্জ মন্ত্রণালয়ের ওয়াকফ বিভাগ মদীনার ওয়াকফ সম্পত্তি ও ভবনসমূহের তদারক করে। এই বিভাগ ওয়াকফ ভবনসমূহের ভাড়া নির্ধারণ ও মসজিদে নবওয়ীসহ অন্যান্য মসজিদগুলোতে সরঞ্জাম সরবরাহ করে থাকে।

## স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

রাসূলুল্লাহর (সা) শহর মদীনায় স্বাস্থ্য সুবিধে পর্যাপ্ত। জনগণ, হাজী ও যেয়ারতকারীগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল সুযোগ–সুবিধে ভোগ করতে পারেন। বর্তমানে সেখানে মোট ২০টি হাসপাতাল আছে। এর মধ্যে ৯টি হচ্ছে শহরে এবং বাকীগুলো পার্শ্ববর্তী এলাকায়। হাসপাতালের আসন সংখ্যা হচ্ছে ৮৭০। স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে ১৩০টি। এর মধ্যে শহরে আছে ৭৬টি এবং বাকীগুলো নিকটবর্তী এলাকায়। মসজিদে নবওয়ীর কাছে ২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। এগুলো ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে এবং যেয়ারতকারীদের স্বাস্থ্য সেবা দান করে।

## তথ্য মন্ত্রণালয়

মদীনায় প্রয়োজনীয় তথ্য সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানাখা সড়কে তথ্য মন্ত্রণালয় শাখা ও জুলহোলায়ফায় টিভি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মসজিদে নবওয়ী থেকে নামায প্রদর্শন ও প্রচারের জন্য মসজিদের ভেতর রেডিও, টেলিভিশন নেটওয়ার্ক রয়েছে। মদীনা থেকে ১৯৩৬ খৃঃ সর্বপ্রথম বেসরকারী পর্যায়ে সাপ্তাহিক আল–মদীনা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ খৃঃ তা জিদ্দায় স্থানান্তরিত হয় এবং সেখান থেকে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে যা আজ পর্যন্তও অব্যাহত আছে।

---

৭৯· আল মদীনাতুল মোনাওয়ারাহ।। ডঃ উমার ফারুক সাইয়েদ রজব।

## ডাক ও তার মন্ত্রণালয়

১৩১৮ হিজরীতে তুর্কী শাসনামলে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ ও ১৩৩৫ হিঃ টেলিফোন লাইন উদ্বোধন করা হয়। সৌদী শাসনামলে এগুলোর আরো উন্নতি সাধন করে তা কম্পিউটারের আওতায় আনা হয়। মদীনায় বর্তমানে কেন্দ্রীয় একচেঞ্জের সংখ্যা হচ্ছে ২১ এবং প্রতিটিতে ১০০টি লাইন আছে। ১৩৭৬ হিঃ বেতার টেলিফোন পদ্ধতি চালু হওয়ায় মদীনা থেকে দেশের ভেতর ও বাইরে যে কোন সময় সহজে যোগাযোগ করা যায়।

অনুরূপভাবে, ডাক ব্যবস্থারও প্রচুর উন্নতি হয়। প্রথমে উট, পরে গাড়ী ও সর্বশেষ বিমানে করে ডাক চলাচল শুরু হয়। বিশ্বের সর্বত্র ডাক যোগাযোগ সহজ হওয়ায় হাজী ও যেয়ারতকারীদের যথেষ্ট সুবিধে হয়। এখান থেকে বছরে গড়ে বর্তমানে ৬ মিলিয়ন ডাক বিভাগীয় জিনিস বাাইরে এবং বাইর থেকে ৯ মিলিয়ন ডাক বিভাগীয় জিনিস এখানে পৌছে।

## মদীনা পৌরসভা

উলামা ও বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনাই হচ্ছে সর্বপ্রথম পৌরসভা। ইসলামের ২য় খলীফাহ হযরত উমার ফারুক (রা) আমর বিল মারুফ ও নেহি আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ) এর দৃষ্টিকোণ থেকে 'দারুল হাসবাহ' গঠন করেন। এর প্রধানকে বলা হত 'আল-মোহতাসেব'। তাঁর দায়িত্ব ছিল মদীনার মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের বিষয়াবলী, যেমন, তাদের নিরাপত্তা বিধান, ধোঁকা ও প্রতারণার প্রতিরোধ, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা সহ যাবতীয় কল্যাণমূলক কাজ করা। তিনি জেলদানসহ অন্যান্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারতেন। এরপর অন্যান্য শহরগুলোতে এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। মূলকথা আজকের যুগের পৌরসভাসমূহের যে কাজ দারুল হাসবাহ সেই কাজই করত।

হযরত উমার ফারুক (রা) জনগণের জীবনের সকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি ঘর-বাড়ী ও আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং কেউ তা উপেক্ষা করলে তাকে শাস্তি দিতেন। লিসানুল আরব গ্রন্থের ১২শ খন্ডে উল্লেখ আছে, খলীফা উমার একবার মক্কায় গিয়ে লোকদেরকে তাদের ঘর-বাড়ীর আঙ্গিনা ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার নির্দেশ

দেন। পরে তিনি পরিদর্শনে বের হন এবং দেখেন আবু সুফিয়ানের বাড়ীর সামনের আঙ্গিনা অপরিষ্কার। তিনি আবু সুফিয়ানকে তা পরিষ্কার করার নির্দেশ দেন। আবু সুফিয়ান বলেন, চাকর ঘরে ফিরে আসলে সে পরিষ্কার করবে। উমার ২য় বার পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন যে আঙ্গিনা পরিষ্কার করা হয়নি। তিনি তখন আবু সুফিয়ানকে বেত্রাঘাত করেন।

তূর্কী সুলতানের আগ পর্যন্ত ঐ পদ্ধতি বহাল ছিল। পরে উসমানী সুলতানগণ ঐ পদ্ধতির পরিবর্তে পৌরসভা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। ১৯৮২ খৃঃ (মোতাবেক ১৪০২ হিঃ) পৌরসভাকে পৌর কর্পোরেশন করা হয় এবং তাকে প্রশাসনিক দায়িত্বসহ শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, বৃক্ষরোপন, রাস্তা বিদ্যুতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পৌরকর্পোরেশনকে ৯টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক শাখার জন্য পৃথক ব্যবস্থাপনা রয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত পৌর কর্পোরেশন মোট ৬০টি বাগান প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাতে আলো-পানি, শিশু উদ্যান ও সৌন্দর্য করণের ব্যবস্থা করেছে। প্রতিটা বাগানের সাথে রয়েছে মসজিদ, স্কুল, বাণিজ্যিক এলাকা, আবাসিক এলাকা ও গাড়ীর পার্ক।

## স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেবা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মদীনার আইন-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। সেজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে করে হাজী ও যিয়ারতকারীসহ মদীনার নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা হয়। মসজিদে নবওয়ীর পার্শ্বে মানাখায় হারামে নবওয়ীর পুলিশের কেন্দ্র বিদ্যমান। মসজিদের প্রতি দরজায় সশস্ত্র পুলিশ পাহারারত অবস্থায় আছে।

## রেড ক্রিসেন্ট

এটাকে আরবীতে হেলালে আহমার বলা হয়। এটি অসুস্থ হাজী ও যিয়ারতকারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং হাসপাতালে পৌছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এটির সেবা স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের পরিপূরক।

## মসজিদে নবওয়ীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নবওয়ীর প্রশাসনের জন্য 'জেনারেল প্রেসিডেন্সী ফর হারামাইন শরীফাইন' নামক আলাদা একটা প্রশাসনিক সংস্থা রয়েছে। তাতে মসজিদে নবওয়ীর একটি শাখা আছে। এতে ১জন প্রেসিডেন্ট ও হারামে মক্কী ও হারামে মাদানীর জন্য দু'জন ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন। তাঁরা মসজিদে নবওয়ীর সকল বিষয় দেখা শুনা করেন।

## পাবলিক টয়লেট

মসজিদে নবওয়ীর চার পার্শ্বে অনেকগুলো পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যান্য ঐতিহাসিক মসজিদগুলোতেও নারী-পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোতে অজু, পেশাব-পায়খানা ও গোসলের ব্যবস্থা আছে।

## মদীনা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা

মদীনার সাথে সৌদী আরবের সকল শহরের উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। মদীনার মর্যাদা ও সারা বছর যিয়ারতকারীদের আগমণের কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তম না করে উপায় নেই। তাই মদীনার সাথে আন্তঃশহর যোগাযোগের জন্য বড় বড় রাস্তা রয়েছে। অনুরূপভাবে শহরের আভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাটওপর্যাপ্ত।

মদীনার আভ্যন্তরীন যোগাযোগের সুবিধার্থে তিনটি রিং রোড রয়েছে। ১মটি মসজিদে নবওয়ীর চারপাশে নির্মিত হয়েছে। এর বর্তমান নাম হচ্ছে বাদশাহ ফয়সল সড়ক। ২য় রিং রোড এর ধৈর্ঘ ২৭ কিলোমিটার ও প্রস্থ ৮৪ মিটার। দ্বিমুখী সড়কের প্রতি দিকে ৩টি করে ট্র্যাক, মাঝে ১৫ মিটার চওড়া আইল্যান্ড ও পার্শ্বে সার্ভিস রোড আছে। ৩য় রিং রোডের দৈর্ঘ ৮০ কিলোমিটার ও প্রশস্ততা হচ্ছে ১০০ মিটার। দ্বিমুখী সড়কটির মাঝখানে আইল্যান্ড ও পার্শ্বে সার্ভিস রোডেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

মদীনার ব্যাপক উন্নয়নের জন্য মন্ত্রীপর্যায়ের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটি তার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

মদীনার ৪টি প্রবেশ পথ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছেঃ

**১. উত্তর প্রবেশ পথঃ** এটি ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ। এটি মদীনা–তাবুক সড়কের জাসারুল ওয়াদী থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রসিংএ এসে মিশেছে। এটি ৬৪ মিটার চওড়া। এতে মোট ৮২৬ মিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ আছে। সুড়ঙ্গের উপর দিয়ে তাইয়েবা রাজপ্রাসাদে যাওয়ার জন্য একটি পুল নির্মাণ করা হয়েছে।

**২. পূর্ব প্রবেশপথঃ** এটি মসজিদে নবওয়ী থেকে বিমানবন্দর এবং পরে আল–কাসিম–রিয়াদ সড়কের সাথে গিয়ে মিশেছে। এটি শাহজাদা আবদুল মজিদ সড়ক থেকে শুরু করে ২য় রিং রোড অতিক্রম করে ৩য় রিং রোডের ক্রসিং–এর সাথে মিশেছে। এটি ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ।

**৩. দক্ষিণ প্রবেশপথঃ** হিজরাহ সড়ক থেকে জুল–হোলায়ফার মীকাত এবং সেখান থেকে কুবা সুড়ঙ্গপথ পর্যন্ত দীর্ঘ এই রাস্তাটি অন্যতম প্রবেশপথ।

**৪. মক্কা—জিদ্দা সড়ক প্রবেশ পথঃ** নূতন মক্কা–জিদ্দা একপ্রেস রোড কুবায় এসে মিশেছে। সেখান থেকে মসজিদে নবওয়ী পর্যন্ত দীর্ঘ তিন কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। এটি দ্বিমুখী এবং রাস্তার মাঝে আইল্যান্ড রয়েছে।

## ওভারব্রীজ

যোগাযোগের সুবিধার্থে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কয়েকটি ওভারব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের আগে মাদরাজ এবং সোলতানার রেল লাইনের উপর ২টা ওভারব্রিজ ছাড়া আর কোন ওভারব্রীজ ছিলনা। পরে আরো ৪টি ওভারব্রীজ তৈরী করা হয়। সেগুলো হচ্ছেঃ

১· আ'ম্বারিয়া, কুবা এবং হোস মানসূরের সাথে সংযোগের উদ্দেশ্যে মাদরাজে ২য় ওভারব্রীজ তৈরী করা হয়। তবে মাদরাজের প্রথম ওভারব্রীজটিও সংস্কার করা হয়েছে।

২· হোস মানসূর ওভারব্রীজ কুবা এলাকাকে মানাখার সাথে সংযুক্ত করেছে।

৩· হামযাহ ওভারব্রীজ ওহোদ ময়দান ও শহীদানে ওহোদের কবরস্থান এবং আল–উয়ুন গ্রামকে সংযুক্ত করেছে।

৪· মুনসিয়া ওভারব্রীজ আসসাইব এবং আরদে মহব্বত এর সাথে সংযোগ সৃষ্টিকরেছে।

## মদীনার সাথে আন্তঃশহর সংযোগ সড়কঃ

**১. মক্কা—মদীনা এক্সপ্রেস রোডঃ** এটি ৪২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এতে মোট ২৭টি উঁচু ক্রসিং আছে। এগুলোর মাধ্যমে রাস্তার পার্শ্বে প্রায় ১ লাখ হেক্টর যমীনে কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি একটি দ্বিমুখী রাস্তা। এর প্রতি দিকে ৩টি করে ট্র্যাক আছে, মাঝে ২০ মিটার চওড়া আইল্যান্ড ও দুই পার্শ্বে ১০.৯ মিটার চওড়া সার্ভিস রোড রয়েছে।

**২. মদীনা—বদর—জিদ্দা সড়কঃ** এটি ৪শ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই রোডের মাধ্যমে ইয়াম্বুতে যাওয়া যায়।

**৩. মদীনা—রিয়াদ সড়কঃ** এর দৈর্ঘ ১ হাজার কিলোমিটার এবং তা আল—কাসিম হয়ে রিয়াদ গিয়েছে।

**৪. মদীনা—তাবুক সড়কঃ** এর দৈর্ঘ ১ হাজার কিলোমিটার। এই সড়ক ধরে জর্দান ও সিরিয়ায় যাওয়া যায়।

## মদীনা বিমান বন্দরঃ

মদীনায় আসা যাওয়া ও সুষ্ঠু যোগাযোগের জন্য মদীনা বিমানবন্দরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বিমানবন্দরের সকল সুযোগ–সুবিধেসহ বিমান বন্দরটি সর্বদা মদীনায় যেয়ারতকারীদের প্রয়োজনীয় সেবা আঞ্জাম দিচ্ছে। বিমানবন্দরটি আগে ছোট ছিল। পরে তার সম্প্রসারণ করা হয়। ফলে, এখন এর দৈনিক ৩৭টি ফ্লাইট সংকুলান ক্ষমতা আছে। সৌদী আরবের আভ্যন্তরীন যোগাযোগের জন্য নির্মিত ২২টি বিমান বন্দরের মধ্যে মদীনা বিমান বন্দর হচ্ছে একটি। বিমান বন্দর মদীনা শহর থেকে পূর্ব–উত্তর দিকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বিমান বন্দর গামী প্রশস্ত সড়কের মাধ্যমে শহরের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগেরব্যবস্থারয়েছে।

## হোটেল ব্যবস্থা

মদীনায় ১ম ও ২য় শ্রেনীর বহু আবাসিক হোটেল আছে। মসজিদে নবওয়ীর কাছেও অনেকগুলো হোটেল আছে। এছাড়াও মসজিদে নবওয়ীর কাছে ও দূরে

বহু আবাসিক ফ্লাট ও কক্ষ আছে যেগুলো ভাড়া দেয়া হয়। হাজী ও যেয়ারতকারীরা বছরের যে কোন সময় এবং দিন-রাত সর্বদা ঐ সকল হোটেল ও কক্ষে ভাড়ায় থাকতে পারেন।

## ব্যাংকিং ব্যবস্থা

শহরে প্রায় সকল ব্যাংকের শাখা আছে। এছাড়াও মানি একচেঞ্জের মাধ্যমেও মুদ্রা পরিবর্তনের সুযোগ আছে। ব্যাংকের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ যিয়ারতকারী আর্থিক লেন-দেন করতে সক্ষম হয়।

**মসজিদে নবওয়ী থেকে উত্তর দিকে আছেঃ** আল–বাইআহ, ওহোদ।

**মসজিদে নবওয়ী থেকে উত্তর–পশ্চিমে আছেঃ** খন্দক, জাবালে সালা, আন–নাসর, আল–উয়ুন, আকীক উপত্যকা, জোরফ, বাদশাহ ফাহাদ কোরআন কমপ্লেক্স।

**মসজিদে নবওয়ী থেকে পশ্চিমে আছেঃ** আল–আনসার, তাইয়্যেবাহ, পশ্চিম–হাররাহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জাম্মাহ পাহাড়, আকীক উপত্যকা।

**মসজিদে নবওয়ী থেকে পশ্চিম–দক্ষিণ কোণে আছেঃ** আকীক উপত্যকা, আল–খোলাফা, আবইয়ারে আলী, মদীনাতুল হুজ্জাজ।

**মসজিদে নবওয়ী থেকে দক্ষিণে আছেঃ** কুবা, কোরবান।

**মসজিদে নবওয়ী থেকে দক্ষিণ–পূর্বে আছেঃ** আসসালাম, রাওদাহ, আল–আ'ওয়ালী।

**মসজিদে নবওয়ী থেকে পূর্ব দিকেঃ** পূর্বহাররাহ।

**মসজিদে নবওয়ী থেকে পূর্ব উত্তরেঃ** আল–আউস, আল–আকুল উপত্যকা, আরীদ, আল–মুজাহেদীন, বিমানবন্দর।

## মসজিদে নবওয়ীর পারিপার্শ্বিক উন্নয়নঃ

মসজিদে নবওয়ীর ব্যাপক সম্প্রসারণের সাথে সাথে মদীনা শহর পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই আলোকে মসজিদে নবওয়ীর চারপাশের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য সরকার ২৬/৭/১৪০৭ হিজরীতে, 'তাইয়্যেবাহ পুঁজিবিনিয়োগ ও ভূমি উন্নয়ন কোম্পানী' গঠন করে। এই কোম্পানী একটি পাবলিক শেয়ার কোম্পানী। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিকল্পিত ব্যাপক উন্নয়নের জন্য এই কোম্পানী গঠিত হয়েছে। অপরিকল্পিত বাড়ী–ঘরগুলো ভেঙ্গে তার পরিবর্তে আধুনিক ভবন ও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধে সৃষ্টি করা হবে।

## মসজিদে নবওয়ী যেয়ারতকারীর আদব-শিষ্টাচার

মসজিদে নবওয়ী হচ্ছে, আল্লাহর মহান বন্ধু বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী মানবশ্রেষ্ঠ প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা) এর দ্বীন প্রচারের কেন্দ্র। জিন্দেগীর অবশিষ্টাংশ এখানে কাটানোর পর এখানেই তাঁর চির নিদ্রার স্থান নির্ধারিত হয়েছে। একদিকে তাঁর মহান মসজিদ এবং অন্যদিকে তাঁর কবর মোবারক এই জায়গার আকর্ষণ কোটিগুণ বৃদ্ধি করেছে।

ইয়াহইয়া ও ইবনু ন্নাজ্জার কাব আল আহবার থেকে বর্ণনা করেছেন, এমন কোন সকাল নেই, যে দিন ৭০ হাজার ফেরেশতা নীচে নেমে কবর মোবারক ঘিরে না রাখেন এবং ডানা বিছিয়ে দিয়ে অবিরাম তাঁর উপর দরুদ ও সালাম না পড়েন। সন্ধ্যে হলে তারা চলে যান এবং অনুরূপ আরেকদল এসে একই ধরণের কাজে ব্যস্ত থাকেন। যে দিন যমীন থেকে মানুষকে বের করা হবে, সে দিন তিনি ৭০ হাজার ফেরেশতা সহকারে উঠবেন।[৮০]

দারেমী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ৭০ হাজার ফেরেশতা দিনে এবং ৭০ হাজার ফেরেশতা রাত্রে কবর মোবারকে বিদ্যমান থাকেন।[৮১]

ফেরেশতারা যেখানে কবর শরীফে বিনীত ভাবে দোয়া-দরুদ ও সালাম পাঠ করছেন, সেখানে তাঁর অনুসারী উম্মাতের লোকজনের কি করা উচিঁত, তা চিন্তা করে দেখতে হবে।

মসজিদে নবওয়ীর যিয়ারতকারীর জন্য কতগুলো আদব ও শিষ্টাচার আছে। সেগুলো পালন না করলে এই মসজিদের সঠিক ও যথার্থ যিয়ারত হবেনা। এখন আমরা সেই আদব ও নীতি গুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১· প্রথমেই জেনে নিতে হবে যে, আমরা যাঁর মসজিদ ও দীনি কেন্দ্র যিয়ারতে এসেছি, তাঁর গোটা জীবন ও আদর্শকে বরণ করে নিতে হবে। তাঁর আদর্শকে না জেনে ও না মেনে এখানে ঘুরা-ফিরা করলে মুক্তার খনিতে ব্যর্থ

---

৮০·অফা-আল-অফা-২য় খন্ড।। নূরুদ্দিন সামহূদী,

৮১· অফা-আল-অফা ২য় খন্ড।। শেখ নূরুদ্দীন সামহূদী।

বিচরণের নামান্তর হবে। তাঁর আদর্শকে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনুসরণ না করে তাঁর মসজিদে ও কবরে হাজিরা দিয়ে তোতা পাখীর বুলি আওড়ালে ফায়দা পাওয়া যাবে কিভাবে? এজন্য কোরআন ও হাদীসকে জানা ও মানার চেষ্টা চালাতে হবে এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করে মসজিদে নবওয়ীতে হাজিরা দিলে তা সার্থক হবে। শুধু তাই নয়, ফরজ, ওয়াজিব মেনে এবং হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার পর এখানে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের ছোট খাট সকল সুনাতগুলোকেও পালন করার চেষ্টা করে নবীর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ কোরআনে এই আদেশ দিয়ে বলেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থঃ 'হে নবী আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। এর ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।' এই আয়াতে আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) ভালবাসাকে শর্ত করা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (সা)কে ভালবাসার অর্থ হল, তাঁর গোটা জিন্দেগীকে অনুসরণ করা। তাঁকে অনুসরণ না করে মৌখিক ভালবাসার মহড়া প্রদর্শনের কোন অর্থ থাকতে পারেনা।

২· মসজিদ যিয়ারতের সময় যেন কোন নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ না করা হয়। 'আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ বিরোধী কোন কাজ না করা হয়।

৩· মদীনার নেককার লোকদেরকে ভালবাসা।

৪· প্রথমে মসজিদে নবওয়ীতে প্রবেশ করে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে হবে।

৫· হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'মসজিদে নবওয়ী যিয়ারতের পথে কেউ যদি নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে তাহলে আল্লাহ সেই যিয়ারতকারীর ক্ষমা প্রার্থনার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিয়োগ করেন এবং তাঁর (নবীর) উসিলায় আল্লাহ তার যিয়ারত কবুল করেন।[৮২]

---

৮২· ওমদাতুল আখবার ফি মদীনাতিল মোখতার।। শেখ আহমদ আবদুল হামীদ আব্বাসী।

দোয়াটি হচ্ছে,

بِسْمِ اللهِ مَاشَاءَ اللهُ لاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللهِ رَبِّ اَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ

وَاَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِىْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا

حَسْبِىَ اللهُ اٰمَنْتُ بِاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللهِ

৬· মসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে এবং নিম্নোক্ত দোয়া পড়া ভাল।

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللهِ مَا شَاءَ اللهُ لاَ

قُوَّةَ الاَّ بِاللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَسَلِّمْ

تَسْلِمًا كَثِيْرًا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

৭· মোসাল্লা রাসূলে অর্থাৎ নবীর (সা) নামাযের স্থানে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়া উত্তম। নামায শেষে বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

৮· তারপর নবীর (সা) করব মুবারকের সামনে গিয়ে তাঁর মাথা বরাবর দাঁড়িয়ে অত্যন্ত নম্রতা ও আদব সহকারে সালাম ও দরুদ পাঠ করতে হবে।

হযরত যয়নুল আবেদীন আলী বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব (রা) প্রথমে রাসূলুল্লাহর (সা) মাথা মুবারক বরাবর দাঁড়িয়ে সালাম দিতেন। তারপর আবু বকর এবং উমার (রা) এর মাথা বরাবর দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) উপর এইভাবে নিম্নস্বরে সালাম পাঠ করতেনঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

অর্থঃ হে আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। তারপর ডানে প্রায় ১ গজ অগ্রসর হয়ে হযরত আবু বকরের কবরের সামনে গিয়ে বলতেনঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صِدِّيْقَ رَسُوْلِ اللهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ-

তারপর ডানে প্রায় আরো একগজ অগ্রসর হয়ে হযরত উমারের (রা) কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেনঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَيَّدَ اللهُ بِهِ الدِّيْنَ-اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ ، جَزَاكُمَا اللهُ عَنْ نَبِيِّكُمَا وَعَنِ الْاِسْلاَمِ وَاَهْلِهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ

এর পর তিনি যিয়ারত শেষ করতেন।

৯· যিয়ারতের ফজীলত ও মর্যাদার কথা স্মরণ রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) 'মদীনার ফজীলত' অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, তিনি তাদের জন্য সুফারিশ করবেন, সাক্ষ্য দেবেন এবং তারা তার প্রতিবেশী হওয়ার সম্মানে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করবেন।

১০· যত বেশী সম্ভব দরুদ পাঠ করা উত্তম। হাদীসে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে আমার উপর ১ বার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত নাযিল করবেন। কাজেই নবীর (সা) কাছে গিয়ে এই মর্যাদা যত বেশী লাভ করা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে।

১১· যিয়ারতকারীর মনে কোন গর্ব অহংকার, ক্ষমতার দাপট, যুলুম-নির্যাতন করার মনোভাব এবং অন্যায় ও অসৎ মনোবৃত্তি থাকতে পারবেনা। নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ মনে এবং একান্ত আল্লাহ ও নবী প্রেমিকের উদার চিত্ত নিয়েই যিয়ারত করতে হবে। বর্ণিত আছে, ইমাম মালেক (রা) মদীনায় কোন সওয়ারীতে আরোহণ করতেননা। কেননা, তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণকে নবীর (সা) উপর বিচরণ বলে বিবেচনা করতেন। আরো বর্ণিত আছে, ইমাম আবু হানীফা (রা)ও মদীনা শহরে পেশাব-পায়খানা করা অপসন্দ করতেন এবং প্রয়োজনের সময় শহরের বাইরে গিয়ে মল ত্যাগ করতেন।

মূল কথা হল, মসজিদ ও কবর শরীফ এবং শহর যিয়ারতের সময় যেন কোন বেআদবী না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

# মদীনা শরীফের ইতিকথা

# مَكَانَةُ الْحَرَمِ الْمَدَنِي عَبْرَ التَّارِيْخِ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

# মাদিনা শরিফের ইতিকথা

-এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম